সাধুদর্শন
ও
সৎপ্রসঙ্গ

(২য় খণ্ড)

মহামহোপাধ্যায়
ডক্টর গোপীনাথ কবিরাজ

হিমাদ্রি সংসদ

প্রথম প্রকাশ ১৩৭০
দ্বিতীয় প্রকাশ ১৩৭৩

●

প্রকাশনা ঃ
শ্রীভোলানাথ চক্রবর্ত্তী
হিমাদ্রি সংসদ
১৬, গণেশচন্দ্র এভেন্যু,
কলিকাতা-১৩

●

মুদ্রণ ঃ
শ্রীমুরারি মোহন কুমার
শতাব্দী প্রেস
৮০, লোয়ার সার্কুলার রোড,
কলিকাতা-১৪

●

শিল্পী ঃ
সুপ্রকাশ সেন

●

বাঁধাই ঃ
সেঞ্চুরি বাইণ্ডিং কোম্পানী
১০০, বৈঠকখানা রোড,
কলিকাতা

সূচীপত্র

প্রকাশকের নিবেদন

ভারতবিশ্রুত মনীষী ও সাধক, মহামহোপাধ্যায় ডক্টর গোপীনাথ কবিরাজের পরিচয় কাহারো বলিবার অপেক্ষা রাখে না। এ দেশের অধ্যাত্মসাধনার মর্মকেন্দ্র বারাণসীতে তিনি দীর্ঘকাল যাবৎ আছেন, উচ্চকোটির সাধকদের সান্নিধ্য, কৃপা ও সৌহার্দ্দ্যলাভের সুযোগও তাঁহার কম হয় নাই। এই মহাত্মাদের কয়েকজনের কাহিনী ও তত্ত্বপ্রসঙ্গ ইতিপূর্বে 'সাধুদর্শন ও সৎপ্রসঙ্গ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে তিনি আলোচনা করিয়াছেন। উক্ত গ্রন্থ দেশের পত্র পত্রিকা ও সুধীসমাজ কর্তৃক অভিনন্দিত হইয়াছে, সহস্র সহস্র অধ্যাত্মরসপিপাসু নরনারীকে তৃপ্তি দিয়াছে, উপকৃত করিয়াছে। এবার আমরা তাঁহার ঐ গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড (২য় সং) দেশবাসীর সম্মুখে উপস্থিত করিতেছি। আশা করি, আধ্যাত্মিক তথ্য ও তত্ত্বে সমৃদ্ধ এই গ্রন্থটি পূর্বেকার মত সর্বত্র সমাদৃত হইবে।

এই গ্রন্থের বিষয় বস্তু—বিশিষ্ট মহাপুরুষদের অলৌকিক জীবন তথ্য, সূক্ষ্ম-লোকের দিব্য অনুভূতি ও আত্মিক উপলব্ধি, আর এইসব বর্ণিত হইয়াছে ডক্টর গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের লেখনী-মুখে—তাঁহার অসামান্য প্রতিভা, ভূয়োদর্শন ও বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধির সাহায্যে। এই মহামূল্যবান গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আর বেশী কিছু বলার বোধহয় প্রয়োজন নাই।

আজিকার দিনের দ্বন্দ্ব-সংঘাতময় জীবনে এই ধরণের অধ্যাত্মসাহিত্য সত্যকার শান্তি ও কল্যাণ আনয়নে সাহায্য করিবে, ইহাই আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। এ বিশ্বাসই এ ধরণের মহৎ গ্রন্থ প্রকাশনার কাজে আমাদের প্রেরণা যোগাইয়াছে। ইতি

—প্রকাশক

Sadhudarshan -O- Satprasanga (Vol II)

By

Mahamahopadhyaya Dr. Gopinath kaviraj

Rs. 6·00

কিশোরী ভগবানের কথা

কিশোরী ভগবানের নাম আজ হয়তো কাশীতেও অনেকের নিকট অপরিজ্ঞাত, কিন্তু এমন এক সময় ছিল যখন শুধু কাশীতে নহে, বাহিরেও বহু স্থানে বহু পরিবারে ইঁহার নাম ও গুণের কীর্ত্তন হইত। দেশ বিদেশ হইতে বালক, বৃদ্ধ, যুবা, স্ত্রী, পুরুষ বহু লোকে ইঁহাকে দর্শন করিতে আসিত, অনেকে ইঁহার অনুগ্রহ লাভ করিয়া নিজেকে ধন্য মনে করিত এবং জীবনের পথে অগ্রসর হইবার পক্ষে সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া বোধ করিত।

ইহা বোধ হয় ১৯২০ সালের কথা হইবে। আমি একদিন প্রয়াগ বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন অধিবেশনে উপস্থিত হইয়া প্রয়াগ হইতে কাশীর দিকে ফিরিতেছিলাম। মোগলসরাই ষ্টেশনে একজন পূর্ব্ব-পরিচিত বাঙ্গালী বন্ধুর সহিত আমার দেখা হয়। তিনি কাশী হইতে প্রয়াগ যাইতেছিলেন। উভয়েরই নিজ নিজ গাড়ী ধরার কিঞ্চিৎ বিলম্ব ছিল বলিয়া বিশ্রামগৃহে বসিয়া উভয়ে কথাবার্ত্তা বলিতেছিলাম। আমি বন্ধুটিকে জিজ্ঞাসা করিলাম, এই সময়ে তিনি প্রয়াগ হইতে কাশী আসিয়াছিলেন কেন? ঐ সময়ে বিদ্যালয়ের অবকাশ ছিল না, সেইজন্য স্বভাবতঃই এই প্রশ্ন মনে উদিত হইয়াছিল। তিনি বলিলেন, কাশীতে একজন মহাপুরুষের আবির্ভাব হইয়াছে, তাঁহাকে লোকে ভগবানের অবতার-সাদৃশ শ্রদ্ধা করে। সেই বিষয়ে অনুসন্ধানপূর্ব্বক ঔৎসুক্য নিবৃত্তির জন্য একদিনের জন্য তিনি কাশী আসিয়াছিলেন, কিন্তু বিশেষ অনুসন্ধানের অবসর না থাকাতে তিনি ঠিক ঠিক সংবাদ সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। তিনি তাঁহার বর্ণিত মহাত্মার নাম ধাম কিছুই বলিতে পারিলেন না। এই প্রসঙ্গ এইখানেই শেষ হইয়া গেল।

কিন্তু কথাটি আমার মনে গাঁথা রহিল। আমি ভাবিলাম আমি কাশীতে থাকিয়াও এই সংবাদ পাই নাই, ইহা বাস্তবিকই আশ্চর্য্যের কথা। তাই এই সম্বন্ধে জিজ্ঞাসুভাবে কিছু কিছু অনুসন্ধান করিতে চেষ্টা করিলাম। কিন্তু নাম অথবা স্থান জানা না থাকাতে ঠিকভাবে অনুসন্ধান করিতে পারিলাম না। ইহারই মধ্যে একদিন আমি গঙ্গার তীরে দ্বারভাঙ্গা ঘাটের বুরুজের উপর বসিয়া দুই একটি সঙ্গী বন্ধুর সঙ্গে আলাপ আলোচনা করিতেছিলাম। কিছুক্ষণ পরে শুনিতে পাইলাম, দুইটি ভদ্রলোক ঐ বুরুজের নিকটেই স্থানান্তরে বসিয়া পরস্পর একটি বিষয় লইয়া আলোচনা করিতেছেন। তাঁহাদের আলোচ্য বিষয় ঠিক আমার অনুসন্ধানের বিষয়ের সহিত অভিন্ন ছিল বলিয়াই মনে হইল। কারণ তাঁহারা বলিতেছিলেন যে, কাশীতে কোনও স্থানে কোনও আধারে ভগবৎ শক্তির আবির্ভাব হইয়াছে এবং উহার সন্ধান তাঁহারা কিছু কিছু পাইয়াছেন। এই প্রসঙ্গে সোনরপুরা মহল্লায় অবস্থিত 'প্রণব আশ্রমের' কথা তাঁহারা বলিয়াছিলেন। বস্তুত: সেই মহাপুরুষের নাম বা অবস্থান সম্বন্ধে তাঁহারাও কিছু জানিতেন না। এই 'প্রণব আশ্রমটি' আমি বিশেষভাবে জানিতাম। স্বর্গীয় যোগিরাজ শ্যামাচরণ লাহিড়ী মহাশয়ের শিষ্য ৺প্রণবানন্দ স্বামী মহারাজ ঐ আশ্রমের অধিষ্ঠাতা ছিলেন। উহা কোন ভক্ত স্থাপন করিয়া তাঁহার নামে উৎসর্গ করিয়া দিয়াছিলেন। আমি কয়েক বৎসর পূর্ব্বে পূর্ব্বোক্ত স্বামীজীর দেহাবসান কালে তাঁহার রচিত গীতার যৌগিক ব্যাখ্যা সংগ্রহ করিবার জন্য একবার তাঁহার আশ্রমে গিয়াছিলাম। আমি মনে করিয়াছিলাম এই আশ্রমে যাইয়া পূর্ব্বোক্ত মহাপুরুষের সন্ধান করিতে চেষ্টা করিব।

এইভাবে কয়েকদিন কাটিয়া যায়। একদিন আমি আমার একজন বন্ধুর সঙ্গে প্রণবাশ্রমে গমন করিলাম। সেখানে যাইতেই একটি বৃদ্ধা স্ত্রীলোক আমাদিগের সঙ্গে দেখা করিতে আসিলেন এবং আমাদের ঐ আশ্রমে যাওয়ার উদ্দেশ্য কি তাহা জানিতে চাহিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা

করিলেন যে আমি ঐ স্থানে কাহারও সহিত দেখা করিতে ইচ্ছা করি কিনা। আমি বৃদ্ধা মহিলাটিকে বলিলাম, আমি অবশ্যই একজনের দর্শন লাভ করিবার জন্য আসিয়াছি, কিন্তু তিনি কে তাহা আমি জানি না। তাঁহার নামও জানি না এবং স্থানও জানি না। শুনিয়াছি কাশীতে কোন স্থানে তাঁহার আবির্ভাব হইয়াছে। ইহা কতটা সত্য তাহাও জানি না। ইহা শুনিয়াছি যে ঐ আবির্ভাবের সঙ্গে স্বামী প্রণবানন্দের কিছু সম্বন্ধ আছে। এই তথ্যটি অনুসন্ধান করিয়া নির্ণয় করিবার জন্যই এখানে আসিয়াছি। ইহার অধিক আমার আর কিছু বলিবার নাই। কথা শুনিয়া বৃদ্ধা বলিলেন, "বুঝিলাম আপনারা 'ভগবানের' সঙ্গে দেখা করিতে ইচ্ছা করেন।" এই বলিয়া তিনি আগ্রহসহ একটি লোককে বলিয়া দিলেন, সে যেন আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া 'ভগবানে'র আবাসস্থান পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দেয়, এবং যাহাতে তাঁহার সঙ্গে আমাদের দেখা হয় তাহার ব্যবস্থা করিয়া দেয়। ইহার পর ঐ লোকটি আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া প্রণবাশ্রম হইতে বাহির হয় এবং কয়েকটি বাড়ীর ব্যবধানেই অন্য একটা বাড়ীতে যাইয়া আমাদিগকে ঐ বাড়ীর বৈঠকখানাতে বসিতে বলে। তারপর সে উপর তলায় যাইয়া সেই মহাপুরুষকে সংবাদ দেয় এবং কিছুক্ষণ পরে প্রণবাশ্রমে ফিরিয়া যায়।

যে বাড়ীতে ভগবান ছিলেন সে বাড়ীটি অপেক্ষাকৃত ছোট। আমরা ঐ বাড়ীর বৈঠকখানাতে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পর একটি বৃদ্ধ দোতালা হইতে নামিয়া আসিলেন এবং আমাদের নিকট আসিয়া আমাদিগকে সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। ভদ্রলোকটির বয়স পঞ্চাশের কিঞ্চিৎ অধিক বলিয়া মনে হইল। শ্যাম বর্ণ, বেশ সুন্দর আকৃতি। মাথায় সাধারণভাবের কেশ আছে—মুণ্ডিতও নয় অথবা দীর্ঘ কেশও নয়। গোঁফ এবং শ্মশ্রু কিছুই নাই। হাস্যময় প্রসন্ন মূর্ত্তি এবং প্রকৃতিটিও সরল, উদার ও অমায়িক। ভদ্রলোকটিকে দেখিয়া মনে আনন্দ হইল এবং তাঁহার সহিত পূর্ব্বের পরিচয় না থাকিলেও তাঁহার প্রতি কেমন একটা শ্রদ্ধার উদয় হইল। কথাবার্ত্তায় দেখিলাম তিনি

উচ্চ শিক্ষাপ্রাপ্ত, সংস্কৃত এবং ইংরাজীতে বিশেষ অধিকারসম্পন্ন এবং ব্যবহার দৃষ্টিতেও অসাধারণ মেধা ও ধী-শক্তিসম্পন্ন। তিনি হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনারা কাহার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছেন।" এই প্রশ্নের কি উত্তর দিব বুঝিতে পারিলাম না। বলিলাম, "আমরা কাহার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছি তাহা জানি না। শুনিয়াছি কাশীতে ভগবান প্রকট হইয়াছেন এবং এই ব্যাপারে প্রণব আশ্রমের সঙ্গে কিছু সম্বন্ধ আছে। প্রণবাশ্রমে গিয়াছিলাম, সেখান হইতে তাঁহারা আমাদিগকে আপনার নিকট পাঠাইয়া দিয়াছেন। আপনিই কি 'ভগবান' ?

আমার কথা শুনিয়া ভদ্রলোকটি হাসিয়া হাসিয়া কহিলেন, "ওরা আমাকে 'ভগবান' বলিয়া ডাকে।"

ইহার পর তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, এই জনরবের মূলে কোন সত্য আছে কিনা। এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলিলেন, "ইহার মূল অবশ্যই সত্য, তবে অজ্ঞলোক যাহা মনে করে তাহা সত্য নহে। সাধারণ লোকের ধারণা ভগবানের দর্শন পাওয়া যায় না। এমন কি অতি কঠোর তপস্যা ভিন্ন হৃদয় মধ্যে তাঁহার একটু সাড়াও পাওয়া যায় না। তাছাড়া ভগবানকে দর্শন করিতে হইলে মন প্রাণকে নিরুদ্ধ করিয়া নিত্য ও চিন্ময়জগতে প্রবেশ করিতে হয়। নিজে অনিত্যের মধ্যে থাকিয়া, বিশেষতঃ বর্ত্তমান সময়ে—ভগবানের দর্শন লাভের আকাঙ্ক্ষা কবির কল্পনামাত্র। কিন্তু ইহা সত্য নহে, ইহা শাস্ত্রের সিদ্ধান্তও নহে। কলিযুগের প্রভাবে জীবের চিত্ত মলিনতাবশতঃ অধিক দুর্ব্বল বলিয়া ভগবানের জীবানুগ্রহ এই সময়েই অধিক হইবার কথা। পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে জীবের সাধন-বল প্রচুর পরিমাণে থাকিত। তাই ভগবানের কিঞ্চিৎ করুণা পাইয়াই জীব সংসার মুক্তির পথ খুঁজিয়া পাইত। কিন্তু এখন জীবের সে তপোবলও নাই, সে ব্রহ্মচর্য্য-জনিত শুদ্ধিও নাই, এমনকি সে জ্ঞান অথবা শক্তি বিকাশের সামর্থ্যও নাই। তাই কলিযুগে ভগবৎ কৃপার প্রাধান্য অধিক। সরলতা,

বিশ্বাস এবং একনিষ্ঠতা থাকিলে অন্যান্য যুগ অপেক্ষা কলিযুগেই ভগবদ্ দর্শন সুলভ।”

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, “যোগ এবং জ্ঞানে উৎকর্ষ লাভ না করিলে, এমন কি যথোক্তপ্রকারে চিত্তশুদ্ধি লাভ না করিলে, তাঁহার দর্শন লাভ কি প্রকারে হইতে পারে?”

‘ভগবান’ বলিলেন, “ইহা সত্য কথা। কিন্তু যোগ, জ্ঞান প্রভৃতি উচ্চাঙ্গের সাধন সম্পত্তি সদ্গুরুপ্রাপ্ত হইয়া যথাবিধি সাধন করিতে না পারিলে লাভ করা যায় না। এই জন্য জীব কাতর হইয়া ডাকিলে ভগবান নিজগুণে কৃপাপূর্ব্বক তাহার নয়ন পথে উপস্থিত হন এবং গুরুরূপে ভক্তের সম্মুখে আত্মপ্রকাশ করেন। তারপর এই গুরুরূপেই বাহির হইতে তাহাকে উপদেশ দেন এবং ভিতর হইতে ক্রমশঃ তাহাকে শোধন করেন এবং তাহার গ্রন্থিসকল মোচন করেন। জীব স্থূল অভিমানে নিবিষ্ট তাই ভগবানও তাহার নিকট প্রথম স্থূলরূপেই প্রকাশিত হন এবং প্রকাশিত হইয়া তাহাকে তাহার উপযোগী উপদেশাদি দান করেন। জীবের জ্ঞানাদি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভগবানেরও আবির্ভাব ক্রমশঃ নিম্ন হইতে উচ্চ স্তরে হইয়া থাকে। কালে অদ্বৈত জ্ঞানের উদয় হইলে গুরুরূপী ভগবান এবং শিষ্যরূপী জীব এক ও অভিন্ন সত্তাতে স্থিতিলাভ করেন।”

তাঁহার কথা শুনিয়া আমি বলিলাম, “আপনি যাহা বলিলেন তাহা যুক্তিসঙ্গত কথা। কিন্তু স্থূলাভিমান থাকিতে থাকিতে স্থূল দৃষ্টির সম্মুখে উপদেষ্টারূপে ভগবানের আবির্ভাব কি সহজ কথা?”

ভগবান হাসিয়া বলিলেন, “ইহাই তো সহজ ও স্বাভাবিক পথ। মানুষ বিশ্বাস করিতে পারে না বলিয়া দর্শন পায় না। কিন্তু যদি একবার চিত্তে বিশ্বাস দৃঢ় হয়, তাহা হইলে স্থূলভাবে ভগবৎ দর্শন দুর্লভ মনে করিবার কোনই কারণ নাই। ব্রহ্মজ্ঞান, অদ্বৈতজ্ঞান, এই সব অনেক বড় কথা। কিন্তু স্থূলভাবে ভগবানের দর্শন লাভ করা ভাগ্যে থাকিলে প্রত্যেক জীবেরই হওয়া উচিত। তাছাড়া, আর একটি

কথা আছে। এখন যে সময় আসিয়াছে তাহা ভগবানের প্রকট হইবার অনুকূল। জীব নানাভাবে পীড়িত হইয়া এবং নানা তাপে তাপিত হইয়া অনাথ এবং নিরাশ্রয় ভাবে চারিদিকে হাহাকার করিতেছে। ভগবৎ কৃপার অভিব্যক্তির ইহাই তো অনুকূল সময়। বস্তুতঃ অন্য সময়ে যাহা অত্যন্ত দুর্লভ, কালের গুণে বর্ত্তমান সময়ে তাহা অত্যন্ত সুলভ। তবে আন্তরিকতা, সরলতা, বৈরাগ্য ও ব্যাকুলতা থাকা চাই। অন্যান্য সদ্‌গুণ না থাকিলেও এই জাতীয় ভগবৎ দর্শনে বাধা হয় না। তবে চিত্তের উন্মুখতা থাকা আবশ্যক। আলোক আসিলে যেমন অন্ধকার দূর হয়, তেমনি ভগবান প্রকট হইলে হৃদয়ের মলিনতা ও অন্ধকার দূর হইয়া যায়।”

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, “এই জাতীয় ঘটনা কি কিছু ঘটিয়াছে, যাহাতে আপনার যুক্তিপূর্ণ বচন দৃষ্টান্তের দ্বারা সমর্থিত হইতে পারে?”

তিনি বলিলেন, “অনেকগুলি ঘটিয়াছে এবং নিয়তই বহু ঘটিতেছে। আপনারা অনুসন্ধান করিলে ইহা জানিতে পারিবেন।”

তখন আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, “যাহা বলিলেন তত্ত্বের দিক দিয়া খুবই সত্য, কিন্তু আমি বর্ত্তমানে এই ভগবল্লীলা ব্যাপারের ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশটা জানিতে ইচ্ছা করি। এই ব্যাপারের সূচনা কি প্রকার হইল তাহাই জানিতে ইচ্ছা।” আমার এই কথা শুনিয়া ‘ভগবান’ শান্ত ভাবে এই লীলার প্রথম সূচনা কি প্রকারে হয় তাহা বলিতে লাগিলেন।

তিনি বলিলেন—“আপনারা যোগী প্রণবানন্দ স্বামীর নাম অবশ্যই শুনিয়াছেন। তিনি কাশীর প্রসিদ্ধ যোগী শ্যামাচরণ লাহিড়ী মহাশয়ের শিষ্য ছিলেন। যে আশ্রমে আপনারা গিয়াছিলেন উহা তাঁহারই আশ্রম। তাঁহার এক শিষ্য উহা নির্ম্মাণ করিয়া তাঁহার নামে উৎসর্গ করিয়া দিয়াছে। স্বামীজী কিছুদিন পূর্ব্বে কাশীর বাহিরে দেহরক্ষা করেন। অন্যান্য স্থানের ন্যায় কাশীতেও তাঁহার অনেক শিষ্য ছিল।

তাহারা সকলে গুরুদেবের তিরোধানের কথা শুনিয়া বিশেষ মর্ম্মাহত হইল। তাহারা সকলে প্রতিদিন আশ্রমে মিলিত হইয়া পরস্পর ধর্ম্মালোচনা করিত এবং মাঝে মাঝে সদ্‌গ্রন্থ পাঠ করিত; আশ্রমে যে বেদীর উপর স্বামীজী উপবিষ্ট হইতেন তাহারই চারিদিকে নিম্নভূমিতে শিষ্যগণ বসিয়া ধর্ম্মবিষয়ে আলোচনা করিত। কিন্তু এই প্রকার আলোচনাতে তাহাদের প্রাণের অকথ্য বেদনা দূরীভূত হইত না।

ঐ সময়ে তাহাদের পরিচিত একটি ভদ্রলোক তাহাদের আশ্রমে কোন কার্য্য উপলক্ষে আগমন করেন। তিনি এখানকার পুলিশ বিভাগের একজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী ছিলেন। এই ভদ্রলোকটির সঙ্গে বহুদিন হইতেই আমার পরিচয় ছিল। এই ভদ্রলোকটি তাহাদের বেদনাপূর্ণ মনের অবস্থা দেখিয়া তাহাদের প্রতি অত্যন্ত সহানুভূতি প্রকাশ করেন। তিনি তাহাদিগকে আমার নাম উল্লেখ করিয়া আমার সঙ্গে দেখা করিতে বলেন। তিনি তখন তাঁহাদিগকে বলিয়াছিলেন যে কিছুদিন আমার সঙ্গে ধর্ম্মালোচন করিতে পারিলে হয়তো তাহাদের মনে শান্তির উদয় হইবে। তাঁহার উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া ঐসব ভক্তগণ দু-একদিন পরেই আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসে। তাহাদের সঙ্গে আলাপ করিয়া দেখিলাম তাহারা অত্যন্ত শোকার্ত্ত। তাহাদের বিশেষ অনুরোধে আমি অপরাহ্নকালে চারিটার সময় প্রণব আশ্রমে যাইয়া এক ঘণ্টা পর্য্যন্ত তাহাদিগকে ধর্ম্মোপদেশ দিতে সম্মত হইলাম। তাহাদের আর্ত্তি দেখিয়া আমার মনে অত্যন্ত সমবেদনা উৎপন্ন হইয়াছিল। ইহার পরদিন হইতেই আমি প্রত্যহ প্রণবাশ্রমে যাইয়া এক ঘণ্টা বসিতাম এবং তাহাদের জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের সদুত্তর দান করিয়া তাহাদের শোক দূর করিতে চেষ্টা করিতাম।

আমাকে প্রাপ্ত হইয়া ভক্তদের মধ্যে যিনি প্রধান অর্থাৎ যিনি ঐ আশ্রমটি নির্ম্মাণ করিয়া দান করিয়াছিলেন তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমাদের গুরুদেবের মৃত্যু হইয়াছে। আমরা অত্যন্ত

শোকে কাতর। তাছাড়া সাধন পথে উপদেষ্টার অভাবে বহু সময়ে নানাবিধ সমস্যারও মীমাংসা করিতে পারিতেছি না। আপনি যদি দয়া করিয়া আমাদিগকে সাধনপথে কিছু কিছু সহায়তা করেন তবে আমরা অপকৃত হইব।"

আমি বলিলাম, "তোমাদের কথা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইলাম। তোমরা গুরুর মৃত্যু হইয়াছে বলিতেছ। বাস্তবিক পক্ষে গুরুর কি কখনও মৃত্যু হয়? তোমরা এখনও গুরু কাহাকে বলে তাহা চিনিতে পার নাই। যদি পারিতে তাহা হইলে এইরূপ কথা বলিতে না। একবার গুরুলাভ হইলে কখনই তাঁহার সহিত সম্বন্ধচ্ছেদ হয় না। যিনি মৃত্যু হইতে উদ্ধার করিবেন তাঁহারই যদি মৃত্যু হয় তাহা হইলে তাঁহার সার্থকতা কি? সত্য কথা বলিতে কি, তোমরা এখনও গুরু প্রাপ্তই হও নাই। তোমরা মানুষকে গুরু বলিয়া মনে করিয়াছ। তাই তোমাদের এই প্রকার লাঞ্ছনা। গুরু গুরুই—গুরু নিত্য। মানুষ কখনও গুরু হইতে পারে না।"

'গুরু গুরুই—গুরু নিত্য। মানুষ কখনও গুরু হইতে পারে না'—একথা বলায় ভক্তেরা প্রশ্ন করিল, তাহা হইলে আমাদের কর্ত্তব্য কি?

আমি—তোমাদের প্রধান এবং প্রথম কর্ত্তব্য, গুরু লাভ করা। তারপর কি করিতে হইবে তাহা গুরুই বলিয়া দিবেন—আমাকে বলিতে হইবে না।

প্রধান ভক্ত—এ তো বড় বিষম কথা—আবার গুরু কোথায় পাইব?

আমি—গুরু খুঁজিতে হয় না। শিষ্য হইতে পারিলে ঘরে বসিয়াই গুরু পাওয়া যায়। তোমাদের মধ্যে কেহই এখন পর্য্যন্ত শিষ্যই হইতে পার নাই। শিষ্য হইতে পারিলে গুরু পাইতে কোন বেগ সহ্য করিতে হয় না। তোমাদের একমাত্র কর্ত্তব্য নিজের মধ্যে শিষ্যোচিত গুণের বিকাশ করা। এদিকে ওদিকে গুরু না খুঁজিয়া নিজে শিষ্য হইতে চেষ্টা কর।

প্রধান ভক্ত—কি প্রকারে শিষ্য হইতে হয় তাহা তো জানি না। শিষ্যের লক্ষণ কি?

আমি—শিষ্যের প্রধান লক্ষণ এই, অবিচলিতভাবে পূর্ণ বিশ্বাসের সহিত অর্থাৎ সংশয়শূন্য হইয়া গুরু-আজ্ঞা পালন করিতে চেষ্টা করা।

প্রধান ভক্ত—আমরা কি এতদিন গুরু আজ্ঞা পালন করি নাই?

আমি—গুরু আজ্ঞা পালন করিয়াছ বটে, কিন্তু বিচারপূর্ব্বক। নির্বিচারে গুরু আজ্ঞা পালন করিবার শক্তি এখনও তোমাদের হয় নাই। মনে কর গুরু যদি তোমাকে তেতলা বা চারতলা ছাদ হইতে নীচে লাফাইয়া পড়িতে বলেন এবং নীচে যদি প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ড থাকে, তুমি কি বিনা বিচারে একটুও ইতস্ততঃ বা দ্বিধা না করিয়া আজ্ঞা পাওয়া মাত্রই লাফাইয়া পড়িতে পার?

প্রধান ভক্ত—না; তা পারিব না। কিন্তু গুরু এমন কথাই বা বলিবেন কেন? যাহা আমাদের পক্ষে অসম্ভব সেরূপ আদেশ তিনি দিবেন কেন?

আমি—তিনি কেন দিবেন সে প্রশ্ন করার তোমার অধিকার নাই। তাঁহার আদেশ ন্যায়সঙ্গত কিংবা ন্যায়সঙ্গত নহে বলে বিচারের অধিকার তোমার নাই। শিষ্যের একমাত্র কর্ত্তব্য আদেশ পালন করা, অন্ততঃ পালনের চেষ্টা করা। ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে, তোমরা আদেশ পালনে অযোগ্য। সেইজন্য তোমরা প্রকৃত শিষ্য হইবার অধিকারশূন্য। তাই এতদিন গুরু পাও নাই। যে প্রকৃত শিষ্য হইবে সে গুরুর আজ্ঞা বিচার করিয়া পালন করিতে চেষ্টা করিবে না। গুরুতে গুরুত্ব বোধ না থাকিলে নিজের যুক্তি ও বিচার অবলম্বন করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে চলিতে হয়। ঠিক ঠিক গুরুবোধ থাকিলে আদেশ পালনে দ্বিধা আসে না। যদি কিছু বাধা-বিপত্তির সম্ভাবনা থাকে গুরুই সেখানে রক্ষা করেন।

আমর এই কথা শুনিয়া ওখানকার ভক্তমণ্ডলীর সকলেই ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িল। যাহাকে এই মণ্ডলীর মধ্যে প্রধান বলিয়া উল্লেখ

করিয়াছি তিনি বলিলেন, "তাহা হইলে তো আমাদের গুরু লাভের আর কোন আশাই নাই। কোনদিন যে এইরূপ শিষ্য হইতে পারিব সে আশাও হয় না। কিন্তু প্রাণের একান্ত আকাঙ্ক্ষা সদ্‌গুরুর পদপ্রান্তে বসিয়া শিক্ষা লাভ করিব এবং যোগ্যতা অর্জ্জন করিব।"

আমি বলিলাম, "দেখ, গুরু সর্ব্বজ্ঞ। তোমার আধার কতটুকু এবং সামর্থ্য কি পরিমাণ তাহা তিনি জানেন। বাস্তবিক পক্ষে তাঁহার কৃপা বিনা প্রকৃত শিষ্যভাবও কেহ লাভ করিতে পারে না। কিন্তু তোমাতে যদি আন্তরিকতা থাকে এবং গুরু আজ্ঞা পালনের জন্য আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা থাকে তাহা হইলে তিনি প্রসন্ন হইয়া তোমাকে দর্শন দিতে পারেন। তারপর তাঁহার সঙ্গগুণে ও শিক্ষার প্রভাবে তোমার শিষ্যোচিত গুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে। তখন তাঁহার সহিত তোমার আত্মিক যোগ সংস্থাপিত হইবে। পরে এমন একটি অবস্থার উদয় হইবে যেখানে গুরু শিষ্যের ভেদ লুপ্ত হইয়া যাইবে ও এক অদ্ভুত শান্তি বিরাজ করিবে।"

ইহার পর আরও নানা বিষয়ে কথাবার্ত্তা হইল। আমি প্রতিদিনই সেখানে যাইতাম এবং তাহারাও আমার উপদেশ গ্রহণ করিত।

আমি ক্রমেই অনুভব করিতে লাগিলাম তাহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও চিত্ত গুরু প্রাপ্তির জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল।

তখন আমি ঐখানে উপস্থিত কয়েকটি ভক্তের মধ্যে দুই-তিনজনকে উপদেশ দিলাম। উপদেশ আর কিছুই নহে, কি নাম করিবে এবং কি প্রকার ধ্যান করিকে, সে বিষয়ে কিছু বলিয়া দিলাম। আমি তাহাদিগকে বুঝাইয়া বলিলাম যে, আসনে বসিবার সময় পূজা-গৃহের দ্বার রুদ্ধ করিয়া যেন বসে, যাহাতে সাধনার সময় অন্য লোক গৃহে প্রবেশ করিতে না পারে। এই সাধনার পক্ষে রাত্রিকাল উপযুক্ত সময়, ইহাও বুঝাইয়া বলিলাম। সাধনার সময় আসন যেন কখনও ত্যাগ না করে, এমন কি কোন বিশেষ কারণে ভীতির সঞ্চার হইলেও আসন ছাড়িয়া যেন না উঠে, এ বিষয়ে প্রত্যেককে সতর্ক করিয়া

দিলাম। সরলতা, ঐকান্তিকতা, নিষ্ঠা এবং গাঢ় বিশ্বাস এইসব সদ্‌গুণ অত্যন্ত উপযোগী। এইজন্য প্রত্যেককে বুঝাইয়া দিলাম যে মানুষ নিজের প্রিয়জনকে দর্শন করিবার জন্য যেমন তীব্র উৎকণ্ঠার সহিত পথপানে চাহিয়া থাকে, ঠিক সেই প্রকার আবেগ ও উৎকণ্ঠার সহিত তাঁহার আগমনের জন্য প্রতীক্ষার ভাব হৃদয়ে পোষণ করিতে হইবে।

ইহার পর তাহারা সকলেই নবীন উদ্যমে সাধনে প্রবৃত্ত হইল, এবং তিন চারিমাস গত হইলে ঐ সকল ভক্তদিগের মধ্যে যিনি প্রধান ছিলেন তাঁহার জীবনে একটি অদ্ভুত পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইতে আরম্ভ হইল। ক্রমশঃ সেই ভক্তটি ভগবানের দর্শন লাভ করিতে আরম্ভ করিল এবং এই দর্শনের অবস্থার পর আবির্ভূত স্বরূপের সহিত তাঁহার আন্তরিক সম্বন্ধ ক্রমশঃ গভীর হইতে লাগিল। আবির্ভূত রূপের নিকট হইতে সে ননাপ্রকার উপদেশ লাভ করিত এবং শুধু অধ্যাত্মিক বিষয়ে নহে, সাংসারিক বিষয়েও অনেক মূল্যবান জ্ঞানের কথা তাঁহার নিকট হইতে প্রয়োজন অনুসারে প্রাপ্ত হইত। দীর্ঘকাল পরে সে আবির্ভূত ভগবানের কৃপায় বিশ্বরূপ দর্শন লাভের সৌভাগ্য প্রাপ্ত হইয়াছিল। সেই আবির্ভূত পুরুষের নিকট হইতে নানাপ্রকার জ্ঞানের উপদেশ পাইত এবং যোগক্রিয়া সম্বন্ধেও সাহায্য প্রাপ্ত হইত। এইরূপ যখন যাহা হইত সে আমাকে আসিয়া জানাইত এবং সর্ব্বপ্রকারেই আমার আদেশ অনুসারে চলিতে চেষ্টা করিত।

একজন ভক্তের জীবনে আধ্যাত্মিক পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া ক্রমশঃ অনেকের মধ্যেই সাধন বিষয়ক উৎসাহ ও আন্তরিকতা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ইহার ফলে তাহাদের মধ্যেও কাহারও কাহারও অল্পাধিক বিকাশ আরম্ভ হইল। এই ভাব ক্রমশঃ চারিদিকে সঞ্চারিত হইতে লাগিল। তাহার ফলে বহু লোক ভগবৎ সাধনের পথে আসিয়া উপস্থিত হইল। শেষে এইভাবের এত অধিক বিস্তার হইতে লাগিল যে আমার সঙ্গে মোটেই দেখা হয় নাই এমন বহুলোকও নিজ স্থান

হইতেই বিশ্বাসের জোরে এই সাধন প্রাপ্ত হইতে লাগিল এবং আবির্ভূত ভগবৎ স্বরূপের মুখ হইতে আমার নাম ধাম জানিয়া আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিতে থাকিল।

ইহা ভগবৎ লীলা, ভগবৎ ইচ্ছাতেই ইহা আরব্ধ হইয়াছে এবং যতদিন তাঁহার ইচ্ছা ইহা চলিবে। এইপ্রকার সাধনা কিছু নূতন নহে—ইহা বৈদিক যুগ হইতেই চলিয়া আসিতেছে এবং শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট ভগবৎ সাধনার প্রকার ইহাই। বস্তুতঃ ইহা ভক্তি সাধন, কর্ম্ম ও জ্ঞান ইহা হইতে ফুটিয়া উঠে। তাহার জন্য পৃথক সাধন করিতে হয় না।

এইভাবে ভগবানের সঙ্গে আমারা প্রায় দুই ঘণ্টা আলাপ আলোচনা করিয়া বাড়ী ফিরিলাম। ইহার পর একদিন প্রণবাশ্রমে যাইয়া সাধক ও সাধিকাগণের সঙ্গে দেখা করিলাম ও তাঁহাদের নিজ মুখ হইতে তাঁহাদের নিজের অনুভূতি ধারণা করিতে চেষ্টা করিলাম। তাহা হইতে বুঝিলাম যে ঐখানে উপস্থিত ভক্তগণের মধ্যে অনেকেই অলক্ষ্যে ভগবানের দর্শন পায় এবং কাহারও কাহারও বিভিন্ন প্রকার লীলাও তাঁহার সঙ্গে হইয়া থাকে। যে প্রধান ভক্তটির কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে তিনি নিজের অনুভূতিকে বিশ্লেষণ করিয়া আমাদিগকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন। ঐ ভক্তটি প্রথম দিন গোপাল মূর্ত্তিতে দর্শন পাইয়াছিলেন। মধ্যরাত্রে গৃহদ্বার ভিতর হইতে অর্গল বদ্ধ ছিল। গৃহটিতে কোন প্রকার আলো ছিল না। কোন দিকেই কোন প্রকার সাড়াশব্দও ছিল না। তখন ভক্তটি আসনে উপবিষ্ট অবস্থাতেই অনুভব করিলেন যেন একটি ক্ষুদ্রকায় শিশু তাঁহার ক্রোড়দেশে উপবিষ্ট রহিয়াছে। তিনি গুরুর আদেশে চক্ষু উন্মীলিত করিতে চেষ্টা করেন নাই, কিন্তু চক্ষু উন্মীলিত না হইলেও শিশুর লাবন্যময় রূপ অন্তর্দৃষ্টির দ্বারা হৃদয়ের মধ্যে সম্পূর্ণভাবে দেখিতে পাইয়াছিলেন। ক্রমশঃ ধ্যান গাঢ় হওয়াতে চক্ষু নিমীলিত রাখা আবশ্যক হইত না প্রথম দিন শিশুটির দর্শন পাইয়া এবং উহার অঙ্গ স্পর্শ লাভ করিয়া অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁহার গাঢ় ধ্যানের অবস্থা আবির্ভূত হইয়াছিল। ঐ গাঢ়

ধ্যানেই সেদিন সমস্ত রাত্রি কাটিয়া যায়। প্রাতঃকালে সমাধি হইতে ব্যুত্থিত হইয়া তিনি পূর্ব্ব রাত্রির ঘটনা স্মরণ হওয়াতে উহাকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারেন নাই। তিনি উহাকে মনঃকল্পিত দর্শন বলিয়াই ধারণা করিয়াছিলেন। তাই পরদিন সন্দেহ ভঞ্জনের জন্য তিনি আশ্রমসংলগ্ন পুষ্পবাটিকা হইতে পুষ্প চয়ন করিয়া ঐসকল পুষ্পের দ্বারা নানাপ্রকার পুষ্পময় আভরণ রচনা করেন। ফুলের মুকুট, ফুলের হার, ফুলের নূপুর, অঙ্গুরীয়ক, ফুলের মনিবন্ধ, ফুলের দুল এইপ্রকার ফুলের গহনা নিজ হাতে নির্ম্মাণ করিয়া অত্যন্ত যত্নের সহিত সেগুলিকে রক্ষা করেন। পরের রাত্রিতে ঐগুলি পূজা গৃহে রাখিয়া যথাসময়ে নিজের আসনে উপবেশন করেন। ঐদিন পূর্ব্বের ন্যায় ধ্যানাবস্থায় একটি শিশুর আবির্ভাব হয়। তিনি উহাকে গোপালের মূর্ত্তি বলিয়াই ধরিয়াছিলেন। তখন পূর্ব্বরচিত ফুলের অলঙ্কারগুলি তিনি ঐ গোপাল মূর্ত্তিতে অর্পণ করেন অর্থাৎ ঐ সকল অলঙ্কার দিয়া গোপালকে সর্ব্ব অঙ্গে সাজান। গোপাল পুষ্প সজ্জায় সজ্জিত হইয়া আনন্দে নৃত্য করিতে থাকে এবং ভক্তের চিত্তকে একাগ্র করিবার জন্য প্রকৃত শিশুর ন্যায় তাঁহার ক্রোড়ে যাইয়া উপবেশন করে। কিছুক্ষণ ঐ শিশুমূর্ত্তিটিকে কোলে করিয়া রাখার ফলে ভক্তটির চিত্তে ধ্যানাবস্থার ভাব উদয় হয়, এমনকি সমাধি অবস্থার আভাস জাগিয়া উঠে। ঐ সমাধি অবস্থায় সমস্ত রাত্রি কাটিয়া যায়। পূর্ব্বদিনের ন্যায় প্রাতঃকালে সমাধি হইতে জাগরণ হয়। তখন পূর্ব্ব রাত্রির সকল ঘটনা স্মৃতিপথে উদিত হয়। ঔৎসুক্যবশতঃ ফুলের মালাগুলি খুঁজিতে যাইয়া দেখেন উহার একটিও বিদ্যমান নাই। বেশ বুঝিতে পারিলেন, মূর্ত্তির তিরোভাবের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাকে পরানো অলঙ্কার-গুলিও তিরোহিত হইয়াছে। ইহার দ্বারা চিত্তে দৃঢ় প্রতীতি জন্মিল, যে মূর্ত্তি তাঁহাকে দর্শন দেন তাহা মিথ্যা নহে, পরন্তু সম্পূর্ণ সত্য। সেইজন্য বাস্তব জগতের বস্তু ফুলের অলঙ্কারগুলি পর্য্যন্ত মূর্ত্তির সঙ্গে সঙ্গে তিরোহিত হইয়াছে। ইহার পরদিন ঐ ভক্তটি গোপালের দর্শন

যখন পান তখন দেখিতে পাওয়া যায় যে পূর্ব্ব দিনের তিরোহিত সব অলঙ্কার তাহার সর্ব্বাঙ্গে পরানো রহিয়াছে। এইরূপ বহু ঘটনা ঐ ভক্তটির জীবনে ঘটে।

আবির্ভূত মূর্ত্তির সঙ্গে ভক্তটির ঘনিষ্ঠতা ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল। ঐ মূর্ত্তি আবির্ভূত হইয়া ভক্তের সঙ্গে শুধুই যে লীলা খেলা করিতেন এমন নহে, তিনি ভক্তটিকে যোগ ও জ্ঞানের পথে অগ্রসর হইতে সাহায্য করিতেন। বাহ্য গুরু বাহির হইতে উপদেশ দ্বারা জ্ঞান দান করেন এবং কর্ম্মের পথ নির্দ্দেশ করেন, কিন্তু অন্তর্য্যামী গুরু ভিতর হইতে প্রত্যক্ষভাবে তত্ত্ব প্রদর্শন করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে স্পষ্ট রূপে যাহাতে উহা হৃদয়ঙ্গম হয় তাহার জন্য ব্যবস্থা করেন। তিনি ভক্তহৃদয়ে সর্ব্বদা বিদ্যমান থাকিলেও যতক্ষণ পর্য্যন্ত ভক্তের দেহাভিমান সম্পূর্ণরূপে বিগলিত না হয় ততক্ষণ পর্য্যন্ত প্রয়োজনানুসারে বাহ্যভাবে প্রকট হন এবং—তাহাকে স্থূল উপদেশের দ্বারা উদ্বুদ্ধ করিতে চেষ্টা করেন।

সাধক যেমন যেমন বিকাশের পথে উঠিতে থাকে তেমন তেমনই গুরুও তাহাকে উর্দ্ধ স্তরের জ্ঞানের উপদেশ দিতে থাকেন। এইভাবেই পূর্ব্বোক্ত ভক্তটি জীবনের পথে অগ্রসর হইতেছিল। একবার তাঁহাকে ভগবান বিশ্বরূপ দর্শনও করাইয়াছিলেন। এমনও দেখা গিয়াছে যে অনেক সময় লৌকিক কার্য্যের উপদেশও তাঁহার নিকট হইতে অযাচিতভাবে পাওয়া গিয়াছে।

এই সময়ে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "ভক্তটি যে দর্শন পাইতেন সে সম্বন্ধে অনেক কথাই শুনিলাম, কিন্তু তিনি সাধারণতঃ কোন্ মূর্ত্তির দর্শন পাইতেন, এই সম্বন্ধে আপনি কিছুই বলেন নাই।"

ভগবান উত্তর করিলেন, "তিনি প্রথম প্রথম গোপালমূর্ত্তির দর্শন পাইতেন, তাহার পর কিশোর বয়স্ক শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তির দর্শন পাইতেন। তাহার পর একদিন শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি এবং এই দেহের অনুরূপ (নিজেকে দেখাইয়া) আর একটি মূর্ত্তি একই সময়ে তাঁহার নিকট আবির্ভূত

হয়। তখন শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি এই দেহের প্রতিমূর্ত্তির দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া ভক্তটিকে বলেন, এবার হইতে এই রূপই তোমার নিকট আবির্ভূত হইবে, আমি এবং এই মূর্ত্তি অভিন্ন ইহা তুমি মনে রাখিও। ইহা বলিয়া শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি অন্তর্হিত হইয়া গেলেন। তাহার পর হইতে এই মূর্ত্তি তাঁহার নিকট আবির্ভূত হইতেন এবং প্রয়োজন অনুসারে তাঁহাকে যোগ ও জ্ঞানের উপদেশ দিতেন। কখনও কখনও বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্ত্তিও তিনি দর্শন পাইতেন—বস্তুতঃ সব মূর্ত্তিই তো একেরই। মূর্ত্তি ভেদে স্বরূপ ভেদ কল্পনীয় নহে। এই প্রকার মূর্ত্তি দর্শন, উপদেশ শ্রবণ ও ভাব অনুসারে তাঁহার সহিত লীলা ও নানাপ্রকার ব্যবহার—এসব অধ্যাত্মমার্গের বহিরঙ্গ মাত্র। চরমে অদ্বৈত ভূমি প্রাপ্ত হইতেই হইবে। জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা ও পূর্ণ সার্থকতা অদ্বৈতস্থিতিতে—সেখানে ভক্ত ও ভগবানে কোন ভেদ থাকে না, এক অব্যক্ত আত্মসত্তা স্বয়ংপ্রকাশরূপে বিরাজ করে। ভগবান প্রকট হইয়া জীবকে ভাবের ভিতর দিয়া, লীলাখেলার মধ্য দিয়া, ক্রমশঃ সেই পরম লক্ষ্যের দিকে নিয়া যান। যাহা হউক, ভক্তটির এই প্রকার উন্নতির অবস্থা লক্ষ্য করিয়া তাঁহার অন্তরঙ্গ অন্যান্য অনেকেই দৃঢ় আস্থাসম্পন্ন হইলেন এবং তাঁহাদের মধ্যেও বিশ্বাসের ও ব্যাকুলতার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কাহারও কাহারও নিকট আবির্ভাবও হইতে লাগিল। কয়েক মাস অতীত হইয়া গিয়াছে, হয়তো বৎসরাধিককালও হইবে, ইহারই মধ্যে বহুলোকের ভিতর পূর্ব্বোক্ত প্রণালীতে ভগবানের আত্মপ্রকাশ ঘটিয়াছে। এই সম্বন্ধে এত অধিক ঘটনা আছে যে তাহা অল্প সময়ের মধ্যে বুঝাইয়া বলা সম্ভবপর নহে। আপনি পৃথক পৃথক ভাবে সকল ভক্তদের সঙ্গে দেখা করিয়া প্রশ্ন করিয়া অনুসন্ধান করিলেই বিস্তারিত সকল বিষয় জানিতে পারিবেন।”

আমি বলিলাম, “এত সহজে এত দুর্লভ জিনিষ মানুষ লাভ করিতে পারে তাহা সাধারণতঃ জগৎ ধারণা করিয়া উঠিতে পারে না।

কিন্তু আপনি যাহা বলিতেছেন যদি তাহা প্রকৃতই সত্য হয় তাহা হইলে ব্যাপার অতি গুরুতর মনে হয়।”

ভগবান বলিলেন, “প্রাথমিক ভগবৎ দর্শন বস্তুতঃ কঠিন নহে, কিন্তু প্রকৃত ভগবৎ-দর্শন অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। কারণ বহু পরীক্ষার ভিতর দিয়া এবং অতি কঠোর কৃচ্ছ্র সাধনা অবলম্বন করিয়া সাধানার প্রকৃত ভূমিতে উপনীত হইলে পর প্রকৃত গুরুরূপে ভগবৎ দর্শনলাভ করা যায়। তখন তাঁহার নিকট হইতে যে উপদেশ পাওয়া যায় তাহারই সাহায্যে অপরোক্ষ অনুভূতি বা আত্মসাক্ষাৎ জন্মে। কিন্তু বর্ত্তমান যুগে মনুষ্যের মন যে প্রকার বিশ্বাসহীন ও শ্রদ্ধাহীন তাহাতে প্রাথমিক দর্শনও অতি কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। মানুষের চিত্ত বর্ত্তমান যুগে তর্ক ও সংশয়-প্রধান। সরল বিশ্বাস আজকাল অত্যন্ত দুর্লভ। তাই সহজ বস্তুও অত্যন্ত দুর্লভ হইয়া পড়িয়াছে। ভগবান্ আবির্ভূত হইয়া গুরুরূপে ভক্তকে চালনা করেন এবং যখন তাহার পক্ষে যাহা আবশ্যক তখন তাহাকে তাহাই জ্ঞান, উপদেশ বা শক্তিরূপে দান করিয়া থাকেন। এই গুরুই সদ্‌গুরু। ইহাকে একবার পাইলে আর কখনই গুরুর অভাবজনিত কষ্ট অনুভব করিতে হয় না।”

আমরা দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত ভগবানের সঙ্গে বার্ত্তালাপ করিতেছিলাম। তাঁহার কথাগুলি বেশ চিত্তাকর্ষক বোধ হইয়াছিল এবং কোন অংশই শাস্ত্রবিরুদ্ধ বলিয়া মনে হইতেছিল না। কিন্তু ব্যাপকভাবে একই সময়ে এই প্রকার ভগবৎ-রূপের আবির্ভাব এবং নিয়মিতভাবে ভক্ত-দিগকে চালনা করিবার ভার গ্রহণ করা আশ্চর্য্য বোধ হইতেছিল। আমি আমার মনের ভাব ভগবানকে নিবেদন করিলাম। তিনি বলিলেন, “বর্ত্তমানে জীবের অত্যন্ত দুরবস্থা। জীব মলিন বলিয়া এবং অশক্ত বলিয়া প্রকৃত প্রস্তাবে সে ঠিক পথে চলিতে পারে না ও কিছু করিতেও পারে না। তাছাড়া, তাহাকে চালাইয়া লইয়া যাইতে পারে এরূপ জ্ঞানী ব্যক্তিরও অভাব। তাই বর্ত্তমান যুগের উপযোগিভাবেই ভগবান প্রকট হইয়াছেন।” তিনি আরও বলিলেন,

"বর্ত্তমান যুগে তাঁহার নিজ দেহের বিশেষ উদ্দেশ্য আছে। এই দেহকে আশ্রয় করিয়া বিশ্বাসী ভক্তগণের হৃদয় একই সময়ে বহুস্থানে ভগবৎস্বরূপ প্রকট হইতেছেন এবং ভক্তের সঙ্গে নানাপ্রকার লীলা-খেলা করিয়া ভক্তদের চিত্তবিনোদন করিতেছেন। এই দেহের কোন বৈশিষ্ট্য আছে কিনা তাহা আপনারা বিচার করিবেন।"

আমরা প্রথম দিন ভগবানকে প্রণতি জ্ঞাপনপূর্ব্বক ঐস্থান হইতে উঠিলাম। শিক্ষিত ও মার্জ্জিত রুচি বলিয়া ভগবানের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করিতে কোন অসুবিধা হয় নাই। উনি পূর্ব্বে কলিকাতায় ওকালতি করিতেন এবং বহুদিন কলিকাতায় অবস্থানের পর শেষ বয়সে কাশীবাসের জন্য বেনারসে আগমন করেন। পরে শুনিতে পাইলাম ইনি পরলোকগত সন্তদাস বাবাজীর সঙ্গে অতি ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলেন। যখন তরাকিশোর চৌধুরী নামে উক্ত সন্তদাস বাবাজী মহারাজ কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতি করিতেন তখনই ভগবানের সঙ্গে তিনি অন্তরঙ্গভাবে মিশিবার অনেক সুযোগ পাইয়াছিলেন। শ্রদ্ধাস্পদ তারাকিশোরবাবু ইঁহারই নিকট পাতঞ্জল দর্শনের ব্যাসভাষ্য সমগ্রটা অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। এই সম্বন্ধে বহু সংবাদই পরে প্রাপ্ত হইয়াছিলাম।

ইহার পর আমরা ভক্তদের মধ্যে অনেকের সঙ্গে পৃথগ্‌ভাবে দেখা করিয়াছিলাম এবং এই ব্যাপারের বিস্তারিত বিবরণ সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। ব্যক্তিগতভাবে কোন ভক্তের নাম উল্লেখ করা আমি সঙ্গত বোধ করি না। কিন্তু সকলের সঙ্গে আলোচনা করিয়া ইহা বুঝিয়াছিলাম যে, ভক্তগণ ইঁহাকেই সাক্ষাৎ ভগবান্ বলিয়া মনে করিতেন। বাস্তবিক পক্ষে সকল ভক্তই সাধারণতঃ ইঁহারই রূপের দর্শন পাইতেন এবং যাঁহারা ধ্যান করিতেন তাঁহারাও ইঁহারই ধ্যান করিতেন। কোন কোন স্থলে অবির্ভাব শীঘ্র হইত, কোন কোন স্থলে বিলম্বে হইত। অবশ্য ইহার কারণ আছে। কিন্তু কোন কোন স্থলে আবির্ভাব মোটেই হইত না—ইহাও দেখা গিয়াছে।

ভগবান্ বলিয়াছিলেন যে ইহাই বর্ত্তমান যুগের ধর্ম্ম। এখন কঠিন তপস্যা করিয়া ভগবৎ প্রাপ্তির পথে যাওয়া জীবের পক্ষে সম্ভব নহে। ভক্তিমার্গই কলির উপযোগী—এই ভক্তি হইতে যোগ ও জ্ঞান আপনি ফুটিয়া উঠে। শঙ্করাচার্য্যের উপর ভগবানের অটল শ্রদ্ধা ছিল, কিন্তু তিনি শঙ্করের শারীরক ভাষ্য হইতে ব্যাসদেবের যোগভাষ্যকে অনেক উচ্চে স্থান দিতেন।

এই অভিনব ভগবৎ সাধনার বৃত্তান্ত অল্পদিনের মধ্যেই বহু স্থানে প্রচারিত হইয়াছিল। শ্রীহট্ট, শিলং, চট্টগ্রাম, বরিশাল, গোরক্ষপুর প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানে অনেক লোক এই সাধন পন্থা গ্রহণ করিয়াছিল। ইহাদের মধ্যে অনেকেই অনেক প্রকার অনুভূতিও প্রাপ্ত হইত।

স্বর্গীয় প্রণবানন্দ স্বামীজীর একটি শিষ্যা ছিলেন, তাঁহার নাম এখানে উল্লেখ করিলাম না। তিনি যোগমার্গে খুব উন্নত হইয়াছিলেন। তিনিও এই অভিনব ভগবানের প্রধান ভক্তের মধ্যে স্থান লাভ করিয়াছিলেন। শ্রীহট্ট প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানে তিনি বহু লোককে এই মার্গের সাধনাতে আকৃষ্ট করিয়াছিলেন। ইহাদের অনেকেরই অল্পাধিক অনুভূতি ও দর্শন হইত। যিনি যেরূপ দর্শন এবং উপদেশাদি প্রাপ্ত হইতেন যথাসময়ে কাশীতে নিজ গুরু অথবা ভগবানের নিকট উহার বিবরণ পাঠাইয়া দিতেন। অনেকে প্রতিদিনের অনুভব ডায়েরী আকারে প্রত্যহ লিখিয়া রাখিতেন, পরে উহা পুস্তকাকারে নিবদ্ধ করিয়া কয়েকমাস পর পর ভগবানের নিকট প্রেরণ করিতেন। এইভাবে তীব্রবেগে চারিদিকে এই লীলার বিস্তার হইয়াছিল। যখন যেখান হইতেই যে কাগজপত্র আসিত আমি ভগবানের নিকট হইতে তাহা লইয়া পাঠ করিতাম এবং লীলার প্রগতি অনুভব করিয়া বিস্মিত হইতাম। ঐ সময়কার বিভিন্ন ভক্তদের যাবতীয় অনুভূতি সংগ্রহ করিয়া একসঙ্গে রক্ষা করিলে উহা একখানা মহাভারতের মত বিশাল গ্রন্থে পরিণত হইত। লীলা তীব্রবেগে কয়েক বৎসর

চলিয়াছিল এবং ইহারই মধ্যে কোন কোন সাধকের মহাজ্ঞানের আভাস পর্য্যন্ত আসিয়াছিল, এইরূপ শুনা যায়। কিন্তু তাহার পর ক্রমশঃ প্রচারের বেগ মন্দীভূত হইয়া আসে। প্রথম প্রথম যে উৎসাহ বা যে উদ্যমের সহিত ভক্তগণ কার্য করিতেন কালক্রমে উহাতে শিথিলতা আসার সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশের মধ্যেও মন্দতা আসিয়াছিল, ইহা অবশ্যই স্বাভাবিক।

এই লীলার সময় স্বাভাবিক একটি বিরুদ্ধ পক্ষও রচিত হইয়াছিল। কিন্তু অনেক সময় দেখা গিয়াছে, বিরুদ্ধ পক্ষের বিরুদ্ধ আচরণ সত্ত্বেও লীলার বেগ বর্দ্ধিত হইয়াছে এবং লীলার প্রচারও প্রসারিত হইয়াছে। বিরুদ্ধ শক্তি অন্তর্নিহিত সত্যের উত্তেজক হইয়া থাকে, তাহাতে সত্য কখনও অভিভূত হয় না। কিন্তু যে সত্যকে ধারণ করিবে তাহার হৃদয় যদি বিশ্বাসহীন হয় অথবা সংশয়াক্রান্ত হয় কিংবা বৈষয়িক ব্যাপারে লিপ্ত হয় তাহা হইলে ভগবৎ কৃপাশক্তি প্রকাশের দ্বার রুদ্ধ হইয়া যায়।

এই প্রসঙ্গে একটি শিক্ষাপ্রদ অথচ রোচক সত্য ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। তাহা হইতে সত্যের সন্ধান সহজে পাওয়া যাইতে পারিবে। কাশীর মহারাষ্ট্রমণ্ডলীর মধ্যে একজন সাধক এই লীলার বিষয় জ্ঞাত হইয়া কিভাবে ভগবানের অনুগ্রহভাজন হইতে পারিবেন সেইজন্য ব্যাকুল হইয়া পড়েন। ভদ্রলোকটি আমার সবিশেষ পরিচিত ছিলেন এবং প্রায়ই আমার সঙ্গে দেখা করিবার জন্য আমার নিকট আসিতেন। তিনি একদিন অত্যন্ত আর্ত্তভাবে আমাকে তাঁহার আকাঙ্ক্ষা জ্ঞাপন করেন। আমি তাঁহাকে ভগবানের প্রদত্ত সাধারণ উপদেশ শুনাইয়া দিলাম। এই উপদেশের মর্ম্ম এই—যদি কেহ এই লীলায় বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন এবং সরলভাবে ইহাকে ভগবল্লীলা বলিয়া ধারণা করিতে পারেন তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে ভগবদনুগ্রহ প্রাপ্তির দুইটি মাত্র পথ আছে—এক, ভগবানের নিজ নাম। সেই নামঘটিত একটি কল্পিত মন্ত্র মনে মনে চিন্তা করিতে হয়। ভগবানের

নিজ নাম 'কিশোরী'। তাই ঐ নামটি ঐ মন্ত্রের প্রধান অবয়ব ছিল। এতদ্ব্যতীত ভগবানের একখানা ফটো সম্মুখে রাখিয়া তাঁহার মূর্ত্তি ধ্যান করা আবশ্যক। এই স্থূল মূর্ত্তি ভগবানের রূপ, ইহার ধ্যান ও তাঁহার নাম, এই দুইটি অবলম্বন করিতে পারিলে সাক্ষাৎভাবে ভগবানের সঙ্গে দেখা না হইলেও সূক্ষ্মে তাঁহার দর্শন ও অনুগ্রহ লাভ সম্ভবপর। ইহাই ভগবানের নির্দ্দেশ ছিল এবং ইহা তিনি সর্ব্বত্র প্রচার করিয়াছিলেন। আমি ইহাই উক্ত মহারাষ্ট্রীয় ভদ্রলোককে জানাইয়া দিয়াছিলাম। ইহার পর কয়েকদিন অতিক্রান্ত হয়। ভদ্রলোকটি ভগবানের নিকট তো যানই নাই, আমার নিকটও আর আসেন নাই। একদিন প্রাতঃকালে প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া হঠাৎ তিনি আমার নিকট দেখা করিতে আসেন। তাঁহাকে দেখিয়া মনে হইল তিনি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া আসিয়াছেন। তিনি বলিতে লাগিলেন—"সেদিন আমি আপনার নিকট হইতে ভগবানের প্রচারিত বাণী শ্রবণ করিয়া নিজেও ভগবদনুগ্রহ প্রাপ্ত হইবার জন্য তীব্র উদ্যম করিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম। আমি যথাশক্তি সর্ব্বদাই ভগবানের নাম স্মরণ করিতাম এবং ফটোতে দৃষ্ট তাঁহার রূপ চিন্তা করিতাম। তিন চারিদিনের অভ্যাসে এমন হইয়াছিল যে, যে দিকেই তাকাইতাম সেই দিকেই ভগবানের রূপ দেখিতে পাইতাম—বৃক্ষের দিকে তাকাইলে আলোর মধ্যে ভগবানের রূপ প্রতি পত্রে অঙ্কিত দেখিতে পাইতাম। শুনিয়াছি ভগবানের বৃদ্ধ শরীর, কিন্তু আমি তাঁহাকে কিশোর মূর্ত্তিতে দেখিতে পাইতাম—মস্তকে চূড়া, গলায় মালা, অনেকটা শ্রীকৃষ্ণমূর্তির মত। কিন্তু মুখখানা কিশোরী ভগবানের সেই ফটোর অনুরূপ। এইভাবে কয়েকদিন কাটিবার পর আজ প্রাতঃকালে এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটিয়াছে। আমি প্রাতঃকালে শৌচাদি সমাপন করিয়া অন্যান্য দিনের ন্যায় আহ্নিক করিবার জন্য আসনে বসিয়াছি। বসিবার সঙ্গে সঙ্গেই আমার সম্মুখে হঠাৎ আমার গুরু মূর্তি প্রকট হইল। গুরুদেব ১০।১২ বৎসর পূর্বে কাশীলাভ করিয়াছেন। এত দিনের মধ্যে

কখনও তাঁহার রূপ দেখিতে পাই নাই। আজ দেখিলাম গুরুদেব অত্যন্ত রুষ্টভাবে আমার সম্মুখে আসিয়া বসিলেন। তাঁহার ললাটে ভস্মরেখা, বিশুদ্ধ তেজঃপূর্ণ মূর্ত্তি। চক্ষু দেখিয়া মনে হইতেছিল যেন অগ্নির ছটা নির্গত হইতেছে। তিনি আমার দিকে কুপিত দৃষ্টিপাত করিয়া একটি শ্লোক উচ্চারণ করিলেন। শ্লোকটি এই—

"মা গমঃ কিমপি স্থানং যথাপূর্ব্বং সমাচর।
ভগবত্যাঃপরঃ কশ্চিৎ ভগবান্ ন হি বর্ত্ততে॥"

এই শ্লোকটির তাৎপর্য্য এই যে, আমি যেন বৃথা এদিক ওদিক বিচরণ না করি, একমাত্র গুরুদত্ত সাধন নিয়াই যেন তন্ময় থাকি, কারণ ভগবতী হইতে উৎকর্ষসম্পন্ন ভগবান বলিয়া কোন বস্তু নাই। ইহা হইতে বুঝিলাম, আমি যে ভগবানের রূপ ধ্যান ও তাঁহার নামজপ করিতেছিলাম তাহা আমার গুরুদেবের ইষ্ট নহে। তিনি আমাকে ঐ কথা বলিয়াই অন্তর্হিত হইয়া গেলেন। আমি ভগবতী শ্রীমাতার (ত্রিপুরসুন্দরীর) উপাসক তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া পৃথগ্‌ভাবে ভগবৎ চিন্তা করা গুরুদেবের অভিপ্রেত নহে। এই পরিস্থিতিতে আমার কি কর্ত্তব্য? আমি ভগবানের নাম জপ ও রূপ চিন্তা উভয়ই পরিত্যাগ করিয়াছি।" উক্ত মহারাষ্ট্রীয় ভদ্রলোকের ইচ্ছা ছিল একদিন ভগবানের সাক্ষাৎ দর্শন করিবেন, কিন্তু এই ঘটনার পর আর তাহা সম্ভব হইল না।

পরে যখন ভগবানের সঙ্গে আমার দেখা হইয়াছিল তখন তাঁহাকে মহারাষ্ট্রীয় ভদ্রলোকের বৃত্তান্তটি আদ্যোপান্ত বর্ণনা করিয়া শুনাইয়াছিলাম। ভগবান বলিলেন, "ভদ্রলোকটির দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে, কারণ তিনি ভগবদনুগ্রহ পাইয়াও হারাইলেন। তাঁহার বুঝা উচিত ছিল, গুরুদত্ত নাম সুদীর্ঘকাল জপ করিয়াও গুরুর স্থূল দর্শন বহু বৎসরের মধ্যেও একদিনের জন্যও তাঁহার হয় নাই, অথচ এই নাম জপের সঙ্গে সঙ্গেই গুরুর স্থূল মূর্তি প্রকট হইল। ইহার হেতু কি? একটু সামান্য চিন্তা করিলেই তিনি বুঝিতে পারিতেন, ইহা ভগবানের

একটি পরীক্ষামাত্র। কৃপাপ্রার্থী ভক্তকে নানাভাবে পরীক্ষা করা ভগবানের স্বভাব। ভদ্রলোকটি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিলেন না।

এই ঘটনাটি ভগবৎ লীলা বিস্তারের প্রথম দিককার ব্যাপার। ইহার পর লীলা বিস্তার অনেক দূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইলে উক্ত ভদ্রলোকটির দৃষ্টি পুনর্ব্বার এই দিকে পতিত হয়। যখন তিনি বহু লোকের মুখে এই লীলার খ্যাতি শুনিতে পাইয়াছিলেন তখন আবার তাঁহার মনে ভাবের তরঙ্গ উথলিয়া উঠে—তিনি বেশ অনুভব করিতে লাগিলেন যে, তিনি পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ হইয়াছেন, নতুবা তিনি অবশ্যই ভগবৎ কৃপায় একটি বিশিষ্ট অবস্থা লাভ করিতে পারিতেন। সত্যই তাঁহার হৃদয় অনুতাপানলে দগ্ধ হইতেছিল এবং তাঁহার চক্ষু অশ্রু-ভারে আক্রান্ত হইয়াছিল। তিনি হতাশভাবে বলিলেন, "আমার কি আর কোন পথ নাই?" আমি বলিলাম, "ইহার উত্তর আমি জানি না, কৃপা অহেতুকভাবে আসে, কিন্তু তাহা প্রত্যাখ্যান করিলে সেই কৃপা আবার পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ। তবে আপনি স্বয়ং প্রত্যক্ষভাবে ভগবানের সহিত দেখা করিয়া তাঁহার নিকট আত্মনিবেদন করিলে হয়তো কোন প্রতিকার হইলেও হইতে পারে।" ইহার পর একদিন ঐ ভদ্রলোকটি ভগবানের নিকট উপস্থিত হইয়া কাতরভাবে নিজের প্রার্থনা নিবেদন করেন। ভগবান তখন পাতালেশ্বরে বাস করিতেছিলেন। ভগবান স্বভাবতঃ দয়ালু, তাঁহার কাতরতা ও দৈন্য তাঁহাকে বিগলিত করিয়াছিল। তিনি পুনরায় তাঁহাকে পূর্ব্ববৎ শ্রদ্ধার সহিত জপ ও ধ্যান করিতে আদেশ দেন। ভদ্রলোকটি বাড়ী ফিরিয়া গিয়া আবার পূর্ব্বের ন্যায় ভগবানের নাম জপ ও রূপ ধ্যান করিতে আরম্ভ করে। ইহা পূর্ব্বের ঘটনার কয়েক বৎসর পরের কথা। ইহার পর একদিন ঐ ভদ্রলোক সন্ধ্যার পর অর্থাৎ সায়ংকৃত্য সমাপন করিয়া ভগবানের দর্শনের জন্য পাতালেশ্বরের বাড়ীতে গমন করেন। তখন রাত্রি ৮টা হইবে। ভগবান দোতালাতে একটি বড় হলের মধ্যে এক প্রান্তে নিজ আসনে বসিয়াছিলেন, বহু ভক্তমণ্ডলী তাঁহাকে ঘিরিয়া

বসিয়াছিল। তাঁহাদের মধ্যে পুরুষ, স্ত্রী, বালক, বৃদ্ধ অনেকেই ছিলেন। ঐ সময় সাধারণতঃ কীর্ত্তন এবং সৎসঙ্গ হইত। ভদ্রলোকটির ইচ্ছা ছিল ঐ সৎসঙ্গে যোগদান করিয়া নিজেও কিছু তত্ত্বকথার আলোচনা করিবেন। এই ভাব লইয়াই তিনি বাড়ী হইতে রওনা হইয়া আসিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি যখন ভগবানের বাড়ীর বহির্দ্বার অতিক্রম করেন—তখনই এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটে। ঐ দ্বার ভেদ করিয়া আঙ্গিনা পার হইয়া সিঁড়ির দ্বারা উঠিয়া দোতালায় যাইতে হইত। কিন্তু ভদ্রলোকটি বাহ্যদ্বার ভেদ করার পরেই দেখিতে পাইলেন—তাঁহার পূর্ব্বে গুরুদেব উগ্র মূর্তিতে সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন—তিনি ক্রোধাবিষ্ট নেত্রে ভদ্রলোকটির দিকে তাকাইয়া নিজের দক্ষিণ হস্তের দ্বারা তাঁহার গলায় ধাক্কা দিয়া ঠেলিয়া তাঁহাকে দ্বার হইতে বাহির করিয়া দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি নিজে অন্তর্হিত হইয়া গেলেন। এদিকে ভদ্রলোকটি প্রায় হতচেতন অবস্থায় দ্বারের বাহিরে আসিয়া হাঁপাইতে লাগিলেন। এইবার গুরু তাঁহাকে কিছু বলেন নাই, কিন্তু করস্পর্শ দ্বারা ঐ স্থান ত্যাগ করাইয়া দিয়াছেন। প্রকৃতিস্থ হইতে ভদ্রলোকটির প্রায় দুই ঘণ্টা সময় লাগিয়াছিল। তিনি আর ভগবানের নিকট যাওয়ার উদ্যম করেন নাই। তারপর তিনি বাড়ী ফিরিয়া যান ও পরদিন প্রাতে আমার সঙ্গে দেখা করিয়া পূর্ব্ব রাত্রের সকল ঘটনা আমার নিকট বর্ণনা করেন। তিনি বলিলেন যে, আর তিনি কখনই ভগবানের নাম করিবেন না। তাঁহার যথেষ্ট শিক্ষা হইয়াছে। সাধন পথে চিত্তের দুর্ব্বলতা অত্যন্ত হানিকর।

আমি তাঁহার বিবরণ শুনিয়া আর কোন মন্তব্য প্রকাশ করিলাম না। কারণ স্বভাবের নিয়মে যেখানে যাহা হয় তাহাই মঙ্গল। কিন্তু অবসর মত আমি এই ঘটনা ভগবানকে নিবেদন করিয়াছিলাম। তিনি সমস্ত শুনিয়া পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছিলেন এইবারও ঠিক তাহাই বলিলেন। বলিলেন, "ভদ্রলোকটির এখনও সময় হয় নাই। মনের যে অবস্থায় ভগবৎ কৃপালাভ হয় তাহা এখনও তাঁহার উদিত হয় নাই।

ভগবৎ কৃপা ধারণ করিবার জন্য যোগ্যতা চাই। পরীক্ষা তাহারই নিদর্শন মাত্র—" বলিয়া হাসিতে লাগিলেন।

এই ভাগবত লীলাতে কোন কোন স্থানে অতি অপূর্ব্ব ব্যাপার লক্ষিত হইত। একদিন একটি স্থানীয় বিধবা ব্রাহ্মণী, বয়স ৬০ এর উপর হইবে, ভগবানের বিশেষ অনুগ্রহ ভাজন হইয়া পড়েন। তিনি অনেকদিন হইতেই লোকমুখে এবং কখনও কখনও সাক্ষাৎ ভক্ত মুখেও এই লীলার বিবরণ শুনিয়াছিলেন। শুনিয়াই তাঁহার হৃদয়ে স্বভাবতঃই একটি অহেতুক শ্রদ্ধার উদয় হয় এবং তিনি সর্ব্বদাই কখনও না কখনও ভগবানের দর্শনলাভ করিবেন এই উৎকণ্ঠায় নাম জপ এবং ভগবৎ লীলাকীর্ত্তন ইত্যাদি নিয়মিতভাবে করিতেন। একদিন মধ্যরাত্রে অতর্কিতভাবে তিনি একটি অপ্রাকৃত বালকের আবির্ভাব অনুভব করেন। বৃদ্ধা অতি দরিদ্র ছিলেন, অনেকদিন হইতেই কাশীবাস করিতেছিলেন। অতি কষ্টে তাঁর কাশীবাসের ব্যয় নির্ব্বাহ হইত। তখন তিনি একা একটি পৃথক গৃহেই অবস্থান করিতেন।

যখন তাঁহার গৃহে অকস্মাৎ এই অদ্ভুত অমানব শিশুর আবির্ভাব হইল তখন তিনি জপাদি সমাপ্ত করিয়া শয়ন করিবার জন্য উদ্যত হইতেছিলেন। ইহা মধ্যরাত্রির ঘটনা। তাঁহার নেত্রেও নিদ্রার আবেশ কিছু কিছু আসিয়াছিল, কিন্তু এই অপ্রাকৃত শিশুর আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই মুহূর্ত্তের মধ্যেই তাঁহার তন্দ্রাভাব এবং চক্ষুর জড়ত্ব কাটিয়া গেল। শুধু তাহাই নহে, তাঁহার হৃদয়ে একটি অপার্থিব বাৎসল্য ভাবের উদয় হইল। তাঁহার কোন সন্তান-সন্ততি ছিল না, সুতরাং বাৎসল্য রসের আস্বাদন তাঁহার জীবনে কখনই হয় নাই। ফলে বিধবারূপে, ব্রহ্মচারিণীরূপে তাঁহার পূর্ব্বজীবন অতিবাহিত হইয়াছে। কিন্তু আজ এই অপার্থিব শিশুর আবির্ভাবে তাঁহার হৃদয়ে বাৎসল্য-ভাবের রুদ্ধদ্বার উন্মুক্ত হইয়া পড়িল। শিশু আবির্ভূত হইয়াই বলিল, "আমাকে খেতে দাও।" এই বলিয়াই সে বৃদ্ধার কোলে ঝাপাইয়া

পড়িল। ইহা যে ভগবল্লীলা অথবা যোগমায়ার খেলা তাহা বৃদ্ধা বিস্মৃত হইয়া গেলেন। তখন বৃদ্ধা বলিলেন, "বাচ্চা, কি খেতে দেবো? ঘরে তো কিছু খাবার নাই।" বৃদ্ধার ইচ্ছা হইতেছিল সম্ভবপর হইলে অন্যস্থান হইতে কিছু সুন্দর খাদ্য সংগ্রহ করিয়া লইয়া আসেন, কিন্তু সময় অনুকূল ছিল না, কারণ উহা মধ্যরাত্রির সময়। শিশু তখন জেদ করিতে লাগিল—"মা, ক্ষুধা পেয়েছে, খেতে দাও।" বৃদ্ধা তখন কিঞ্চিৎ অপ্রস্তুত বা লজ্জা বোধ করিতেছিলেন। তখন ছেলেটি বলিল, "মা, আমার খুব মুড়ি খেতে ইচ্ছা হচ্চে। ঐ হাঁড়ির মধ্যে মুড়ি আছে, মুড়ি বের করে দাও, খাব।" মুড়ি বাহির করার পরেই ছেলেটি নিজ হাতে মুড়ি লইয়া কতকটা মার মুখে দিল ও কতকটা নিজে চর্ব্বণ করিল। তাহার পর বলিল, "মা, আমাকে কোলে নিয়ে ব'স।" বৃদ্ধা শিশুকে কোলে নিয়া বসিলেন। শিশুর অঙ্গ স্পর্শের সঙ্গে সঙ্গেই বৃদ্ধার ভাব পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে তাঁহার বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হইয়া গেল এবং তাহার পর গভীর সমাধি ভাবের উদয় হইল। এতক্ষণ পর্য্যন্ত বৃদ্ধা আসনে উপবিষ্টই ছিলেন—সমাধি ভঙ্গের পর কোথাও কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। কিন্তু ঘরে ছড়ান মুড়ি দেখিতে পাইলেন এবং রাত্রের ঘটনার স্মৃতি হৃদয়ে জাগিয়া উঠিল। এইভাবে মাঝে মাঝে তাঁহার গোপালমূর্ত্তির দর্শন ঘটিত। কিছুদিনের পর কিন্তু যখন তাঁহার মন অন্তর্মুখ হইয়া গেল তখন আর ঐ মূর্ত্তির দর্শন হইত না। তখন বৃদ্ধার অন্তর্জগতে প্রবেশ লাভ ঘটিয়া গিয়াছিল।

এই প্রকার বহু ঘটনা বহু লোকের জীবনে ঘটিয়াছে। ঐ সময়ে মনে হইয়াছিল যেন কৃপার বন্যা আসিয়াছে। যাহার চিত্ত বিশ্বাস ও ভক্তির সহিত ভগবানের দিকে উন্মুখ হইত এবং উন্মুখ হইয়া উক্ত মহাত্মার সহিত আন্তরিক যোগ স্থাপন হইত, তাঁহারই কিছু না কিছু অনুভূতি প্রাপ্তি হইত। অবশ্য অনেকের হইত না, ইহাও দেখিয়াছি এবং অনেকে বিভিন্ন কারণে এই ধারার বিরুদ্ধবাদী ছিলেন তাহাও

জানি। কিন্তু ইহাও সত্য যে, বিভিন্ন স্থানে কয়েক বৎসরের মধ্যে একটা তুফান জাগিয়াছিল। যাঁহারা ধর্ম্ম জগতের ইতিহাস অবগত আছেন তাঁহারা ওয়েলস রিভাইভেল-এর কথা অথবা ঐ জাতীয় ব্যাপক আন্দোলনের কথা অবগত আছেন। এই সময়ে ব্যাপকভাবে ভগবৎ শক্তির খেলা চলিতে থাকে। ভগবানের সংস্রবে আসিয়া কেহ কেহ সত্যই উন্নতি লাভ করিয়াছেন, ইহা জানি। আবার কাহাও কাহাও অনুভব কিছুদিন পর্য্যন্ত চলিয়াই পরে বন্ধ হইয়া গিয়াছিল, ইহাও জানি। এই বিরাট আন্দোলনের সময় উক্ত ভগবানের একজন অন্তরঙ্গ ভক্ত ও আত্মীয় নিজেও ভগবৎ কৃপা প্রাপ্ত হইয়া আধ্যাত্মমার্গে বহুদূর অগ্রসর হইয়াছিলেন। তিনি মধ্যে মধ্যে তাঁহার অনুভব পত্র দ্বারা ভগবানকে জ্ঞাপন করিতেন। ঐরূপ একখানা পত্র আমার নিকট সংরক্ষিত ছিল। উহা হইতে কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধার করিয়া দিলাম। এই উদ্ধৃত পত্রাংশ পাঠ করিলে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, ভগবদনুগ্রহ ভাবের মুখে পাওয়া তত কঠিন নহে, কিন্তু নিজের সাধন বলে উহাকে ধরিয়া রাখা এবং উহা অবলম্বন করিয়া আত্মশক্তির বিকাশ করা অত্যন্ত কঠিন।

তাঁহার উদ্ধৃত পত্রখানা এইরূপ—"…সাধন সম্বন্ধে যে সকল পত্র ইতিপূর্ব্বে লিখিয়াছি তাহা আপনার অবগতির জন্য নহে—ঐ সকল পত্র পড়িয়া যদি কোন সুকৃতিমান্ পুরুষ মাহাত্ম্যের একবিন্দু উপলব্ধি করিয়া তদভিমুখে ধাবিত হয়েন, এই উদ্দেশ্যে লিখিয়াছি। ঈশ্বরের কৃপা হইলেই ধর্ম্মতত্ত্বের অনন্ত রহস্যসমূহ একে একে প্রকাশ হইবে। সুতরাং অধিক লেখা নিষ্প্রয়োজন। তবে আমি সাধন সম্বন্ধে যে সকল কথা লিখিয়াছি তাহাতে যে অতিরঞ্জিত আছে তাহা যেন কেহ মনে না করেন। ঐ সমস্তই সত্য। সত্যস্বরূপ বস্তুকে লাভ করিতে হইলে অগ্রে অন্তরে বাহিরে সত্য হইবার চেষ্টা করিতে হয়। ইহাকেই ধর্ম্মের মূল ভিত্তি বলিয়া জানি। ধর্ম্মের ঘরে মেকী ফাঁকি চলিবে না। সূচ্যগ্র পরিমাণ মেকী থাকিলে কেহ সহস্র 'ভগবান্'

'ভববান' করুন, সমস্ত ঐ এক ক্ষুদ্র দ্বার দিয়া বাহির হইয়া যাইবে। রামকৃষ্ণ পরমহংস এই কথা বলিতেন। অবশ্য মনুষ্য মাত্রেরই ছিদ্র আছে। এই ছিদ্র ঢাকিবার জন্যই সাধনা আবশ্যক।

আমার ছিদ্রকে আমি গোপন করিতে যাই কেন ?

ইতিপূর্ব্বে আপনাকে যে বিস্তারিত পত্র দিয়াছি ঐ সময়ের অব্যবহিত পরেই চিত্তের এক অদ্ভুত প্রশান্তিবাহিতা স্থিতি অনুভব করিতে লাগিলাম। অজস্র জ্ঞানস্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল। অবশ্য এই জ্ঞান বিশুদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞান নহে। তবে ইহা যে তাহার আভাস তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। স্বচ্ছ দর্পণের সম্মুখে যে বস্তু ধরা যায়, তাহার পরিষ্কার প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হয়। যে কোন জটিল বিষয়ে চিন্তা করিয়াছি, তাহাই প্রকাশিত হইয়াছে। অনন্ত জ্ঞানের ফোয়ারা ছুটিয়াছে—এস, কাহার কত জ্ঞান চাই। জ্ঞান বলিতে পুস্তকস্থ তর্ক বিচার বুঝায় না, ভাব বা কল্পনাও বুঝায় না। ইহা প্রত্যক্ষ দর্শন—প্রত্যক্ষ অনুভূতি। কাহার দর্শন বা কাহার অনুভূতি ? যে প্রকাশ-স্বভাব বস্তু অনন্তাকারে জগদ্ ব্রহ্মাণ্ডে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে তাহারই অনুভূতি। ইনিই আমার আত্মা। আমার সহিত একাকার হইয়া রহিয়াছেন।

ইনি এতই স্নিগ্ধ, তরল ও কোমল স্বভাব যে, অনির্ব্বচনীয় উচ্ছ্বাস উহাতে সদাই নিহিত। এই উচ্ছ্বাসকে অহৈতুকী ভক্তি বলে। এবম্বিধ ভক্তিই আত্মার স্বরূপ। তবে যে উহাকে কোথাও কোথাও মনের বৃত্তি বলা হইয়াছে তাহা মনের আত্মরূপত্ব লক্ষ্য করিয়া। এই অহৈতুকী ভক্তি স্বতঃপ্রবৃত্ত। এইজন্য উহাতে জ্ঞানের সারাংশ চিদংশস্বরূপ বলিয়া উক্ত আছে। মহাযোগেশ্বর ভগবান্ কপিল বলিয়াছেন—

দেবানাং গুণলিঙ্গানামানু, শ্রবিককর্ম্মণাম।
সত্ত্ব এবৈক মনসো বৃত্তিঃ স্বাভাবিকী তুষা ॥
অনিমিত্তা ভাগবতী ভক্তিঃ সিদ্ধের্গরীয়সী।
জরয়ত্যাশুরা বেনশং নিগীর্ণমনসো যথা ॥

অগ্নি যেরূপ ভুক্তদ্রব্যকে পরিপাক করে, এই অহৈতুকী ভক্তির সূত্রপাত হইতে হইতেই উহা জীবদেহকে তদ্রূপ সত্বর জীর্ণ করিয়া ফেলে।

যে অবস্থায় ভক্তি, ভক্ত ও ভক্তির পাত্র একাকার হইয়া যায় তাহাই যথার্থ ভক্তির অবস্থা, যে অবস্থায় জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞান এক হইয়া উদ্ভাসিত হয় তাহাই বিশুদ্ধ জ্ঞানাবস্থা। এবম্বিধ ভক্তিকে যথার্থ ভক্তিও বলা যায়, জ্ঞানও বলা যায়। এবম্বিধ জ্ঞানকে জ্ঞান বলিলেও চলে, ভক্তি বলিলেও চলে। যদবধি মন বাহিরে বাহিরে ঘুরিতে থাকে তদবধি এই জ্ঞান ভক্তি স্বাভাবিকী হইলেও আবৃত থাকে। পরে ঈশ্বর কৃপায় ব্রহ্মপথে প্রবেশ করিলে তখন নিখিল ধর্ম্মতত্ত্ব-রহস্য উদ্ঘাটিত হয়—ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াম্, গুহায়াং নিহিতং ব্রহ্ম শাশ্বতম্। যিনি যে মার্গেই চলুন না কেন তাঁহাকে ধর্ম্মতত্ত্ব জানিতে হইলে এই পথে যাইতেই হইবে। মায়াশক্তি বা আবরণশক্তি জীবকে বলপূর্ব্বক ব্রহ্মপথচ্যুত করাইয়া এই সূক্ষ্মপথের বাহিরে রাখিয়াছেন। তাই জীব জগতের স্থূলত্ব বৈ আর কিছুই দেখিতেছে না। তাই জীব ধর্ম্মবিমুখ হইয়া অনন্তব্যাপী ঈশ্বরসত্তা বুঝিতেছে না। এই মায়াশক্তি যাঁহার সম্পূর্ণ অধীন তিনিই ঈশ্বর। তিনি সদাই স্বাধীন। তিনি "গুহ্যাতিগুহ্যগোপ্তা", কাহারও নিকট অভেদ ভাবে ধরা দিতে চাহেন না।

জীব যখন তীব্র সংবেগ ও বৈরাগ্য লইয়া মুক্তিপথে ধাবিত হয় তখন তিনি তাহার প্রবল আকাঙ্ক্ষা দেখিয়া পরিতুষ্ট হন এবং তাহার অজ্ঞাতসারে তাহাকে উত্তরোত্তর উন্নতির পথে চালিত করেন। তখনও জীব মনে করে এই উন্নতি আমি নিজেই অর্জ্জন করিয়াছি। পরিশেষে তাহার প্রবল বৈরাগ্য ও সংবেগের কঠোর পরীক্ষা লইয়া তাহার অহঙ্কার বীজ ধ্বংস করেন। দেহাভিমান ধ্বংস হইলে জীব বুঝিতে পারে প্রথম হইতে কে তাহাকে আকর্ষণ করিয়াছে, কে তাহার অন্তরে বৈরাগ্য বীজ বপন করিয়া সংসার হইতে নিবৃত্ত করিয়া এই পথে

অনয়ন করিয়াছে, কে তাহার হৃদয়পটে একে একে তাঁহার তত্ত্বসমূহ প্রকাশ করিয়া অবশেষে অভিমানকে নষ্ট করিয়াছে। এহেন কৃপাময় পুরুষে আত্মসমর্পণ না করিয়া মানুষ আর কি করিয়া থাকিতে পারে ?

জীব যখন বুঝিতে পারে অহঙ্কার দ্বারা অহঙ্কার নষ্ট হয় না, তখন সে অহঙ্কারের অতীত বস্তুকে ভক্তি না করিয়া থাকিতে পারে না। তখন হইতেই সে যথার্থ ভক্ত হয়। পরম পুরুষকে জ্ঞানপূর্ব্বক ভক্তি করিলেই তিনি আর থাকিতে পারেন না, স্বয়ং তত্ত্বতঃ তাহার নিকট অভেদভাবে প্রকাশিত হন। এইরূপ ভক্তের নিকট সর্ব্বময়কর্ত্তা ঈশ্বরও দাস হইয়া যান। শ্রীভগবান্ উদ্ধবকে বলিয়াছেন—

"অহং ভক্ত পরাধীনো হ্যস্বতন্ত্র ইব দ্বিজ।
সাধুভির্গ্রস্তহৃদয়ো ভক্তৈর্ভক্তজনপ্রিয়ঃ ॥
ময়ি নির্ব্বদ্ধ হৃদয়াঃ সাধকাঃ সমদর্শিনঃ।
বশে কুর্ব্বন্তি মাং ভক্ত্যা সৎস্ত্রিয়ঃ সৎপতিং যথা ॥"

কিন্তু ঈশ্বর যাহার প্রতি অধিক দয়ার্দ্র, তাহাকে "তিনিই যে একমাত্র সর্ব্বময় কর্ত্তা" এই জ্ঞানের আভাস দিয়া থাকেন। এই জ্ঞান প্রাপ্তি মাত্র জীব তাঁহার কৃপাপ্রার্থী বা ভক্ত না হইয়া পারে না। পরে সাধন পথে অগ্রসর হইলে যখন অহঙ্কারটি নষ্ট হইয়া যায় তখন এই জ্ঞানের প্রতিষ্ঠা মাত্র হয়। যে মুহূর্ত্তে সাধক তাঁহাকেই সর্ব্বকর্ত্তা বলিয়া জানিতে পারে সেই মুহূর্ত্ত-হইতেই তাহার ঐহিক পারত্রিক সর্ব্ববিধ ভয়ের অবসান হয়, ইহাতে সন্দেহ নাই। সে আর পরীক্ষার ধার ধারে না। কেন, তাহার একটি সামান্য উদাহরণ দিতেছি।

একটি বুদ্ধিমান্ বালক স্কুলে পড়ে, কিন্তু পড়ার ধার ধারে না। বাৎসরিক পরীক্ষার একমাস পূর্ব্বে পরীক্ষক নির্ব্বাচিত হইলে সে সর্ব্বোর্চ্চ পরীক্ষককে বাটীতে শিক্ষক নিযুক্ত করিল। শিক্ষক বালককে পড়াইতে আসিয়া বুঝিতে পারিলেন তাঁহার ছাত্রটি বিদ্বান না হইলেও বুদ্ধিমান বটে। বলক শিক্ষককে পাইয়া নির্ভয় হইল। শিক্ষকের অপযশের ভয় আছে। কাজেই তিনি ছাত্রটিকে পাশ না করাইয়া

আর কি করিবেন ? সেইরূপ জীব ঈশ্বরকে আশ্রয় করিলে তাহার দায়িত্ব বাড়িয়া যায়। এজন্য তিনি "গুহ্যাতিগুহ্যগোপ্তৃত্ব" পছন্দ করেন না। সহজে কাহাকেও ধরা দিতে চাহেন না। অধিকাংশ জীবকেই অলক্ষ্যে থাকিয়াই আকর্ষণ করেন। জীব সে আকর্ষণ বুঝিতে পারে না।

মনে কর "আমি শুদ্ধ হইয়াছি। আমি নিজবলে মুক্তিলাভ করিব" (নিজবল বটেই, তবে অহঙ্কারবিহীন "আমিই যে ঈশ্বর তাহা বোঝে না)। ঈশ্বরও তাহার ভাল-মন্দের জন্য কোন প্রকাশ্য দায়িত্ব রাখেন না। "কেন—"তুমি নিজে করিতেছ, ইহার ভালমন্দ আমি কি জানি ?" "স হি সর্ব্ববিৎ সর্ব্ব কর্ত্তা চ" এই জ্ঞান যাঁহার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তিনিই যথার্থ জ্ঞানী, তিনিই যথার্থ ভক্ত। একম্বিধ জ্ঞানী ভক্ত অতি অল্পই দেখিয়াছি। মহাত্মা বারদীর ব্রহ্মচারী বলিতেন, "আমি জীবনে দুইটি মাত্র ব্রাহ্মণ দেখিয়াছি—একটি কাশীর ত্রৈলঙ্গ-স্বামী, অপরটি মক্কার আবদুল গফুর।" আমি জীবনে যে ২।৩টি জ্ঞানী ভক্ত দেখিয়াছি তাহার মধ্যে একটি আপনার গুরুদেব পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত কেশববাবু। আপনার আশ্রিতগণের মধ্যে শ্রীমতী দিদি আপনার কৃপা পাইলে এইরূপ জ্ঞানী ভক্ত হইতে পারেন। কারণ তাঁহার ভিতর ইহার উপযুক্ত গুণ ও শক্তি আছে। বক্রী আমরা সকলেই অপদার্থ। আমাদের আশা অতি অল্প।

আমার এই কথায় হয়ত অনেকে আমার উপর খড়্গহস্ত হইবেন। "কেন, ভগবান সকল ভক্তকেই ভালবাসেন, সকলেই তাঁহার সেবা করিয়া থাকে। অতএব তাহারা সকলেই ভক্ত।" আমার বোধ হয় আমরা সকলেই আপনার স্থূল দেহের ভক্ত; কেহই আপনার স্থূল দেহ ভিন্ন জানে না। প্রকৃত ভগবদ্ভক্ত কেহই নহে। যদবধি ঈশ্বরে সর্ব্বভূত ও সর্ব্বভূতে ঈশ্বরবোধে ভক্তি প্রেম না আসিতেছে তদবধি জ্ঞান বা ভক্তি বলা যাইবে না। এই জ্ঞান বা ভক্তি আপনার দেহখানি বাটিয়া গঙ্গাজল দিয়া গুলিয়া খাইলেও হইবে না। ইহা স্বতন্ত্র পুরুষের স্বতন্ত্র

কৃপা সাপেক্ষ। তাই বলিয়া আপনার দেহের যে কিছুমাত্র সার্থকতা নাই তাহা বলিতেছি না। ঐ দেহ আমাদের উপস্থিত ভরসাস্থল, নচেৎ পত্র লিখিতেছি কাহাকে ?

"অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্ ॥"

আপনার ঐ "পরং ভাবং" আমরা জানিয়াও বুঝিতেছি না। সুতরাং আমরা সকলেই আপনাকে অবজ্ঞা করিতেছি বৈ আর কি বলিব ? আপনার প্রকৃতি অতি তইল বলিয়া বুঝিয়াছি। তরল বস্তুর তরলতা ভিন্ন স্বতন্ত্র আকৃতি কিছুই নাই। যখন যে পাত্রে রাখা যায়, তখন সেই আকার ধারণ করে। ভক্তের নিকট তাহার চিত্তের নিগূঢ় গুহ্য অব্যক্ত ভাব অবলম্বন করাই ঈশ্বরের স্বভাব। ইহা বারম্বার বুঝিয়াছি। কিন্তু নিজ স্বরূপ প্রকাশ করা তাঁহার সর্ব্বোচ্চ কৃপা সাপেক্ষ।

যাহা হউক, অনেক অবান্তর কথা আনিয়া ফেলিলাম। সাধনা সম্বন্ধে যাহা বলিতেছিলাম তাহা লিখিতে গেলে আবার এই পত্র প্রকাণ্ড হইয়া যাইবে। আর সময়ও নাই। পূর্ব্বোক্ত অবস্থার পরিপাক হইয়া ক্রমশঃ মধুমতী ভূমিতে আসিয়া পড়িলাম। ইহার বর্ণনা পৃথক পত্রে পরে দিব। এক্ষণে আমার জিজ্ঞাস্য এই যে, আমি এত সাধনা করিয়াছি, কিন্তু এই সকল অদ্ভুত ভূমি বা স্তর কোথায় ছিল ? যাহা স্বপ্নের অতীত, আমার কল্পনার বহির্ভূত, এক্ষণে দেখিতেছি একে একে সেই সকল বাহির হইতেছে। তাহা হউক, এক্ষণে আমার প্রার্থনা এই যে, আমরা কয়েকটি প্রাণী আপনার সংস্পর্শে আসিয়াছি, তাহার মধ্যে কেহ যেন পড়িয়া না থাকেন, সকলেই শীঘ্র শীঘ্র সহজে কার্য্য শেষ করিয়া জগতে আপনার কীর্ত্তিস্তম্ভস্বরূপ বিরাজিত হউন। কালকে বিশ্বাস নাই। উহা কখন কাহাকে দেহসম্বন্ধ হইতে বিচ্যুত করিবে কে তাহা সঠিক বলিতে পারে ? যিনি একবার জাগিয়াছেন তিনি যেন আর না ঘুমান। স্রোতের মুখে ভাসিয়া তিনি পার

হইয়া যান। অধিক কি লিখিব? আপনি আমার প্রণাম জানিবেন।

"যা দেবোঽগ্নৌ যোঽপ্সু যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ।
য ওষধিষু যো বনস্পতিষু তস্মৈ দেবায় নমো নমঃ॥"

* * * *

সাধনতত্ত্ব সম্বন্ধে ভগবানের সঙ্গে অনেক সময় আমার আলোচনা হইত। তিনি বলিতেন—"যাহাকে সাধন পথ বলা হয় উহা পুরুষকারের পথ অর্থাৎ ব্যক্তিগত কর্ম্মের পথ। যতদিন চিত্তে কর্ত্তৃত্ব-অভিমান বিদ্যমান থাকে ততদিন পর্য্যন্ত ঐ পথ অবলম্বন করিয়া চলিতে হয়। চিত্ত শুদ্ধি না হওয়া পর্য্যন্ত অহঙ্কার নিবৃত্ত হয় না বলিয়া বাধ্য হইয়া সাধন পথেই চলিতে হয়। কিন্তু চিত্ত শুদ্ধ হইলে বিশুদ্ধ সত্ত্ব গুণের উদয় হয়। কিন্তু এই সত্ত্ব শুদ্ধ হইলেও পূর্ণ শুদ্ধ নহে, কারণ ইহার মধ্যে অবিদ্যা-বীজ নিহিত থাকে। তথাপি ঐ সময় আত্মতত্ত্বের আভাস দৃষ্টিগোচর হয়, কারণ তখন বুদ্ধি অত্যন্ত স্বচ্ছ হয় বলিয়া উহাতে আত্মতত্ত্বের প্রতিবিম্ব প্রকাশিত হয়।

বুদ্ধি মলিন থাকা পর্য্যন্ত তন্নিহিত আত্মপ্রতিবিম্ব অদৃশ্য থাকে—বুদ্ধি নির্ম্মল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঐ অদৃশ্য প্রতিবিম্ব দৃশ্যমান হয়। বুদ্ধির এমন কোনও সামর্থ্য নাই যে নিজ হইতে উহা আত্মাতে প্রবেশ করিবে। বুদ্ধি নিজের রাজ্য অতিক্রম করিয়া যাইতে পারে না। সময় পূর্ণ হইলে আত্মা বা ঈশ্বর নিজের শক্তি বলে বুদ্ধিকে সংহার করিয়া একেশ্বর হইয়া বিরাজ করেন। ইহাকেই যোগিগণ 'নিরোধ' বলিয়া থাকেন। এই সময়ে কোনও প্রকার চিত্তবৃত্তি থাকে না, তাই আত্ম-স্বরূপের উপলব্ধি সম্ভবপর হয়। কিন্তু এই উপলব্ধি সম্যক জ্ঞান নহে। ইহা নিরন্তর হইতে থাকিলে ইহারই প্রভাবে অবিদ্যা, কর্ম্মসংস্কার প্রভৃতি যাবতীয় আবরণ ক্রমশঃ ধ্বংস প্রাপ্ত হয়।

অবিদ্যা নিবৃত্তি হইলে আত্মদর্শন হয়, এই মত সত্য নহে। কারণ তাহা হইলে কাহারও কখনও আত্মদর্শন হইত না। শ্রুতিতে আছে,

"তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে"—অর্থাৎ সেই পরম সত্যের সাক্ষাৎকার হইলে হৃদয়গ্রন্থি ভেদ, সকল সংশয়ের উচ্ছেদ এবং যাবতীয় কর্ম্মের ক্ষয় সংঘটিত হয়। গীতাতেও আছে "পরং দৃষ্টা নিবর্ত্ততে" অর্থাৎ সেই পরম তত্ত্বের দর্শন হইলেই বাসনারূপ রস চিরদিনের জন্য নিবৃত্ত হয়, তৎপূর্ব্বে নহে। এ সকল প্রমাণ হইতে জানা যায় যে, দর্শনের স্থান প্রথমে, তাহার পরে অবিদ্যা নিবৃত্তি বাসনা ক্ষয় প্রভৃতির স্থান। তবে ইহা সত্ত্বেও সত্যদর্শনের আভাস আসিলেই অবিদ্যা প্রভৃতির বল অনেকটা শিথিল হইয়া যায়। অদ্বৈত ঈশ্বরের শক্তি দ্বারাই আত্মদর্শন সম্ভবপর হয়। ব্যক্তিগত সাধনার ফলে বিশুদ্ধ সত্ত্বের অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহার পর অপরোক্ষ জ্ঞানের জন্য মস্তক অবনত করিতেই হইবে—মহামায়ার চরণতলে লুটাইয়া না পড়িলে পূর্ণ সত্যের দ্বার খুলিবে না। দ্বার খোলা মানে আত্মশক্তি বা কৃপার সঞ্চার। যাহাকে পূর্ব্বে অহঙ্কার বলা হইয়াছে উহা চিৎ ও অচিতের গ্রন্থি মাত্র, উহা তখন পূর্ণরূপে ভগ্ন হইয়া যায়। যোগিগণ যে ব্যুত্থানের ন্যায় নিরোধেরও সংস্কার স্বীকার করেন ইহাই তাহার একমাত্র কারণ।

একদিন ভগবানের সহিত প্রাচীন যোগের রহস্য সম্বন্ধে কথা হইতেছিল। আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম—"গীতাতে—'যোগো নষ্টঃ পরন্তপ' বলিয়া যে প্রাচীন যোগ লুপ্ত হইয়া গিয়াছে বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা কোন্ যোগ?" ভগবান্ বলিলেন—"ঐটি প্রাচীন যোগ, শ্রীকৃষ্ণের সময়েও তা লুপ্ত ছিল। যে কৌশল মাত্র তখন বিশেষজ্ঞগণ জানিতেন, উহা এই—'আত্ম সংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ।' কিন্তু এই কৌশলের বিস্তারিত জ্ঞান সাধারণতঃ কাহারও জানা ছিল না। অবশ্য যাঁহারা গুহ্য তত্ত্ববিৎ তাঁহাদের কথা বলা হইতেছে না। ভগবান্ বলিলেন—'প্রণবের তিনটি অংশ—সূর্য্য, চন্দ্র ও অগ্নি। এই তিনটি তেজঃ পৃথক্ পৃথক্। এই তিনটি তেজঃ পৃথক্ না হইলে সৃষ্টি প্রভৃতি কোনও ব্যাপার সম্পন্ন হইতে পারে না। যেখানে সৃষ্টি নাই সেখানে এই তিন তেজঃ একাকার

হইয়া ব্রহ্ম সঙ্গে অভিন্ন রূপে বিরাজ করে। তখন শব্দব্রহ্মের স্পন্দন থাকে না। নিস্পন্দ শব্দব্রহ্মে যখন কম্পন উদ্ভূত হয় তখন সেই ব্রহ্মাকার বাক্ তিন ভাগে বিভক্ত হয় অর্থাৎ তিনটি ধারা বহির্গত হয়। এইখান হইতেই সৃষ্টির সূচনা। ঐ যে গীতাতে আছে—'ন তদ্‌ভাসয়তে সূর্য্যঃ ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ। যদ্ গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম॥'

ব্রহ্মধাম সূর্য্য, চন্দ্র ও অগ্নি এই তিন তেজের দ্বারা আলোকিত হয় না—তাহা স্ব-প্রকাশ। আর সকলেই এই তিন ধারার প্রকাশেই প্রকাশিত। অর্থাৎ প্রণবের বা বেদের সামর্থ্য নাই যে উহার স্বরূপকে প্রকাশ করিতে পারে, বরং স্বরূপের প্রকাশেই প্রণব প্রকাশিত হয়। সৃষ্টিকালে যেমন এই তিন ধারা পৃথক হয় তেমনি প্রলয়কালে এই তিন তেজঃ একস্থানে আসিয়া মিলিত হয় ও একমুখী ধারাতে ব্রহ্মপথে প্রবেশ করে।

আজকালকার প্রচলিত স্থূল যোগমার্গে অর্থাৎ ষট্‌চক্র ভেদ প্রভৃতি উপায়ে ঠিক ঠিক একাগ্রতা হয় না। সেইজন্য নিরোধও পূর্ণ হয় না—সমাধির গাঢ়তা যতই হোক তবুও সংস্কার একেবারে কাটে না। ইহার একমাত্র কারণ এই যে, এই তিনটি তেজঃ একত্র করিবার কৌশল আজকাল প্রায় কেহই জানে না।

মেরুপথের দক্ষিণে সূর্য্য, বামে চন্দ্র ও মধ্যে অগ্নি। প্রচলিত পন্থায় অগ্নি সাধনার প্রক্রিয়া ঠিকভাবে করা হয় এবং তাহার ফলে অগ্নিকে নিম্নতম স্তর হইতে জাগাইয়া এবং উর্দ্ধে উত্থাপিত করিয়া যথাস্থানে রক্ষা করা হয়। ষট্‌চক্র সাধনের ফলে জ্ঞানচক্ষুর উন্মেষ ইহার দ্বারাই সিদ্ধ হয়। কিন্তু ইহার দ্বারা উর্দ্ধ গতিলাভ করা যায় না এবং অদ্বৈত স্থিতির পথও খোলে না। সূর্য্য ও চন্দ্রের জাগরণ এবং পরস্পর মিলন না ঘটিলে ব্রহ্মপথ প্রাপ্তির আশা সুদূর পরাহত। অগ্নির দ্বারা সূর্য্য ও চন্দ্রকে মিলানো অত্যন্ত কঠিন, কিন্তু পক্ষান্তরে সাধন কৌশলে সূর্য্য ও চন্দ্রকে পরস্পর মিলাইতে পারিলে অগ্নি

আসিয়া উহার সঙ্গে আপনিই যোগ দেয়। অর্থাৎ মূলাধার হইতে যে তেজঃ উত্থিত হইয়া ভ্রূমধ্যের কিঞ্চিৎ উপরে স্থিত হয় তাহা অগ্নি। ঐ তেজঃ একেলা সহস্রারে যাইতে পারে না।

একদিন অর্জ্জুনের বিশ্বরূপ দর্শন সম্বন্ধে ভগবানের সঙ্গে আলোচনা হইতেছিল। আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম—"বিশ্বরূপ দর্শন জ্ঞানের চরমভূমি বলিয়া মনে হয় না। অর্জ্জুনের দিব্যচক্ষু লাভ সম্বন্ধে আপনার ব্যক্তিগত ধারণা কি?"

ভগবান বলিলেন—"দিব্যচক্ষু জ্ঞানের শ্রেষ্ঠ সম্পদ নহে। অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহে অল্প সময়ের জন্য দিব্যচক্ষুপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাহারও তেজ তিনি সহ্য করিতে পারেন নাই। অর্জ্জুনের বিশ্বরূপ দর্শন প্রকৃত জ্ঞানের অবস্থা নহে। সর্ব্বত্র আত্মবোধ অর্থাৎ সর্ব্বাত্মভাব ইহা হইতে বিশিষ্ট অনুভূতি। উহা অর্জ্জুনের হয় নাই। জ্ঞানচক্ষুর বিকাশ না হইলে উহা হয় না।

অর্জ্জুন অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডাত্মক বিশ্বদর্শন করিয়াছিলেন, কিন্তু নিজের বাহিরে অর্থাৎ মহাশূন্য মধ্যে। সুতরাং তাঁহার দ্বৈতবোধ তখনও নিবৃত্ত হয় নাই। যদি নিজের আত্মস্বরূপে নিজের সঙ্গে অভিন্নরূপে বিশ্বদর্শন করিতেন তাহা হইলে উহা একটি শ্রেষ্ঠ অবস্থা বলিয়া পরিগণিত হইত।"

আমি বলিলাম—"ভগবান শঙ্করাচার্য্য 'দশ শ্লোকী'তে যে বিশ্বদর্শনের কথা বলিয়াছেন তাহা আত্মদর্শনেরই একটি অবস্থা। তিনি বলিয়াছেন—দর্পণে যেমন নগরী দর্পণের সহিত অভিন্নভাবে দৃষ্টিগোচর হয়, তেমনি প্রবুদ্ধ আত্মার নিজস্বরূপে স্বরূপেরই অন্তর্গতরূপে সমগ্র বিশ্ব দেখিতে পাওয়া যায়। মায়াবশতঃ উহা বাহ্য বলিয়া মনে হয়।"

ভগবান্ বলিলেন—"ইহা খুবই সত্য কথা। দিব্যচক্ষু পাইয়াও মায়া নিবৃত্তি না হওয়ার দরুণ অর্জ্জুন সমগ্র বিশ্বকে নিজ হইতে পৃথকরূপে দেখিয়াছিলেন, নিজের সঙ্গে অভিন্নরূপে নহে।"

এই প্রকার নানা সময়ে নানা বিষয়ে ভগবানের সঙ্গে আমার তত্ত্ব আলোচনা চলিত। উহার বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া অনাবশ্যক। ব্রজবিদেহী সন্তদাস বাবাজী মহাশয় ভগবানের সঙ্গে বহু পূর্ব্ব হইতেই পরিচিত ছিলেন। কলিকাতায় অবস্থানকালে উভয়ের মধ্যে শাস্ত্রালোচনা সম্পর্কে ঘনিষ্ঠতাও খুবই ছিল। বলা বাহুল্য, ভগবান্ তখন ভগবানরূপে আত্মপ্রকাশ করেন নাই, এবং বাবাজী মহারাজও তখন গৃহস্থাশ্রমে তারাকিশোরবাবু নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন।

ভগবানের সংস্পর্শে আসিয়া অনেক ভক্তের মধ্যে দর্শনাদি ব্যাপকভাবে কিছুদিন পর্য্যন্ত চলিয়াছিল। এই সম্বন্ধে কোন কোন ভক্ত পূজ্যপাদ গুরুদেবের নিকট উপস্থিত হইয়া কখনও কখনও তাঁহার মতামত জিজ্ঞাসা করিত। শ্রীগুরুদেব ব্যক্তিগতভাবে কোনও মত প্রকাশ করিতেন না। তবে তিনি এই সকল লীলার খুব অনুকূল ছিলেন বলিয়া মনে হইত না এবং কখনও কখনও তাঁহার আশ্রিত কোন কোন শিষ্যকে এই বিষয়ে কিছু উপদেশ বাণীও প্রদান করিতেন। তিনি বলিতেন—"এইসব স্থায়ী হইবে না। সময় আসিলে তোমরা নিজেই ইহা বুঝিতে পারিবে।" বাস্তবিক পক্ষে হইয়াছিলও তাহাই।

শ্রীশ্রীনাগাবাবা

খ্রীষ্টীয় ১৯২৩ সালে গ্রীষ্মকালে কাশীতে গঙ্গাঘাটে এই মহাপুরুষের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয়। ইনি মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন, এইরূপ আমার বিশ্বাস। যদিও ইনি আমাদের সকলের সঙ্গে হিন্দী ভাষাতে কথাবার্ত্তা বলিতেন, তথাপি হিন্দী যে তাঁহার মাতৃভাষা ছিল না ইহা বেশ বুঝিতে পারা যাইত। ইহার নিজ মাতৃভাষা মহারাষ্ট্রীয় ছিল। ইঁহার বয়স কত ছিল তাহা জানি না, তবে স্থূল দৃষ্টিতে ইঁহাকে ৫০ অথবা ৫৫ বৎসর বয়স্ক বলিয়াই মনে হইত। ইঁহার মস্তক মুণ্ডিত ছিল এবং শরীরটি ক্ষীণ হইলেও সতেজ ও বলিষ্ঠ ছিল। ইনি সর্ব্বদা দিগম্বরভাবে বিচরণ করিতেন। তাই সাধারণতঃ সকলেই ইঁহাকে 'নাগাবাবা' বলিয়া ডাকিত। ইঁহার মুখখানি সর্ব্বদা উজ্জ্বল ও হাস্যময় দেখিতে পাইতাম—মনে হইত যেন শান্তি ও আনন্দের আভা ইঁহার দেহ হইতে চারিদিকে বিকীর্ণ হইতেছে। সংস্কৃত ভাষাতে ইঁহার বেশ বোধ ছিল বলিয়া মনে হইত এবং ইনি যে ইংরাজী জানিতেন তাহাও ইঁহার কথাবার্ত্তা হইতে বুঝিতে পারা যাইত। ইনি সর্ব্বদা গঙ্গার ঘাটে থাকিতেন—দশাশ্বমেধ হইতে দ্বারভাঙ্গা ঘাট পর্য্যন্ত ইনি ঘুরাফিরা করিতেন, অন্যত্র কোথাও যাইতেন না।

যখন বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসের ভীষণ রৌদ্রে ঘাটের পাথর উত্তপ্ত হইয়া উঠিত সেইখানে সাধারণ লোকের পা রাখা কঠিন হইলেও বাবাজী সে স্থান ত্যাগ করিতেন না। তাঁহার কোনই ভ্রূক্ষেপ ছিল না—তিনি ঐ ভীষণ তপ্ত পাষাণের উপর অনায়াসে শুইয়া থাকিতেন, রাত্রিবেলায়ও মুক্ত আকাশের নীচে গঙ্গার তীরে পড়িয়া থাকিতেন। বাবাজীর আর একটা বৈশিষ্ট্য ছিল যে, তিনি দিনে ও রাত্রে কখনও

কিছুই ভোজন করিতেন না। অনেক লোক পালা করিয়া গুপ্তভাবে ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছে। কেহ কখনও তাঁহাকে কিঞ্চিৎমাত্র খাদ্য গ্রহণ করিতে দেখে নাই। তিনি নিজে বলিতেন, তাঁহার বর্ত্তমান স্থিতিতে আহারের প্রয়োজন হয় না।

গঙ্গাজলে অবগাহন কালে কখন কখন নিজ দেহ হইতে অন্ত্রাদি বাহির করিয়া ধৌত করিতেন, ইহা অনেকে স্বচক্ষে দেখিয়াছে। এই মহাপুরুষ যেমন জ্ঞানী, যোগী ও সিদ্ধাত্মা ছিলেন, তেমনি লৌকিক ব্যবহারেও অত্যন্ত অমায়িক এবং সরল ছিলেন। তিনি কোন রহস্য গুপ্ত রাখিতেন না—তত্ত্বের বিষয় যেমন তাঁহার নিকট গোপন ছিল না, সাধারণ বিষয়েও তেমনই নিজে যাহা জানিতেন তাহা অসংকোচে অন্যের নিকট প্রকাশ করিতেন এবং যাহাতে অন্যে উহার দ্বারা লাভবান হইতে পারে তাহার জন্য চেষ্টা করিতেন। তিনি তাঁহার নিকট উপদেশের জন্য সমাগত কাহাকেও উপযুক্ত উপদেশ দিতে কুণ্ঠিত হইতেন না।

ঐ সময়ে কাশীতে একজন বিশিষ্ট মহাত্মা বাস করিতেন। তাঁহার নাম ছিল বেণীমাধব মুখোপাধ্যায়। এই মহাত্মা সম্পূর্ণ অন্ধ ছিলেন এবং তাঁহার বয়স ৮০ বৎসরের অধিক ছিল। তিনি প্রথম যৌবনে কাশীতে আসিয়াছিলেন—তাহার পর আর কাশী ত্যাগ করিয়া যান নাই। তিনি একটি সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ও উচ্চ শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যতটা আমার মনে পড়ে তাঁহার জন্মস্থান হুগলীর নিকটে কোন গ্রামে ছিল। বাল্য অবস্থাতে বসন্তরোগে তাঁহার চক্ষু দুইটি নষ্ট হইয়া যায়। তাহার পরই তিনি সংসার ত্যাগ করিয়া কাশী আগমন করেন এবং এইস্থানে শ্রীবিশ্বনাথের চরণাশ্রয় করিয়া পড়িয়া থাকেন। কাশীতে বাঙ্গালী টোলার অন্তর্গত পাঁড়ে হাউলী মহল্লাতে তিনি অবস্থান করিতেন। প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত এই এক বাড়ীতেই তিনি ছিলেন—এমন কি যে ঘরটিতে তিনি আসিয়া প্রথম উঠেন শেষ পর্য্যন্ত সেই ঘরটিও ত্যাগ করেন নাই। তিনি পল্লীর

ছোট ছোট বালক বালিকাদিগকে নিজের ঘরে বসিয়াই প্রত্যহ কিছু সময় পড়াইতেন। উহার দ্বারাই তাঁহার গ্রাসাচ্ছাদনের খরচ চলিয়া যাইত। এইজন্য কাশীর জনসাধারণ তাঁহাকে 'অন্ধ মাষ্টার' বলিয়া জানিত। এই মহাত্মা অধ্যাত্মিক সাধন বিষয়ে সমধিক উন্নত অবস্থা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার অনুভূতি সম্বন্ধে তাঁহার সঙ্গে বর্ত্তমান লেখকের অনেকদিন আলোচনা হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে তাহার বিবরণ দেওয়া অনাবশ্যক।

কাশীর অনেক বিজ্ঞলোক তাঁহাকে জীবন্মুক্ত পুরুষ বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। তাঁহার নিজের সম্বন্ধে নিজের ধারণাও অনেকটা এইরূপ ছিল বলিয়াই মনে হয়। তাঁহার শিষ্যবর্গের মধ্যেও কেহ কেহ যোগমার্গে উন্নতি লাভ করিয়াছিল এবং কিছু কিছু বিভূতিও অর্জ্জন করিয়াছিল।

একদিনের কথা মনে পড়িতেছে। আমরা সকলে নাগাবাবাকে লইয়া সন্ধ্যাবেলা দ্বারভাঙ্গা ঘাটের বুরুজের উপর বসিয়া তত্ত্ব আলোচনা করিতেছিলাম। এমন সময় দেখি একজন ভক্তের সঙ্গে মাষ্টার মহাশয় ঐদিকে আসিতেছেন—ভক্তটি তাঁহাকে হাত ধরিয়া আনিতেছিল। নাগাবাবা তাঁহাকে পূর্ব্বে কখনও দেখেন নাই এবং তাঁহার কথাও কখনও শুনেন নাই। কিন্তু তখন দেখিলাম তাঁহাকে দেখিবামাত্র মস্তক অবনত করিয়া তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাঁহার চক্ষুর বা মুখের দিকে একাগ্রভাবে তাকাইতে লাগিলেন। আমি তাঁহাকে ঐরূপ করার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিলেন, "পুরুষটি জ্ঞানী বটে, জীবন্মুক্ত বলা চলে, কিন্তু এখনও মাতৃঋণ শোধ হয় নাই।" এই কথার তাৎপর্য্য কি তাহা বাবাজীর উপদেশ আলোচনা করিলে স্পষ্ট বোঝা যাইবে।

নাগা বাবাজী বলিতেন, শ্রবণ ভিন্ন মনন হয় না। এমন ভাবে নাম করা উচিত যাহাতে নিজের উচ্চারিত নাম নিজে শুনিতে পাওয়া যায়। মনে মনে নাম করিলেও মনে মনে উহা নিজে শুনা আবশ্যক।

ইহা অভ্যাস করিতে পারিলে সহজেই মনন বা স্মৃতি উদিত হয়। শ্রুতি ঠিক ঠিক না হইলে স্মৃতি উৎপন্ন হইতে পারে না। কিন্তু নাদ ভিন্ন শ্রুতিই বা কি·প্রকারে হইবে ? স্মৃতি হইলে ধৃতি বা নিদিধ্যাসন আপনিই আসে। ইহার পর দর্শন বা সাক্ষাৎকার।

নামযোগ দেহ শুদ্ধি আপনিই হয়, কারণ, কুণ্ডলিনীর চৈতন্য হইলে দেহ শুদ্ধির অভাব থাকে না।

রস দ্বারা দেহ শোধন করা অত্যন্ত কঠিন। বাবাজী বলিতেন, দেহ শুদ্ধি করিতে তাঁহার প্রায় সাড়ে তিন বৎসর লাগিয়াছিল। দেহ শুদ্ধ না হইলে দেহকে মুক্ত করা যায় না। জীবন-মুক্ত অবস্থা হইতে পারে, কিন্তু পরব্রহ্মলাভ ঘটে না। অর্থাৎ মাতৃঋণ শোধ হয় না, মায়াপাশ ছিন্ন হয় না এবং পঞ্চতত্ত্বের স্বাভাবিক আকর্ষণ অটুট থাকে। এইজন্য সোহংং ভাব জাগে না। এমন অনেক সময়ে দেখা যায় যে, কাহারও কাহারও আত্মা ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত চলিয়া যায় (অবশ্য মননের ফলে), কিন্তু দেহ অশুদ্ধ বলিয়া উহা উপরে উঠিতে পারে না, উহা ভূলোকেই পড়িয়া থাকে। তাই দেহকেও সঙ্গে করিয়া লওয়া আবশ্যক, ইহাই দেহশুদ্ধি। দেহশুদ্ধি না হইলে বিজ্ঞান হইতে পুনরায় অজ্ঞানে, এবং অদ্বৈত হইতে পুনরায় দ্বৈতে নামিতে পারে না। বহুলোকে এইজন্য অদ্বৈতেই আটকাইয়া থাকে, তাহাদের দ্বারা পরোপকার হয় না। দেহ শুদ্ধ হইলে অবিনাশী হয়। জলন্ধরনাথ এইরূপ 'অবিনাশী' ছিলেন, কিন্তু গোরক্ষনাথ মহাসিদ্ধ ছিলেন, অবিনাশী ছিলেন না। দেহশুদ্ধি মানে দেহ শূন্যময় হইয়া যাওয়া। কণ্ঠ হইতে সমস্ত নিম্নভাগ শূন্য হইয়া যায়—উপরিভাগে চৈতন্য থাকে। পঞ্চতত্ত্ব শূন্য হওয়াই দেহ শূন্য হওয়া। দেহশুদ্ধি না হইলে পরব্রহ্ম পর্য্যন্ত স্থিতি হয় না, ব্রহ্মলোকেই অবসান হয়। ইহা জীবন্মুক্তি ভিন্ন অন্য কিছু নহে।

রসের দ্বারা দেহ শুদ্ধ হয়। জিহ্বা রসনেন্দ্রিয়, ইহাকে নিয়ম অনুসারে ২১ দিন বা ২৮ দিন বা কোন নির্দ্দিষ্ট কাল পর্য্যন্ত একটি

বিশিষ্ট একমাত্র রসের আস্বাদন করানো আবশ্যক। যখন এক রসের আস্বাদন চলিতেছে তখন ভ্রমেও যেন অন্য রসের আস্বাদন না হয় এইরূপে পর পর সকল রসের আস্বাদন করা চাই। সকলের অন্তিম কার্য্যটা রসাস্বাদন নহে, কিন্তু বিষ ভক্ষণ। বিষই অমৃত, কেননা উহা অগ্নিস্বরূপ। এই অমৃত পান করিয়া দেহ অমর হইয়া যায়। বিষপায়ী শিব মৃত্যুঞ্জয় ইহা সকলের পরিচিত সত্য। ভিন্ন ভিন্ন রসের আস্বাদনকালে শরীরের ত্বক্ বা বাহিরের খোলস ক্রমশঃ খসিয়া যায়। মোট ১১টা কবচ বা খোলস দেহ হইতে পৃথক্ হইয়া পড়ে। তখন শরীর একেবারে নবীন হইয়া প্রকাশিত হয়, পূর্ব্বের উপাদান আর কিছুই থাকে না। এই অবস্থায় নামই প্রধান অবলম্বন। যখন সন্নিপাত হয় তখন নামকে ধরিয়া না থাকিলে দেহপাত অবশ্যম্ভাবী।

দেহশুদ্ধির লক্ষণ—মস্তকে ব্রহ্মরন্ধ্রের উপর হাত দিলে বায়ুর সত্তা জানিতে পারা যায়। আমাদের হাতের তালুর দিকটা সূর্য্য, পশ্চাৎ ভাগটা পৃথিবী। এই সূর্য্যকে এই বায়ু সেবন করান আবশ্যক।

অন্তর শুদ্ধ না হইলে অন্তরে অন্তরে জপ বা অন্তর্জপ হয় না। সুতরাং প্রথমতঃ অন্তরে জপ অসম্ভব।

কুণ্ডলিনী না জাগিলে অজপা জপ কি প্রকারে হইতে পারে? তালুমূল (কণ্ঠ) হইতে নাভি পর্য্যন্ত একটা ফোকাসের ক্রিয়া হয়। একবার আকুঞ্চন বা ফোকাসিং হয় আবার প্রসারণ বা ডিফিউসন চলিতে থাকে এইরূপ সর্ব্বদাই বোধ হয়। ব্রহ্মবিন্দু উপর হইতে তালুমূলে ক্ষরিত হয়। ফলে হয় সঙ্কোচ। আবার নাভির ক্রিয়ায় হয় বিকাশ। ইহারই নাম অজপা।

প্রথমে মনিকর্ণিকাতে চক্রতীর্থে স্নান করিতে হয়। ইহা মণিপুর চক্রের ব্যাপার। এইখানে কুণ্ডলিনীর স্থান।

গণেশের হস্তিমুণ্ড ওঁকারের প্রতীক। উহা মাঙ্গলিক।

সৃষ্টি স্ত্রীলিঙ্গ, ইহা পৃথ্বীস্বরূপ। ব্রহ্মাণ্ডের এক দেশ সৃষ্টি। সৃষ্টির বাহিরেও ব্রহ্মাণ্ড আছে। রজঃ সৃষ্টিরূপী স্ত্রীলিঙ্গ। সত্ত্ব—বালরূপ

নপুংসক লিঙ্গ। তমঃ—পুংলিঙ্গ। অষ্টধাতুতে সৃষ্টি হয়—তাই আটদিক্ ও আটদিক্‌পাল। রজোগুণ—ক্রিয়া, ইহাই সৃষ্টি। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডে নিষ্ক্রিয় হয় না—এক দেশে মাত্র হয়। নিষ্ক্রিয় অবস্থা সৃষ্টির প্রবর্ত্তক মানুষ। রজোগুণ প্রথমে বিন্দুরূপ হয়, ইহাই সূর্য্য। আকাশে প্রথমে নক্ষত্র, তাহার উর্দ্ধে চন্দ্র, তাহার উর্দ্ধে সূর্য্য। নক্ষত্র সব মুক্ত আত্মা, জ্যোতিরূপ, ইহারা জীবন্মুক্ত পুরুষ। নক্ষত্র খসিয়া পড়ে মানে আত্মা পৃথিবীতে পতিত হয়। পড়িবার সময় সূক্ষ্ম বায়ুস্তর পর্য্যন্ত জ্যোতিরেখা যায়, পরে স্থূল পার্থিব বায়ুমণ্ডলে আসিয়া অন্ধকারে মিশিয়া যায়।

রাত্রে অধিকাংশ মনুষ্য ঘুমাইয়া পড়ে—তাহাদের তেজঃ নক্ষত্রমণ্ডলে যায় ও নক্ষত্রের সহিত কথাবার্ত্তা বলে। ইহাই স্বপ্নাবস্থা। তাই রাত্রে নক্ষত্র এত উজ্জ্বল দেখায়—তেজে তেজ মিলিত হয়। রাত্রি ১২টার পরে প্রায় কেহ জাগিয়া থাকে না, তাই তখন নক্ষত্র খুব উজ্জ্বল দেখায়। মানুষ জাগিয়া উঠিলে আপন আপন জ্যোতি বা প্রাণ আকর্ষণ করিয়া লয়, তখন নক্ষত্র ম্লান হইয়া পড়ে। এক আত্মারই মুক্তবিন্দু উর্দ্ধে তারারূপে ও বদ্ধ বিন্দু অধো দিকে নানা প্রকার বদ্ধজীবরূপে বিভিন্ন যোনিতে খেলা করে।

তারা যদি সূর্য্যের উপরে হইত তবে সূর্য্যকিরণে দিবাভাগেও দেখা যাইত। বস্তুতঃ সূর্য্যকিরণই অভিভূত হইয়া যাইত। চন্দ্রের সহিত তারার সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ। সমাধি অবস্থায় অথবা সদেহ মুক্তিতে নক্ষত্রে যাইয়া সব জানিয়া আসা যায়। নিজের জ্যোতি নক্ষত্রের জ্যোতিতে মিলাইলে সব প্রত্যক্ষ দেখা যায়।

প্রদক্ষিণ বা পরিক্রমা খুব সহজে উঠিবার উপায়। ভূমিতলে কিছু ব্যাপক স্থান লইয়া মণ্ডল কল্পনা করিতে হয় ও উহাকে প্রদক্ষিণ করিতে হয়। অখণ্ডভাবে হওয়া চাই। প্রথম প্রথম কিছুক্ষণ ঘুরিলেই মাথা ঘুরিবে, তখন বসিয়া পড়িবে। তাহার পর বিশ্রাম করিয়া পুনর্ব্বার ঘুরিতে আরম্ভ করিবে। পরে আবার বসিবে, তাহার পর

আবার বসিবে, তাহার পর আবার ঘুরিবে। যতক্ষণ রস শুষ্ক না হইবে ততক্ষণ মাথা ঘুরিবেই। তাই ঐ অবস্থায় মাঝে মাঝে বসিয়া বিশ্রাম করা আবশ্যক। পরে দীর্ঘ ও অখণ্ড অভ্যাসে প্রদক্ষিণের ফলে দেহস্থ রস শুষ্ক হইয়া যাইবে। তখন আর মাথা ঘুরিবে না। অতি গভীর প্রশান্তি অনুভব হইবে—ব্রহ্মরন্ধ্রে "তালাও" অথবা জলপূর্ণ সরোবর দর্শন হইবে। তখন সমস্ত দেহ মন স্নিগ্ধ হইয়া যাইবে। উহাই অনন্ত সমুদ্র। তৃতীয় নেত্রের সম্মুখে সদাই উহা প্রকাশমান থাকিবে, বাহিরের কথাবার্ত্তা ও ব্যবহারের মধ্যেও উহা সমভাবে সর্ব্বদা দৃশ্যমান হইবে। উহাতে কোন তরঙ্গ নাই। যখন কিছু দেখিতে ইচ্ছা হইবে তৎক্ষণাৎ তাহা উহাতে দৃষ্ট হইবে। পরে উহা আবার পূর্ব্ববৎ নিস্তরঙ্গভাব ধারণ করিবে। ইহা শেষ অবস্থা। ইহাকেই পরব্রহ্ম বলে।

ধ্যান করা ভাল নয়। কারণ ধ্যান আশ্রয় করিলে ধ্যানাতীতে যাওয়া কঠিন হইয়া পড়ে। সমস্ত চেষ্টাই শুধু কুণ্ডলিনী চৈতন্য করায় প্রয়োগ করা উচিত। কুণ্ডলিনী জাগিলে ধ্যান আপনিই আসিবে ও যথাসময়ে উহা আপনিই কটিয়া যাইবে।

বিন্দু ভেদ করিতে হইবে ঠিক সোজা সোজা মধ্যপথে। বিন্দুর এপারে ও চতুষ্পার্শে মৃত্যুলোক, ওপারে শূন্য। ওপারেই নানাপ্রকার দর্শন হইয়া থাকে।

শ্যামদাস বাবাজী

২২ বৎসর পূর্ব্বের কথা বলিতেছি। আমি তখন শ্রীশ্রীজগন্নাথ ক্ষেত্রে অর্থাৎ ৺পুরীধামে অবস্থান করিতেছিলাম। তখন গ্রীষ্মকাল। আমি প্রতিদিন অপরাহ্নে কখনও কখনও সমুদ্রের তীরে, কখনও নরেন্দ্র সরোবরের তটস্থিত জটিয়া বাবার সমাধি মন্দিরের দিকে, কখনও লোকনাথ মহাদেবের দিকে, কখনও অন্যদিকে ভ্রমণের জন্য বাহির হইতাম। একদিন পূর্ব্বোক্ত সমাধি মন্দিরে আমার বিশিষ্ট বন্ধু ৺মাখনলাল গাঙ্গুলির সহিত আধ্যাত্মিক বিষয়ে আলোচনা হইতেছিল। মাখনবাবু শিক্ষিত, বিনয়ী, ধর্ম্মপ্রাণ এবং মহানুভব পুরুষ ছিলেন। তিনি ৺বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহোদয়ের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। তাঁহার সঙ্গে স্থানীয় সাধু মহাত্মার প্রসঙ্গে যখন আলোচনা হয় তখন তিনি দিগম্বর বাবা নামে প্রসিদ্ধ একজন নগ্নকায় বেদান্তী সাধু এবং শ্যামদাস বাবাজী নামে একজন বৈষ্ণব সাধুর কথা আমাকে বলিয়াছিলেন। দিগম্বর বাবা টোটা গোপীনাথের দিকে থাকিতেন। তাহার পর তিনি ৺কাশীধামে আসিয়া দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত গঙ্গার ওপারে নৌকার মধ্যে বাস করিয়াছিলেন। তাঁহার বিশাল জটাজুট, অতি বিপুল পুষ্ট শরীর এবং সৌম্য শান্ত আকৃতি দেখিলে তাঁহাকে তীব্র বৈরাগ্যসম্পন্ন একজন উদাসী মহাপুরুষ বলিয়া ধারণা জন্মে। শ্যামদাস বাবাজী গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব ছিলেন এবং নিকটেই অবস্থান করিতেন। কারণ নরেন্দ্র সরোবরের যে পারে জটিয়া বাবার সমাধি মন্দির তাহার অপর পারেই যে প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক বাগান শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময় হইতে প্রসিদ্ধ তাহারই প্রান্তদেশে বাবাজী মহারাজ বাস করিতেন। তিনি প্রভুপাদ জগদ্বন্ধুর

পরম ভক্ত ছিলেন বলিয়া তাঁহার আবাস স্থানকে 'বন্ধু আশ্রম" বলিয়া উল্লেখ করিতেন। দিগম্বর বাবার সহিত দেখা করিবার অবসর ৺পুরীধামে অবস্থানকালে আমার ঘটে নাই। কয়েক বৎসর পরে ৺কাশীতে আমি সে অবসরপ্রাপ্ত হইয়াছিলাম। কিন্তু বর্ত্তমান প্রসঙ্গে সে আলোচনা করা অনাবশ্যক।

ইহার পর একদিন সময় করিয়া আমি মাখনবাবুর সঙ্গে বাবাজী মহাশয়কে দর্শন করিতে 'বন্ধু-আশ্রমে' গেলাম। তখন অপরাহ্নকাল, আমার সঙ্গে মাখনবাবু ব্যতীত আরো একটি ব্যক্তি ছিল। সে একটি অল্পবয়স্ক বালক। বাবাজী মহাশয় আমাদিগকে প্রাপ্ত হইয়া অত্যন্ত সমাদরের সহিত সম্ভাষণ ও অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। তখন তাঁহার মহাপ্রসাদ গ্রহণের সময় ছিল। তাঁহার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে আমাদের সকলকেই কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ মহাপ্রসাদ গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। আমরা মহাপ্রসাদ গ্রহণের পর একটি একান্ত স্থানে উপবেশন করিয়া বাবাজী মহাশয়ের সহিত আলোচনা করিতে আরম্ভ করিলাম। তিনি পূর্ব্বে স্বর্গদ্বারে হরিদাসের মঠে ছিলেন। তাঁহার পূর্ব্ব জীবনের ইতিহাস অতি অদ্ভুত। প্রথম যৌবনে তিনি কিছুদিন কাশীতে অবস্থান করিয়াছিলেন—তখন মহাযোগী ত্রৈলঙ্গস্বামী দেহত্যাগ করেন নাই। সুদীর্ঘকাল শ্রীবৃন্দাবনে কুসুম সরোবরের নিকটে ইনি বাস করিয়াছিলেন। প্রভু জগদ্বন্ধুর সঙ্গের প্রভাব তাঁহার জীবনে অনেক পরিবর্ত্তন আনয়ন করিয়াছিল। তিনি তাঁহার সাধন জগতের অনেক গভীর রহস্য কথাচ্ছলে প্রকাশ করিয়াছিলেন। ত্রৈলঙ্গস্বামী যখন তাঁহাকে মাথায় হাত দিয়া শক্তি সঞ্চার করেন সে সময় যে তাঁহার দিব্য অনুভূতি লাভ হইয়াছিল তাহার বিস্তারিত বর্ণনা করিয়া তাঁহার ধর্ম্মজীবনের সহিত ঐ অনুভূতির সম্বন্ধ কি তাহা বুঝাইয়াছিলেন। বর্ত্তমান সময়ে শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ীর প্রভাব তিনি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেন।

শ্যামদাস বাবাজী বয়সে খুবই বৃদ্ধ ছিলেন—ঐ সময় তাঁহার বয়স

৮২ বা ৮৪ বৎসরের নিকটবর্ত্তী ছিল বলিয়া আমার মনে হয়। তাঁহার শরীর পুষ্ট, বর্ণ শ্যাম এবং মুখকান্তিতে প্রসন্নতা ও বৈষ্ণবোচিত বিনয় প্রকাশিত হইত। তাঁহার প্রকৃতি এত মধুর ছিল যে কেহ দুর্ব্ব্যবহার করিলেও তাহার সহিত তিনি রূঢ় আচরণ করিতে পারিতেন না। তিনি বৈষ্ণব এবং বাবাজী বলিয়া পরিচিত হইলেও সাধারণ বৈষ্ণবের মত ছিলেন না। তাঁহার চিত্তে ভক্তি ও জ্ঞান সমভাবে উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। তিনি সত্যের উপাসক ছিলেন। যে কোন আধারে যে কোন রূপে সত্যের প্রকাশ দেখিতেন তাহাকে সমান আদরে গ্রহণ করিতেন। একদিকে ত্রৈলঙ্গস্বামী এবং অপর দিকে জগদ্বন্ধু এই উভয়কেই তিনি গুরু বলিয়া মানিতেন। শুধু তাহাই নহে। বারদীর সিদ্ধযোগী লোকনাথ ব্রহ্মচারীর সম্বন্ধেও তাঁহার উচ্চ ধারণা ছিল। উক্ত ব্রহ্মচারীর শিষ্য ব্রহ্মানন্দ ভারতীর সঙ্গলাভ দ্বিতীয়বার কাশীতে অবস্থানকালে অনেকদিন পর্য্যন্ত তাঁহার হইয়াছিল। জ্ঞান, ভক্তি, যোগ কোনটিকে তিনি নিকৃষ্ট বলিয়া মানিতেন না।

আমি তাঁহাকে তাঁহার আধ্যাত্মিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে প্রশ্ন করাতে তিনি কোন প্রকার আড়ম্বর না করিয়া সরলভাবে আমাকে বলিয়াছিলেন যে তাঁহার 'স্বভাব' জাগিয়া গিয়াছে—তিনি এমন একটি অবস্থাতে আসিয়া পোঁছিয়াছেন যেখান হইতে তিনি সর্ব্বদা দ্রষ্টাভাবে নিজের স্বভাবের খেলা দেখিতে পান। এই দেখার সঙ্গে সুখ দুঃখের কোন ভাব জড়িত থাকে না। একটি শান্ত, আনন্দময় নির্লিপ্তভাব তিনি সর্ব্বদাই অনুভব করেন। তিনি নিজের ধর্ম্ম-জীবনের অনেক গুহ্য অনুভূতি স্বতঃপ্রেরিত হইয়া আমার নিকট কথা প্রসঙ্গে প্রকাশ করিয়াছিলেন। উহা হইতে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইত, তিনি ঐ সময় কি প্রকার স্থিতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পূর্ব্বে যে স্বভাবের কথা বলা হইল উহা তাঁহার মতে চিদাকাশেরই নামান্তর। তিনি আন্তর দৃষ্টির সম্মুখে সর্ব্বদাই একটি নীলবর্ণ মণ্ডলাকার আকাশের মত সত্তা দেখিতে পাইতেন। কিন্তু বাহ্যভাবে লিপ্ত হইলে উহা দৃষ্টিগোচর হইত না।

কিছুক্ষণ পরেই বাহ্যভাবের প্রাবল্য কাটিবার সঙ্গে সঙ্গে আবার উহা পূর্ব্ববৎ দৃষ্টিগোচর হইত। পক্ষান্তরে তিনি ইহাও লক্ষ্য করিতেন যে, ঐ আকাশে অন্তর্দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকিলে বাহ্যভাবে জড়িত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না।

আকাশে কি দেখিতে পাওয়া যাইত ? ইহার উত্তরে তিনি বলিতেন যে, ঐ আকাশের মন প্রভৃতি নিজের প্রকৃতির সব খেলাই তিনি দেখিতে পাইতেন। কিন্তু ঐ দর্শন বিবিক্ত বা তটস্থ দর্শন বলিয়া উহা দ্রষ্টাকে রঞ্জিত করিয়া ভোক্তার রূপে পরিণত করিতে পারিত না। তিনি বলিতেন যে তাঁহার আত্মদর্শন হইয়াছে। জগতের যাবতীয় বস্তুর মধ্যেই তিনি নিজের স্বভাবটিকে স্পষ্ট দেখিতে পাইতেন। তিনি সাকারের মধ্যে নিরাকার আকাশকে দেখিতেন, আবার এই নিরাকার আকাশের মধ্যে জাগতিক সকল খেলাই দেখিতেন। অথচ এই দেখাতে কোন প্রকার মোহের সংশ্রব ছিল না। মাঝে মাঝে চিত্তে যে লিপ্ততার আভাস আসিত তাহা পূর্ব্বসংস্কারের অভিনয় বলিয়া তিনি মনে করিতেন। তিনি বলিতেন, এই সংস্কারটুকু শোধিত হইলে ঐ আভাসটুকুও আর থাকিবে না। প্রাক্তন অসংস্কৃত প্রকৃতির (আনরিজেনারেট নেচার) ঐটুকুই মাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছে। বাবাজী মহাশয় অত্যন্ত নির্জ্জনতাপ্রিয় ছিলেন। বহুলোক তাঁহাকে জানিতেন, কিন্তু অনেকেই তাঁহাকে ঠিক ঠিক চিনিতে পারিতেন না। আমি মাসাধিককাল তাঁহার সঙ্গসুখ অনুভব করিবার সৌভাগ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। শুনিয়াছিলাম আমি কাশীতে ফিরিয়া আসিবার কিছুদিন পরেই তিনি নরদেহ ত্যাগ করিয়াছিলেন। তাঁহার কয়েকটি কথা আমার ভাল লাগিয়াছিল। এইখানে উহা সংক্ষিপ্তভাবে প্রকাশ করিলাম ঃ

নাম কতদূর যায় ? বৈকুণ্ঠ পর্য্যন্ত নামরূপ। তাহার পর নাম নাই। পাগল হরনাথ বলিতেন—"যে শ্রীকৃষ্ণকে নাম ধরিয়া ডাকা যায় সে শ্রীকৃষ্ণকে দিয়া কি হবে ? চাই নিকুঞ্জবিহারী কৃষ্ণ—যেখানে শব্দ যায় না। সেটা তাঁর কৃপা ছাড়া হয় না।"

ভক্তের মধ্য দিয়া তাঁহার উপাস্য মহাপুরুষকে ভক্তি করা বড় চমৎকার। মাখনবাবু গোঁসাইকে (গুরুকে) ভালবাসেন, তাঁহার মধ্য দিয়া গোঁসাইকে দেখিলে বিশেষ আনন্দ পাওয়া যায়।

যে আকাশটা দেখিতে পাই সেটা আমার প্রকৃতি—চিদাকাশ। আমি নিরাকার, দ্রষ্টা, নির্লিপ্ত। আমার প্রকৃতি কার্য্য করিতেছে, আমি দেখিতেছি মাত্র। ইহাই বিবেক। বিবেক হারাইলে আকাশ দেখা যায় না। তখন আমি কর্ত্তা সাজিয়া বসি, লিপ্ত হই। তখন ঐ আকাশ হইয়া নামিয়া আসি।

ঐ আকাশে শব্দ হয়—তারপর একটা ছায়া ভাসে। তাহাই সৃষ্টি। ছায়া ক্রমশঃ ঘনীভূত হয়। ইহাই প্রত্যক্ষ দর্শন।

ত্রৈলঙ্গস্বামী আমার মাথায় হাত দিয়াছিলেন। ৫।৭ দিন পর্য্যন্ত বুঁদ ছিলাম—তিনটা কাল একসঙ্গে দেখিতাম।

আগে নিজেকে নিজে কৃপা ক'র।

গুরু তিনবার ডাকেন—তারপর ছাড়াইয়া দেন।

অনুকূল প্রকৃতি চাই. কার্য্যের যোগ্যতা নিয়া মহাপুরুষগণ আসেন।

আমার যা-কিছু হইয়াছে, সঙ্গ হইতে।

মন অত্যন্ত সূক্ষ্ম হয়, হইয়া গ্রন্থিগুলি খোলে।

যোগত্রয়ানন্দজী

আজ যাঁহার কথা বলিতেছি তাঁহাকে বঙ্গদেশের অনেক বিশিষ্ট মনীষী বিশেষভাবে জানেন ও শ্রদ্ধা করেন, আবার অনেকে হয়তো তাঁহার নাম পর্য্যন্তও শোনেন নাই। আমি একদিন অতি অদ্ভুতভাবে এই মহাপুরুষের সংস্রবে আসিয়াছিলাম। কিভাবে আসিয়াছিলাম তাহার একটি সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত না দিলে কথা অসম্পূর্ণ থাকিবে, সেই জন্য এই মহাপুরুষের সহিত আমার প্রথম পরিচয়ের পূর্ব্ব ইতিহাস বলিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

প্রায় ৫৯ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ আমি যখন হাইস্কুলে এন্‌ট্রান্স পরীক্ষা দিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলাম, সেই সময় একখানা অদ্ভুত পুস্তক আমার দৃষ্টিপথে পতিত হয়। আমার স্বগ্রামবাসী একটি শিক্ষিত ভদ্রলোক অকালে পরলোক গমন করার পর তাঁহার গ্রন্থালয়ে সঞ্চিত পুস্তকরাশি তাঁহার পরিবারবর্গ বিক্রয় করিতে সঙ্কল্প করেন। ভদ্রলোকটির আর্থিক স্বচ্ছলতা ছিল না। তাই তাঁহার পরিবারবর্গের এই প্রকার চেষ্টা প্রশংসনীয় না হইলেও ক্ষমার্হ বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। ভদ্রলোকটির ঘরে কিছু সংস্কৃত পুস্তক এবং বাংলা পুস্তক রক্ষিত ছিল। সবগুলি পুস্তকই আধ্যাত্মিক বা ধার্ম্মিক বিষয় সংক্রান্ত। এই সকল পুস্তকের মধ্যে প্রসিদ্ধ সাধু মহাপুরুষদের জীবনবৃত্তান্ত সংগ্রহও কিছু ছিল। বলা বাহুল্য, আমি ঐ সঞ্চিত পুস্তকগুলির মধ্যে অনেকগুলি পুস্তক অল্পমূল্যে ক্রয় করিয়াছিলাম। আমার ক্রীত পুস্তকরাশির মধ্যে "আর্য্যশাস্ত্র প্রদীপ" নামে একখানা পুস্তকের প্রথম দুইটি খণ্ড বিদ্যমান ছিল। অন্যান্য পুস্তক পড়ার পর যখন আমি ঐ পুস্তকখানা আলোচনা করিতে আরম্ভ করিলাম তখন

আমার মনে যে অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হইয়াছিল এই দীর্ঘকাল পরে তাহা সম্যক্ প্রকারে বর্ণনা করা সম্ভবপর নয়। যদিও পুস্তকখানার প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড আমার নিকট ছিল, তথাপি উহা অসম্পূর্ণ ছিল এবং মনে হইয়াছিল তৃতীয় খণ্ডেও উহা সম্পূর্ণ হয় নাই। বস্তুতঃ এই খণ্ডগুলি প্রকৃত পুস্তক নহে, উহার ভূমিকামাত্র। প্রকৃত পুস্তক লিখিত হইয়াছিল কিনা তাহার সন্ধান জানিবার তখন কোনই উপায় ছিল না। ঐ ভূমিকাতে—যাহা প্রায় বহুশত পৃষ্ঠাব্যাপী—এইরূপ অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও বহুদর্শিতার নিদর্শন ছিল যাহা দেখিয়া তৎকালে আমার মন স্তব্ধ হইয়া গিয়াছিল এবং নীরবভাবে মহাজ্ঞানী ঋষিকল্প গ্রন্থকারের চরণে পুনঃপুনঃ প্রণতি জ্ঞাপন করিতেছিলাম। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, প্রাচীন এবং নবীন দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি সর্ব্ব শাস্ত্রেরই পূর্ণ জ্ঞানের পরিচয় এই গ্রন্থমধ্যে প্রাপ্ত হইয়া আমার একান্ত ইচ্ছা হইয়াছিল যে ইঁহাকে দর্শন করিব এবং ইঁহার চরণে বসিয়া জ্ঞানের অনুশীলন করিব। গ্রন্থপাঠে মনে হইতেছিল যে গ্রন্থকার কর্ম্ম, ভক্তি, জ্ঞান, যোগ প্রভৃতি সকল মার্গেই সমরূপে অধিকারী; তিনি ঋষিকল্প এবং বর্ত্তমান ইংরেজী শিক্ষিত ও বিজ্ঞানমদগর্ব্বিত শিক্ষিত সমাজের গুরুস্বরূপ।

কিন্তু দুঃখের বিষয় বহু অনুসন্ধান করিয়াও গ্রন্থকারের কোন সন্ধান করিতে পারিলাম না, কারণ গ্রন্থমধ্যে সবই ছিল, কেবল গ্রন্থকারের নামের উল্লেখ ছিল না। প্রকাশকের নাম ছিল, মুদ্রাযন্ত্রের নাম ছিল, মুদ্রণ সময়ের উল্লেখ ছিল কিন্তু গ্রন্থের রচয়িতা যে কে তাহার কোন নির্দ্দেশ ছিল না। এইরূপ অপরূপ গ্রন্থের রচয়িতা যে এমনভাবে আত্মগোপন করিয়া থাকিবেন তাহা ধারণা করিতে পারি নাই। যাহা হউক, প্রত্যক্ষভাবে রচয়িতাকে ধরিতে না পারিলেও পরোক্ষভাবে তাঁহার নিকট ভূয়োভূয়ঃ শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিয়াছি। বহুদিন পর্য্যন্ত বহু প্রকারে ঐ গ্রন্থের অনুশীলন করিয়াছি এবং আমার পরিচিত জ্ঞানবৃদ্ধ অনেক শিক্ষিত ব্যক্তিকেই আর্য্যশাস্ত্র

প্রদীপের রচয়িতার সন্ধান দানের জন্য অনুরোধ করিয়াছি। কিন্তু যখন দেখিলাম যে কেহই কিছুই বলিতে পারে না, তখন স্বভাবতঃই এই ব্যর্থ অনুসন্ধানের চেষ্টা হইতে বিরত হইলাম। ইহা ১৯০৪-১৯০৫ সনের কথা।

ইহার পর প্রায় ২।৩ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। আমি তখন রাজস্থানের অন্তর্গত জয়পুর নগরে মহারাজা কলেজে অধ্যয়ন করি। সেখানে মহারাজার প্রধানমন্ত্রী রাও বাহাদুর সংসারচন্দ্র সেন-এর বাড়ীতে আমি অবস্থান করিতাম। আমাদের ইংরেজীর অধ্যাপক ছিলেন নবকৃষ্ণ রায়, ইনি একদিকে পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের শিষ্য এবং নিষ্ঠাবান আনুষ্ঠানিক হিন্দু ছিলেন এবং অপরদিকে কোচবিহার ভিক্টোরিয়া কলেজের অধ্যক্ষ, পরলোকগত সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয়ের প্রিয় শিষ্য ছিলেন। অবশ্য ব্রজেন্দ্রবাবু যখন বহরমপুর কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন সেই সময়ে নববাবু তাঁহার নিকট অধ্যয়ন করিবার সৌভাগ্য প্রাপ্ত হন। নববাবু আমাকে বিশেষ স্নেহ করিতেন এবং আমি অনেক সময় তাঁহার বাড়ীতে যাইয়া তাঁহার সহিত সাহিত্য ও শাস্ত্রাদি বিষয়ে আলোচনা করিতাম। একদিন কথাপ্রসঙ্গে আমি তাঁহাকে আর্য্যশাস্ত্র প্রদীপের কথা জিজ্ঞাসা করিলাম এবং আমার নিকট ঐ পুস্তকের যে অংশ বিদ্যমান ছিল তাহা তাঁহাকে পড়িতে দিলাম। গ্রন্থখানা কিছুদূর অবলোকন করিয়া কয়েকদিন পরে তিনি আমাকে বলিলেন—"গ্রন্থকার কে তা আমি জানি না, কিন্তু গ্রন্থ পড়িয়া মনে হয়, ইনি আমার গুরুদেব শ্রীশশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের সহিত কোন না কোন সূত্রে সংশ্লিষ্ট হইবেন।"

মোটের উপর তিনি বিশেষ কোনই সন্ধান দিতে পারিলেন না।

ইহার কয়েকদিন পরে আমি একদিন জয়পুর ষ্টেটের একাউন্টেন্ট জেনারেল সত্যেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সহিত প্রসঙ্গতঃ কর্ম্মবাদ সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিলাম। সত্যেন্দ্রনাথবাবু আমাদের বাসার সমীপেই

একটি পৃথক্ বাংলোতে অবস্থান করিতেন। তিনি বালব্রহ্মচারী এবং একান্ত ধর্ম্মনিষ্ঠ পুরুষ ছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা প্রেমানন্দ ভারতী নামে আমেরিকাতে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। প্রেমানন্দ ভারতী আমেরিকাতে অবস্থানকালে 'লাইট অব ইণ্ডিয়া' নামক একখানা পত্রিকার সম্পাদনা করিতেন। তিনি 'শ্রীকৃষ্ণ' নামে একখানি উৎকৃষ্ট ইংরেজি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার গুরু ব্রহ্মানন্দ ভারতী বারদীর স্বনামখ্যাত লোকনাথ ব্রহ্মচারীর শিষ্য ছিলেন।

কর্ম্মতত্ত্ব সম্বন্ধে সত্যেনবাবুর সহিত আলোচনা হইতেছিল। তিনি আলোচনার মুখে কর্ম্ম ও কর্ম্মবিনাশ বিষয়ে আরও সুন্দর একটি ব্যাখ্যান দান করেন। তাঁহার এই ব্যাখ্যান আমাকে তীব্রভাবে আকর্ষণ করিয়াছিল। এইরূপ সুযুক্তিপুর্ণ ব্যাখ্যান তিনি কোন্ শাস্ত্রের উপর নির্ভর করিয়া দিতে পারিলেন তাহা জানিবার জন্য আমি অত্যন্ত ঔৎসুক্য প্রকাশ করিলাম। তখন তিনি বলিলেন,—"এই ব্যাখ্যান আমার নিজের নহে। আমি ইহা কোনও মহাপুরুষের নিকট হইতে শ্রুত হইয়াছি। সেই মহাপুরুষ অত্যন্ত গোপনে থাকেন এবং সাধারণতঃ আত্মপ্রকাশ করেন না। স্বামী বিবেকানন্দ (নরেন্দ্রনাথ) স্বামী অভেদানন্দ (কালী) আমার দাদা প্রেমানন্দ প্রভৃতি অনেকেই এক সময়ে তাঁহার নিকট যাইতেন। তখন তিনি বরাহনগর অথবা বালির দিকে থাকিতেন। এখনকার খবর কিছু জানি না। লোকটি ভারী অসাধারণ।" সত্যেনবাবুর নিকট হইতে এইরূপ বর্ণনা শুনিয়া আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি তাঁহার নাম জানেন কিনা এবং তাঁহার রচিত কোন গ্রন্থাদি আছে বলিয়া জানেন কিনা। সত্যেনবাবু বলিলেন, সে তাঁহার নাম শশিভূষণ সান্যাল এবং তাঁহার রচিত বহু গ্রন্থের মধ্যে "আর্য্যশাস্ত্র প্রদীপ"ই প্রধান।

তাঁহার মুখে আর্যশাস্ত্র প্রদীপের কথা এবং এই গ্রন্থের রচয়িতার নাম জানিতে পারিয়া আমি যেন হাতে স্বর্গ পাইলাম। বহুদিন যাবৎ

এই নামটি জানিবার জন্যই আমি চেষ্টা করিতেছিলাম, কিন্তু এতদিন কোন সন্ধান পাই নাই। আজ জানিতে পারিলাম। তবে এখন তিনি আছেন কিনা, থাকিলে কোথায় আছেন, সে সন্ধান তিনি দিতে পারিলেন না। যাহা হউক, নাম জানার ফলে ভাবী অনুসন্ধানের পথ অনেকটা সরল হইয়া গেল।

চারি বৎসর জয়পুর বাসের পর আমি এম, এ পড়িবার জন্য কাশীতে আসিয়াছি। ইহা ১৯১০ সালের কথা। কাশীতে আসিয়া কুইন্স কলেজে এম, এ ক্লাসে ভর্ত্তি হইয়াছি। তখন কুইন্স কলেজের তদানীন্তন অধ্যাপক হরিকেশব সান্যাল মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র ৺শচীন্দ্রনাথ সান্যাল আমার বিশেষ পরিচিত ছিলেন। স্বদেশী আন্দোলনের সূত্র ধরিয়াই আমাদের পরস্পরের মধ্যে পরিচয় হয়। অনেক সময় আমরা দেশের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ চিন্তা করিতাম এবং পরস্পর আলোচনা করিতাম এবং ধর্ম্মের ভিত্তিতেই এই উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ প্রতিষ্ঠা সম্ভব, ইহাই আমাদের ধারণা ছিল। শচীন্দ্রনাথ আমা হইতে বয়সে ছোট হইলেও উদ্যমশীলতা এবং স্বদেশানুরাগের জীবন্ত প্রতীক স্বরূপ ছিলেন। তাঁহার "বন্দী জীবন" প্রভৃতি যাঁহারা পড়িয়াছেন তাঁহারাই তাহা জানেন। ভারতীয় স্বাতন্ত্র্য আন্দোলনের ইতিহাসে এই শচীন্দ্রনাথের নাম স্বর্ণ-অক্ষরে গ্রথিত থাকিবে, কিন্তু তাঁহার ভবিষ্যৎ অদ্ভুত সঙ্কটময় জীবনের পূর্ব্ব সূচনা তখনও আসে নাই। শচীন্দ্রনাথ সেণ্ট্রাল হিন্দু কলেজে ইণ্টারমিডিয়েট ক্লাসে অধ্যয়ন করিতেন।

একদিন সন্ধ্যাবেলা আমরা গঙ্গাতীরে দশাশ্বমেধ ঘাটে অন্যান্য বন্ধুবর্গের সঙ্গে বসিয়া আলাপ করিতেছিলাম, তখন হঠাৎ শচীন্দ্রনাথ আমাকে বলিলেন, কাশীতে একজন অসাধারণ মহাপুরুষ আছেন, বহু দেশ হইতে বহু লোক তাঁহাকে দর্শন করিতে আসেন। তাঁহার দর্শন লাভ করা অতি কঠিন। সাধারণতঃ অনেককেই ফিরিয়া যাইতে হয়। চলুন, একদিন আমরা তাঁহাকে দর্শন করিয়া আসি। আমি জিজ্ঞাসা

করিলাম—"যাঁহাকে দর্শন করা এত কঠিন তাঁহার নিকট আমাদের মত দুইজন বিদ্যার্থীর উপস্থিত হওয়া কি প্রকারে সম্ভব হইবে?" শচীন্দ্র বলিলেন, "সেই মহাপুরুষের কনিষ্ঠ পুত্র আমার সহপাঠী। আমি তাঁহাকে বলিলেই সে চেষ্টা করিয়া আমাদিগকে দর্শনের সুযোগ করিয়া দিবে। সাধারণ উপায়ে তাঁহার সঙ্গে দেখা করা সহজ নহে।"

আমি কিঞ্চিৎ ইতস্ততঃ করিতেছিলাম। ভাবিতেছিলাম, যদি দর্শন করিতে যাইয়া ফিরিয়া আসিতে হয় তাহা হইলে অত্যন্ত দুঃখের কারণ হইবে। আর দর্শন করিয়া কি লাভ হইবে, এইরূপ প্রশ্নও মনে উদয় হইল। শচীন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"মহাপুরুষটির নাম তুমি জান কি? তিনি এখানে কোথায় থাকেন?" উত্তর হইল, "তাঁহার বাসা সোনারপুরা মহল্লাতে। তাঁহার নাম শ্রীশশিভূষণ সান্ন্যাল। আমার সহপাঠীর নাম শ্রীইন্দুভূষণ সান্ন্যাল।" শশিভূষণ সান্ন্যাল নাম শুনিয়াই আমার পূর্ব্বস্মৃতি জাগিয়া উঠিল। আমার মনে হইল, হয়তো ইনিই আর্য্যশাস্ত্র প্রদীপ-প্রণেতা শশিভূষণ সান্ন্যাল হইবেন। আর্য্য-শাস্ত্র প্রদীপ সম্বন্ধে শচীনকে জিজ্ঞাসা করিতে তিনি কিছুই বলিতে পারিলেন না। তিনি শুধু বলিলেন, "আমি জানি, তিনি মহাপুরুষ ও মহাপণ্ডিত। কোন পুস্তক লিখিয়াছেন কিনা তাহা আমি জানিনা।" যাহা হউক, আমার মনের সঙ্কোচভাব কাটিয়া গেল। আমি মনে মনে নিশ্চয় করিলাম, দেখা করিতেই হইবে। ইহার পর শচীন্দ্রনাথ ইন্দুভূষণের সহিত পরামর্শ করিয়া সান্ন্যাল মহাশয়ের নিকট যাইবার জন্য একটি দিন নির্দ্দিষ্ট করেন। ঐ দিন বেলা দুইটার সময় আমি ও শচীন্দ্র এই দুইজন দর্শন করিতে যাইতে পারিব, এইরূপ ঠিক করা হইল। ইন্দুভূষণের নিকট হইতে জানিতে পারা গিয়াছিল যে, আমরা যাইয়া আধঘণ্টা হইতে একঘণ্ট পর্য্যন্ত সেখানে থাকিতে পারিব, এইরূপভাবে ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

যেদিন পূজনীয় সান্ন্যাল মহাশয়ের সহিত দেখা করার দিন ঠিক করা হইয়াছিল সেইদিন যথাসময়ে আমি ও শচীন একসঙ্গে মিলিত হইয়া শচীনের নির্দ্দেশ অনুসারে সোনারপুরা বাড়ীতে ২টা বাজার প্রায় ১৫ মিনিট পূর্ব্বেই উপস্থিত হই। ঐ বাড়ীতে যাইয়া অনুভব করিলাম যে চারিদিকের বাতাবরণের মধ্যে একটি অসাধারণ পবিত্রতা ও স্নিগ্ধতা যেন খেলিতেছিল। চারিদিকের নিস্তব্ধ এবং নীরব ভাব ঐ শান্ত বাতাবরণকে আরও যেন গম্ভীর করিয়া তুলিয়াছিল। আমরা ঐ বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া দর্শনার্থীদের জন্য নির্দ্দিষ্টস্থানে উপবেশন করিয়া প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। ইতিমধ্যে কিছুক্ষণ পরেই ইন্দুভূষণ আমরা আসিয়াছি কিনা সংবাদ নিবার জন্য নীচে নামিয়া আসিল। তখন প্রায় দুটা বাজিয়া গিয়াছে। ইন্দুভূষণ আমাদের উভয়কেই ইঙ্গিত করিল যে আর কালবিলম্ব না করিয়া আমরা যেন তাহার অনুগমন করি। কারণ তাহার পূজনীয় পিতৃদেব আমাদিগের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছেন। তখন আমরাও রওনা হইলাম এবং একতলা হইতে ধীরে ধীরে সিঁড়ি বাহিয়া দোতলা পর্য্যন্ত উঠিলাম। দেখিলাম, ঐ দোতলাতেই তাঁহার পিতৃদেবের বসিবার স্থান।

একটি বিরাট হল, তাহার পার্শ্বেও ঘর আছে এবং সম্মুখে একটি বিশাল বারান্দা। এই হলের মধ্যে চারিদিকে স্তূপীকৃত পুস্তকরাশি। পুস্তকগুলি অতি সুন্দরভাবে স্তরে স্তরে সজ্জিত রহিয়াছে এবং স্তরগুলি ক্রমোচ্চভাবে একটি সুন্দর গ্যালারীর মত বিন্যস্ত। শুধু তাহাই নহে, কোন কোনও পুস্তকের স্তর প্রয়োজন অনুসারে চক্রাকারে অথবা অর্দ্ধচক্রাকারে সুসজ্জিত। বিভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়া এক একটি সরু গলি গিয়াছে। আমরা যে গলি দিয়া যাইতেছিলাম অর্থাৎ হলের মধ্যে প্রবেশ করিতেছিলাম সেটিই প্রধান গলি। আমরা যাইয়া দেখিলাম, হলের প্রান্তভাগে একখানা সাধারণ মাদুরের আসনে মহাপুরুষ উপবিষ্ট আছেন। তাঁহার পৃষ্ঠদেশে একটি বৃহৎ তাকিয়া এবং সম্মুখে ও চারিদিকে বিক্ষিপ্তভাবে কিছু কাগজপত্র ও সর্ব্বদা

ব্যবহার্য্য পুস্তকাদি রাখা ছিল। দোয়াত, কলম, পেন্সিল, কাগজ প্রভৃতি যাবতীয় সামগ্রী নিকটেই রক্ষিত ছিল।

নীচে হইতে উপরে উঠিবার সময় আমার মনে মনে একটু আশঙ্কা হইতেছিল যে, এত বড় একজন জ্ঞানী ও মহাপুরুষের সঙ্গে দেখা করিতে যাইতেছি—তাঁহার সঙ্গে কি বিষয়ে কথা বলিব এবং কি প্রকারে তাঁহার নিকট নিজের ভাব প্রকাশ করিব? মনে একটু একটু শ্রদ্ধামিশ্রিত ভীতির সঞ্চার হইতেছিল। কিন্তু যখন পুস্তকস্তূপের অন্তরালে যাইয়া তাঁহার প্রত্যক্ষ দর্শন লাভ করিলাম তখন মুহূর্ত্তের মধ্যে সকল আশঙ্কা ও সঙ্কোচ কাটিয়া গেল। যাঁহাকে এতদিন হইতে দেখিবার জন্য লালায়িত ছিলাম এবং যাঁহার নাম ও ধাম আবিষ্কার করিতে এতদিন কাটিয়া গেল, ইনিই সেই আর্য্যশাস্ত্র-প্রদীপকার? এই প্রশ্ন মনে উদিত হইতে লাগিল। দেখিলাম মূর্ত্তিটি অতি সৌম্য, প্রশান্ত ও গম্ভীর। অসাধারণ পাণ্ডিত্য সত্ত্বেও বালকোচিত সরলতা যেন তাঁহার মুখমণ্ডলে ভাসিতেছিল। স্নেহ, করুণা ও ব্যাকুলতার একটি ভাব যেন তাঁহার নেত্রদ্বয়কে আর্দ্র করিয়া রাখিয়াছিল। আমরা যাইয়াই তাঁহাকে প্রণাম করিলাম এবং তিনিও আমাদিগকে যথোচিত আশীর্ব্বাদ প্রদান করিলেন। শচীন্দ্র আমার পশ্চাতে বসিয়াছিল, আমি সম্মুখে থাকিয়া মহাপুরুষের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলিতেছিলাম। ইন্দুভূষণ আমাদিগকে পৌঁছাইয়া দিয়াই নীচে চলিয়া গিয়াছিল। মহাপুরুষ আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি কি পড়ি এবং কোথায় পড়ি তাহার সম্পূর্ণ সমাচার তাঁহাকে জানাইলাম।

তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা, তোমার কিছু জিজ্ঞাস্য আছে কি? যদি কিছু প্রশ্ন থাকে, নিঃসঙ্কোচে জিজ্ঞাসা করিতে পার।" তাঁহার বাক্যগুলি স্নেহ ও করুণায়, বিশেষতঃ বাৎসল্য-ভাবের স্নেহের সুরে উচ্চারিত হইয়াছিল। সুতরাং আমার মনে তখন প্রকৃত প্রশ্ন কিছু না থাকিলেও তাঁহার নিকট হইতে উপদেশ শুনিবার আকাঙ্ক্ষায় একটি কৃত্রিম প্রশ্ন উত্থিত হইল। আমি জিজ্ঞাসা

করিলাম—"বাবা, সত্য এক ও অখণ্ড, ইহাই গুরুজনের মুখে শুনিয়াছি। মুনিঋষি সকলেই সর্ব্বজ্ঞ, ইহাও শুনিয়াছি। সত্য যদি একই হয় এবং মুনিঋষিরা যদি সকলেই সত্যের সাক্ষাৎকার করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাদের মধ্যে মতবৈষম্য হয় কেন? 'নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নম্' এই বাক্যটির প্রকৃত তাৎপর্য্য কি? এই বাক্য হইতে বুঝা যায় যে, নানা মুনির নানা মত। এই ধারণা প্রাচীনকাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে। ব্রহ্মবিৎ দুইজন মুনির কি একমত হইতে পারে না?" আমার এই প্রশ্ন শুনিয়া মহাপুরুষ অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। তিনি বলিলেন—"বৎস, তোমার প্রশ্ন আমাকে যথেষ্ট আনন্দ দান করিয়াছে। এই প্রশ্নের মীমাংসা হওয়া সত্যই আবশ্যক। শুধু তোমার কেন, অনেকের মনেই এই প্রশ্নের উদয় হয়। ইহার সমাধান করিতে না পারিলে জ্ঞানের প্রকৃত গৌরব ধারণা করা যায় না। কিন্তু ভাবিয়া দেখ, তোমার প্রশ্নের অঙ্গীভূত বাক্যের মধ্যেই উহার সমাধান রহিয়াছে। মুনি কাহাকে বলে? যিনি মননশীল তিনিই মুনিপদবাচ্য। মত কাহাকে বলে? মনের দ্বারা যাহা অঙ্গীকৃত হয় অর্থাৎ অখণ্ড সত্যের যে অংশটুকু খণ্ড মনের দ্বারা গৃহীত হয় তাহাই মত। যতক্ষণ পর্য্যন্ত মনকে অবলম্বন করিয়া সত্যের সাক্ষাৎকারের চেষ্টা করা যাইবে ততক্ষণ পর্য্যন্ত অখণ্ড সত্যের দর্শনলাভ সুদূর-পরাহত। অখণ্ড সত্যের ধারণা করিতে হইলে মনকে নিরুদ্ধ করিয়া এবং শুধু মনকে নয় অন্তঃকরণের যাবতীয় বৃত্তিকেই নিয়ন্ত্রিত করিয়া অন্তঃকরণের বাহিরে যাইতে হইবে। অন্তঃকরণের পৃষ্ঠ-ভূমিতেই আত্মার স্বয়ংপ্রকাশ আলোক অবস্থিত। বিকল্প শক্তির দ্বারা মন ঐ আলোককে ভাগ করিয়া পৃথক্ পৃথক্ ভাবরূপে পরিণত করে। মনের ইহা দোষ নহে, ইহাই মনের স্বভাব।

"বিকল্পশূন্য পরম সত্যকে পাইতে হইলে মনের ঊর্দ্ধে উত্থিত হইতে হইবে। এই অবস্থায় মতামতের কোন প্রশ্নই উঠে না। কারণ মনই যেখানে নাই সেখানে মত কোথায়? কিন্তু ঐ সত্যের প্রকৃত চিত্র

অজ্ঞানীকে প্রদর্শন করান যায় না, কারণ উহার সংক্রমণ হয় না। অর্থাৎ এক আধার হইতে অন্য আধারে সঞ্চার হয় না। যাহার চিত্ত ঐ স্বয়ংপ্রকাশ ভূমিতে প্রবিষ্ট হইবে তাহার নিকট উহা আপনিই প্রকাশিত হইবে। কিন্তু অজ্ঞান জগতের জ্ঞানলাভের কোন উপায় উহা হইতে হয় না। ঐ অবস্থা যাহার হয়, শুধু উহা তাহারই হয়। ঐ জ্ঞান অজ্ঞানী পরন্তু অনুরাগী ও আশ্রিত জিজ্ঞাসু জনকে দিতে হইলে মনের আশ্রয় গ্রহণ অবশ্যম্ভাবী। মনের ধর্ম্মই কল্পনা বা বিকল্পবৃত্তি। ঐ বিশুদ্ধ জ্ঞানকে বিকল্পের সঙ্গে যুক্ত করিয়া জিজ্ঞাসুর নিকট উপস্থাপিত করা হয়। বিকল্প নানা প্রকার। জিজ্ঞাসুর চিত্তের প্রকৃতি, বাসনা ও অনুভব প্রভৃতি বিচার করিয়া তত্ত্বজ্ঞ গুরু তদনুরূপভাবে শব্দের সাহায্যে তাঁহাকে ঐ জ্ঞান দান করেন।

"এই খানেই মনের সার্থকতা। এইখান হইতেই মতের উদ্ভব হয়। যিনি পূর্ণ সত্যকে মনের দ্বারা ধারণা করিতে যান তাঁহার ত মত থাকিবেই, কিন্তু যিনি মনকে ত্যাগ করিয়া পূর্ণ সত্যকে গ্রহণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন তাঁহারও মত থাকে। তখন তিনি মনোভূমিতে বিদ্যমান, বিশিষ্ট অধিকারসম্পন্ন জিজ্ঞাসুর নিকট ঐ জ্ঞান সঞ্চার করেন। এই জন্যই উভয় জ্ঞানীতে স্বরূপতঃ পার্থক্য না থাকিলেও অধিকার ভেদে তাঁহাদের উপদেশের মধ্যে পার্থক্য আসিয়া পড়ে। এই জন্যই বলা হইয়াছে—

'নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নম্।'

"ইহাই মুনিদের মতভেদের রহস্য। সাধারণ লোকের অর্থাৎ অজ্ঞ লোকের মতভেদ এই প্রকার নহে। কারণ মুনিদের মতভেদের মূলে আছে জ্ঞান, কেবল অন্যের উপদেশের জন্য বিকল্পের আশ্রয় নেওয়া হয়। সাধারণ লোকের মতভেদের মূল অজ্ঞান।"

আমি মহাপুরুষের ব্যাখান ও বিশ্লেষণ খুব মনোযোগ সহকারে শুনিতেছিলাম। বহু শাস্ত্রের প্রমাণ দেখাইয়া এবং প্রবল যুক্তি প্রদর্শন করিয়া ধীর স্থির ও সৌম্যভাবে তিনি বিষয়টির আলোচনা

করিতেছিলেন। আমরা নিশ্চলভাবে ধৈর্য্য সহকারে তাঁহার উপদেশ-বাণী গ্রহণ করিতেছিলাম। এই একদিনের পরিচয়ে তাঁহার সহিত এমন গভীর সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল যাহা পরে আর কোনদিন ভাঙ্গে নাই। শুধু তাহাই নহে—ঐ সম্বন্ধ ক্রমশঃ পরম আন্তরিকতায় পুষ্টিলাভ করিয়াছিল। আমরা বেলা চারিটার সময় ঐখান হইতে ফিরিব এইরূপ সঙ্কল্প ছিল। কিন্তু চারিটার সময় ফেরা অসম্ভব হইয়াছিল। মহাপুরুষ স্বয়ংই আমাদের সহিত আলোচনাতে এতটা তন্ময় হইয়াছিলেন যে ঐ সময়ে তাঁহার অবিচ্ছিন্ন বাক্‌প্রবাহের প্রতি-বন্ধকতা করিবার সাহস কাহারও হয় নাই। ফলে সন্ধ্যার প্রাক্কাল পর্য্যন্ত আমরা ঐখানে তাঁহার চরণতলেই উপবিষ্ট ছিলাম।

ঐ সময় হইতে আমি প্রায়ই সময় পাইলেই তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য বৈকাল বেলা তাঁহার নিকট যাইতাম। আমি গেলে সাধারণতঃ আমাকে বাহিরে প্রতীক্ষা করিতে হইত না, আমি অবাধে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইবার অনুমতি প্রাপ্ত হইতাম। তিনি কিছুদিন পর্য্যন্ত সোনারপুরার ঐ বাসাতে অবস্থান করিয়াছিলেন। তাহার পর ঐ বাসা পরিবর্ত্তন করিয়া অনতিদূরে, সম্ভবতঃ ভাদৈনীর নিকটে অন্য বাসাতে গমন করেন। সেখানেও আমি মাঝে মাঝে গিয়াছি। ঐ ভাদৈনীর বাসাতেই রংপুরের সুপ্রসিদ্ধ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয় তাঁহাকে প্রথম দর্শন করিতে গিয়াছিলেন।

তর্করত্ন মহাশয় তখন ৺কাশীবাস করিতেছিলেন। তিনি সপরিবারে এক নম্বর অগস্ত্যকুণ্ডের দোতালা বৃহৎ বাড়ীতে অবস্থান করিতেন। তাঁহার একমাত্র পুত্র বৃন্দাবনচন্দ্র তখন কুইন্স কলেজে আই, এ, অধ্যয়ন করিত। তর্করত্ন মহাশয়কে আমি সঙ্গে করিয়া মহাপুরুষের নিকট লইয়া গিয়াছিলাম। তিনি ৺কাশী আসিবার পুর্ব্বেই বহুদিন হইতেই বাবাকে বিশেষভাবে জানিতেন। তাঁহার অলৌকিক পাণ্ডিত্য এবং অসাধারণ যোগশক্তির সহিত তিনি

সাক্ষাৎভাবে পরিচিত ছিলেন। বাবার সঙ্গে তাঁহার চাক্ষুষ দর্শন না হইলেও পরম্পরাতে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে তাঁহার লোকোত্তর শক্তির বিষয় অবগত হন।

তর্করত্ন মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছি, বহুদিন পূর্ব্বে তাঁহার একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু নানাপ্রকার দুরারোগ্য ব্যাধিতে কষ্ট পাইতেছিলেন। এইসকল ব্যাধির মধ্যে তীব্র বাতের বেদনা ছিল সর্ব্বপ্রধান। নানাপ্রকার চিকিৎসা করিয়াও তাঁহার পীড়ার উপশম না হওয়াতে তিনি একপ্রকার জীবনের আশা বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন। তাঁহার দৈহিক বেদনা এইরূপ অসহ্য হইয়াছিল যে, তিনি প্রতি মুহূর্ত্তে মৃত্যুকে বরণ করিতেছিলেন। ঐ সময়ে লোকমুখে বাবার রোগ আরোগ্য করিবার অসাধারণ শক্তির কথা শুনিতে পাইয়া বহু চেষ্টাতে বাবার সান্নিধ্যে উপস্থিত হইয়া নিজের আর্ত্তি নিবেদনের সুযোগ লাভ করেন। বাবা তখন বরাহনগরে ছিলেন। রোগীর মুখে তাঁহার দুঃসহ যন্ত্রণার কথা অবগত হইয়া তাঁহার কোমল হৃদয় করুণাতে অভিভূত হইয়া যায়। তিনি তখন তাঁহাকে দৈহিক যন্ত্রণা হইতে মুক্ত করিবার জন্য সঙ্কল্প করেন।

তিতি আয়ুর্ব্বেদ, এল্যোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি, ক্রমোপ্যাথি, বায়োকেমিক প্রভৃতি বহু চিকিৎসা প্রণালী সম্যক্ অবগত ছিলেন এবং যে ক্ষেত্রে যে প্রণালী অধিক উপযোগী মনে করিতেন সেই ক্ষেত্রে তদনুসারেই চিকিৎসা করিতেন। তাঁহার রোগ নির্ণয় প্রক্রিয়াও অদ্ভুত ছিল।

তিনি এই ভদ্রলোকটীর বেলায় পূর্ব্বোক্ত কোন প্রণালীই অবলম্বন করেন নাই, শুধু বৈদিক মন্ত্রের অচিন্ত্য শক্তির আশ্রয় লইয়া রোগীর অসহ্য যন্ত্রণা অল্পকালের মধ্যেই পূর্ণভাবে শান্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সাধারণতঃ তিনি ঋগ্বেদ, অথবা অথর্ব্ববেদের মন্ত্র প্রয়োগ করিতেন। বৈদিক মন্ত্রের উপর তাঁহার এইরূপ আধিপত্য ছিল যে, তিনি যথাবিধি মন্ত্র উচ্চারণ দ্বারাই অল্পক্ষণের মধ্যে রোগের

যন্ত্রণা ও উপসর্গের জটিলতা দূর করিতে সমর্থ হইতেন। এই ভদ্রলোকটীর বেলাও তিনি সেইরূপই করিয়াছিলেন।

ভদ্রলোকটীকে সম্মুখে বসাইয়া তাঁহার মস্তক হইতে পদাঙ্গুষ্ঠ পর্য্যন্ত নিজের দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বারা সঞ্চালন করিতে করিতে বিধি অনুসারে তিনি বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিয়াছিলেন। এই উচ্চারণ ও সঞ্চালন ক্রিয়া কয়েকবার অনুষ্ঠিত হইলে রোগীর অসহ্য বেদনা আশ্চর্য্যভাবে শান্ত হইয়া যায় এবং তাঁহার দেহের মধ্যে এক প্রকার স্নিগ্ধ শান্তিময় অনুভূতি হয়। সুদীর্ঘ কালস্থায়ী এই দেহের যন্ত্রণা নিবৃত্ত হইতে পাঁচ মিনিটের অধিক সময় লাগে নাই। ইহার পর বেদনার আর পুনরাবৃত্তি হয় নাই এবং কয়েক দিন পর্য্যন্ত ঐ ক্রিয়ার অনুষ্ঠানে রোগীর মুখ্য রোগও নির্ম্মূলভাবে অপগত হয়।

এই ঘটনা তর্করত্ন মহাশয় রোগীর নিজ মুখ হইতে শুনিয়াছিলেন। তখন হইতেই তিনি বাবাজীর চরণ দর্শন করিবার জন্য উৎসুক ছিলেন। কিন্তু যোগাযোগের অভাবে এতদিন তাহা হইয়া উঠে নাই। এইবার আমার মুখে তাঁহার প্রশংসা শুনিয়া তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য সচেষ্ট হন এবং একদিন আমার সঙ্গেই ভাদৈনীর বাসাতে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে দর্শন করেন।

বাবাজী তর্করত্ন মহাশয়কে অত্যন্ত সমাদরের সহিতই অভিনন্দন করিয়াছিলেন। তর্করত্ন মহাশয় সংস্কৃত ভাষায় একজন প্রসিদ্ধ কবি ছিলেন, এমন কি তৎকালে বঙ্গদেশে ঐ ক্ষেত্রে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী কেহই ছিল না, ইহাও তিনি জানিতেন। অনেক দিন পরে তর্করত্ন মহাশয় অতি সুন্দর দ্ব্যর্থবোধক শ্লোক রচনা করিয়া মহাপুরুষকে অভিনন্দন করিয়াছিলেন। ইহা একপ্রকার প্রশস্তিকাব্য বলা যাইতে পারে, কিন্তু ইহার আলোচনা যথা সময়ে স্থানান্তরে করা যাইবে।

বাবাজী ভাদৈনীর বাসাতে কয়দিন ছিলেন তাহা ঠিক বলিতে পারিব না, তবে সেখানে যে খুব বেশীদিন ছিলেন তাহা মনে হয় না। কারণ, আমার যতটা স্মরণ হয় ১৯১২ অথবা ১৯১৩ সালে তিনি কাশী

রাজঘাট ষ্টেশনের সন্নিকটে ত্রিলোচন ঘাট হইতে অনতিদূরে নয়া মহাদেব মহল্লায় একটি বাড়ীতে অবস্থান করিতে আরম্ভ করেন। সোনারপুরা অথবা ভাদৈনীর বাড়ী ভাড়াটিয়া বাড়ী ছিল, কিন্তু নয়া মহাদেবের বাড়ীটি তাঁহার শিষ্য পেন্সনপ্রাপ্ত সাব-জজ কালীপদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহারই জন্য গঙ্গাতীরে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এই বাড়ীতে যাওয়ার পর যতদিন পর্য্যন্ত তিনি কাশীতে ছিলেন তাঁহাকে আর আবাসস্থল পরিবর্ত্তন করিতে হয় নাই। স্থানটি অতি মনোরম—জনসাধারণের চলাচলের রাজপথ হইতে দূরে একটি নিভৃত প্রদেশে অবস্থিত অথচ একেবারে গঙ্গার তীরে। যদিও বাড়ীটি খুব বিশাল বা বৃহৎ-আয়তন ছিল না তথাপি উহা নিতান্ত ছোটও ছিল না। যে প্রকোষ্ঠে বাবা উপবেশন করিতেন এবং তাঁহার গ্রন্থরাশি সজ্জিত থাকিত ঠিক সেইখান হইতে সমগ্র অর্দ্ধচন্দ্রাকার কাশীতল-বাহিনী গঙ্গার সম্পূর্ণ ধারাটি দৃষ্টিগোচর হইত। মধ্যে প্রাচীর অথবা গৃহ সংক্রান্ত কোন ব্যবধান ছিল না। বাবার বসিবার এবং ভক্তগণের সঙ্গে দেখা করিবার জন্য যে কক্ষটি নির্দ্দিষ্ট ছিল তাহার বাহিরেই একটি নাতিপ্রশস্ত বারান্দা ছিল। অনুমতিপ্রাপ্ত ভক্তগণ আসিয়া সেখানে অবস্থান করিতেন এবং বাবার উপদেশবাণী শ্রবণ করিতেন। যে বিশিষ্ট ভক্ত বা দর্শনার্থীর সঙ্গে তিনি আলোচনা করিতেন তাঁহাকে নিজ সম্মুখে নিজের ঘরেই স্থান দিতেন। যে সকল ভক্ত-দর্শনার্থী অনুমতির প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকিতেন তাঁহাদের স্থান ছিল নীচে একটি বৃহৎ হল ঘরে।

আমি ১৯১০ সাল হইতে ১৯১৭ সাল পর্য্যন্ত বাবার সহিত ঘনিষ্ঠরূপে মিলিত হইয়া নানা প্রকার আলোচনাতে যোগদান করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলাম। এই সময়ের মধ্যে ঐ স্থানে অনেক জিনিষ স্বচক্ষে দেখিবার অবকাশ হইয়াছে এবং অনেক অজানা বিষয় জানিবারও সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছি। তাঁহার সম্বন্ধে কোন মতামত প্রকাশ করা আমার পক্ষে ধৃষ্টতা। আমি তাঁহার মধ্যে একাধারে

কর্ম্ম, জ্ঞান, ভক্তি যোগ প্রভৃতি বিভিন্ন সাধন প্রণালীর যে অপূর্ব্ব সমন্বয় দেখিয়াছি তাহার তুলনা নাই। শাস্ত্রজ্ঞান তাঁহার অসাধারণ ছিল, এবং শাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাও তেমনি প্রগাঢ় ছিল। তিনি যে দৃষ্টিতে ঋষিপ্রোক্ত শাস্ত্রকে দেখিতেন—অপৌরুষের বেদাদির ত কথাই নাই—সেইরূপ দৃষ্টি বর্ত্তমান যুগে প্রাচীন সংস্কার-সম্পন্ন, পূর্ব্বাচারের অনুবর্ত্তনকারী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের মধ্যেও সাধারণত: দেখিতে পাওয়া যায় না। সমগ্র বেদ সংহিতা, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের কাছেও সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায় না। সমগ্র বেদ সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষদাদি-সহ, সমগ্র শ্রৌতসূত্র, গৃহ্যসূত্র, ধর্ম্মসূত্র, স্মৃতিশাস্ত্র ও স্মৃতিনিবন্ধ, পুরাণ, উপপুরাণ, তন্ত্রসাহিত্য, সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন জ্যোতিষ, আয়ুর্ব্বেদ, প্রভৃতি বিভিন্ন প্রস্থানের মুদ্রিত ও প্রকাশিত প্রায় যাবতীয় গ্রন্থই তাঁহার নিকট বিদ্যমান ছিল। এতদ্ব্যতীত পাশ্চাত্য দর্শন ও বিজ্ঞান, গণিত শাস্ত্র, তর্ক শাস্ত্র, চিকিৎসা শাস্ত্র প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ের বহু গ্রন্থ তাঁহার অধ্যয়নশালাতে বিদ্যমান ছিল। সব গ্রন্থই তিনি শ্রদ্ধার সহিত পড়িতেন এবং তুলনামুলক আলোচনা করিতেন। কিন্তু তাঁহার সত্য নিরূপণের কষ্টিপাথর ছিল ঋষিবাক্য। ব্যাকরণ, অলঙ্কার শাস্ত্রাদিও তিনি খুব ভাল করিয়া পড়িয়াছিলেন। সত্য কথা বলিতে কি, ভর্ত্তহরি প্রণীত বাক্যপদীয়ের প্রতি যে শ্রদ্ধা এখন বিদ্বান মণ্ডলীতে দেখিতে পাওয়া যায় তাহার মূলও বর্ত্তমান যুগে তাঁহাতেই পাওয়া যায়। বাক্যপদীয় ব্যাকরণের দর্শনগ্রন্থ। যে সময়ে বাবাজী বাক্যপদীয়ের আলোচনা করিতেন সে সময়ে এই গ্রন্থের ভাল সংস্করণ প্রকাশিত হয় নাই। এতদিন পরে যদিও বিভিন্ন প্রকাশক, সম্পাদক ও ব্যাখ্যাকর্ত্তার দ্বারা ঐ গ্রন্থের আলোচনার পথ অনেকটা সুগম হইয়াছে বলা যায়, তথাপি বাবাজীর সময়ে এই সুগমতা মোটেই ছিল না। তাহা সত্ত্বেও আমার দৃঢ় বিশ্বাস—তিনি তাঁহার অনুপম প্রতিভার আলোকে বাক্য-পদীয়ের মুলাভূত ব্যাকরণ আগমের রহস্য যে প্রকার বুঝিয়াছেন এবং বুঝাইয়াছেন তাহার তুলনা কোথাও নাই। পাশ্চাত্য

বিজ্ঞান বা দর্শনকে তিনি অনাদর করিতেন না। তদ্রূপ দ্বৈতবাদ বা অদ্বৈতবাদ কোনটার উপরেই তাঁহার একান্ত পক্ষপাত ছিল না। তিনি সমন্বয় দৃষ্টিতেই সর্ব্বত্র সামঞ্জস্য স্থাপন করিতে চেষ্টা করিতেন। কর্ম্মের সহিত যেমন ভক্তি ও জ্ঞানের বিরোধ নাই, তেমনই জ্ঞানের সহিতও কর্ম্ম ও ভক্তির, এবং ভক্তির সহিত জ্ঞান ও কর্ম্মের কোন বিরোধ নাই, ইহা তিনি বলিতেন। প্রত্যেক মার্গই নিজ নিজ অধিকার অনুসারে প্রবৃত্ত হয়। অনধিকার চর্চ্চা না করিলে একের সহিত অপরের বিরোধ হইতেই পারে না।

তিনি বহু গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। তাঁহার সর্ব্বপ্রথম ও প্রধান গ্রন্থ 'আর্য্যশাস্ত্র প্রদীপ'। এই মহাগ্রন্থ সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইলে পৃথিবীর বিশেষ কল্যাণ হইত তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহার ভূমিকায় যে অংশটুকু প্রকাশিত হইয়াছে তাহাও অতি বিশাল ও অপূর্ব্ব। হার্বাট স্পেন্সার যেরূপ 'সিন্থেটিক ফিলসফির' পরিকল্পনা করিয়াছিলেন তাহার চেয়েও বিরাট কল্পনা ছিল আর্য্যশাস্ত্র প্রদীপকারের। এই কল্পনা কার্য্যে পরিণত করিবার সামর্থ্যও তাঁহার ছিল। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য, ইহা হইয়া উঠে নাই। তাঁহার মানব তত্ত্ব ও বর্ণ বিবেক অপূর্ব্ব গ্রন্থ। তাঁহার পরলোকতত্ত্ব, পরলোক ও আবশ্যকীয় যাবতীয় বিষয় সম্বন্ধে বিপুল গ্রন্থ। ইহা বড় বড় চারি খণ্ডে সম্পূর্ণ হইয়াছিল। ইহার তিন খণ্ড আমি দেখিয়াছি, চতুর্থ খণ্ড আমি দেখি নাই, প্রকাশিত হইয়াছিল কিনা জানি না। তাঁহার ভূত ও শক্তি, আয়ুস্তত্ত্ব, ভক্তিতত্ত্ব, গণিতের দার্শনিক রহস্য প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ক আলোচনাপ্রধান গ্রন্থ আছে। এই সব গ্রন্থ তাঁহার কাশী আসিবার পূর্ব্ব সময়কার রচনা। কাশী আসিবার পর কাশী অবস্থানের শেষদিকে এবং কাশী ত্যাগের পর তাঁহার আরও কতকগুলি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। এই সকল গ্রন্থের মধ্যে কয়েকখানা পূর্ণভাবে এবং কয়েকখানা অপূর্ণভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। এই সকল গ্রন্থের নাম—

(১) শিবরাত্রি ও শিবপূজা।

(২) শিব তথা শিবর্চ্চান তত্ত্ব (হিন্দী)।

(৩) (পূজাতত্ত্ব সম্বলিত) দুর্গা, দুর্গার্চ্চন ও নবরাত্র তত্ত্ব।

(৪) শিব রামকা অভেদতত্ত্ব তথা শ্রীরামাবতার কথা।

ইহার কয়েকটি গ্রন্থের হিন্দী অনুবাদও প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার পর তিনি আরও গ্রন্থ লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে কয়েকখানা পরম শ্রদ্ধেয় স্বর্গত রামদয়াল মজুমদার মহাশয়ের 'উৎসব' নামক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। এইসব গ্রন্থ ও নিবন্ধ ব্যতীত অপ্রকাশিত অনেক লেখাও তাঁহার ছিল।

তাঁহার আর্য্যশাস্ত্র প্রদীপ রচনার সময়ের বিবরণ তাঁহার নিজের মুখেই শুনিয়াছি। তখন ঐ গ্রন্থ রচনা করা ও উহা মুদ্রিত করিয়া প্রকাশিত করা ইহাই তাঁহার ভগবান-নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম ছিল। বস্তুতঃ ভগবৎ প্রেরণা ভিন্ন ঐ জাতীয় গ্রন্থ কেহ রচনা করিতে পারে না। ক্ষুধা তৃষ্ণা বিরহিতভাবে এক আসনে বসিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা তিনি লিখিয়া যাইতেন এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রুফ সংশোধনও করিতেন। তাঁহাকে সাহায্য করিবার লোক কেহই ছিল না। শুনিয়াছি, তিনি কোন কোন দিন ১৭।১৮ ঘণ্টা পর্য্যন্ত আসন ত্যাগ করিয়া উঠেন নাই। এই গ্রন্থ রচনার সময় যখন যে গ্রন্থ আলোচনার জন্য আবশ্যক হইয়াছে তখনই তাহা তিনি প্রাপ্ত হইয়াছেন। কোন্ গ্রন্থ আবশ্যক তাহা অনেক সময় ভিতর হইতে তিনি জানিতে পারিতেন। শুধু তাহাই নহে, অপূর্ব্ব যোগাযোগের ফলে ঐসব গ্রন্থ তাঁহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইত। যে সময়ে যে বিষয়ক গ্রন্থ আবশ্যক হইত সেই সময়েই সেই বিষয়ের বিশদ আলোচনা সম্বলিত গ্রন্থ কোন না কোন সূত্র ধরিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইত। এই সম্বন্ধে বহু বৃত্তান্ত তাঁহার নিকট হইতে শুনিয়াছি—প্রত্যেকটি বৃত্তান্তই অতি অদ্ভুত এবং অলৌকিক।

আলোচ্য বিষয়ে যখন কোন দুর্ভেদ্য সংশয় উপস্থিত হইত তখনই তিনি উপর হইতে উহার সমাধানের উপায় জানিতে পারিতেন।

তাঁহার মুখে শুনিয়াছি তিনি বহুশাস্ত্রের জ্ঞান এইরূপ অলৌকিক ভাবেই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

প্রসিদ্ধি আছে—একবার তিনি প্রথম বয়সে পাণিনির মহাভাষ্য (পতঞ্জলিকৃত) অধ্যয়ন করিবার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছিলেন। ঐ সময়ে বঙ্গদেশে পাণিনি ব্যাকরণের প্রচার খুব অধিক ছিল না। ঐ যুগে একমাত্র তারানাথ তর্কবাচস্পতিকে বাদ দিলে বাঙ্গালী পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে পাণিনি ব্যাকরণের মর্ম্মজ্ঞপণ্ডিত খুব কমই ছিলেন। কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে গোবিন্দ শাস্ত্রী ভরদ্বাজ নামে একজন দক্ষিণী পণ্ডিত তখন পাণিনি ব্যাকরণের অধ্যাপনা করিতেন। ইনি কাশীর লোক এবং ইঁহার ভ্রাতা ভারত বিখ্যাত সুপ্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ, মহামহোপাধ্যায় দামোদর শাস্ত্রী ভরদ্বাজ কাশী গভর্ণমেণ্ট কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। বাবাজী প্রকৃত বিদ্যার্থী ছিলেন—এই বিদ্যা প্রাপ্তির জন্যই তিনি পূর্ব্বোক্ত শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট উপস্থিত হইয়া এবং তাঁহাকে যথাবিধি প্রণিপাত করিয়া তাঁহার আদেশ প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

শাস্ত্রী মহাশয় তখন বিদ্যার্থীগণে পরিবৃত হইয়া শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিতেছিলেন। এই সকল বিদ্যাথীর মধ্যে প্রায় সকলেই পরীক্ষার্থী এবং বিদ্যালয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। বাহিরের ছাত্রকে পড়াইবার সময় তাঁহার নাই, এই হেতু দেখাইয়া শাস্ত্রী মহাশয় বাবাজীর অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেন।

বাবাজী পুনঃপুনঃ চরণ ধরিয়া প্রার্থনা করিতে থাকিলে শাস্ত্রী মহাশয় বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করেন এবং সম্ভবতঃ কিছু কটুবচনও প্রয়োগ করেন। পণ্ডিত মহাশয়ের এই প্রকার অশোভন ব্যবহারে বাবাজী অত্যন্ত মর্ম্মাহত হন। তাঁহার কোমল যুবক হৃদয়ে অত্যন্ত আঘাত লাগে। তিনি ভাবিলেন, তিনি ত কোন লৌকিক স্বার্থের প্রত্যাশী ছিলেন না, শুধু জ্ঞানের আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তির জন্যই জ্ঞানীর নিকট প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার সে প্রার্থনা

হৃদয়ের ঐকান্তিক প্রার্থনা হইলেও স্বীকৃত হয় নাই। তিনি অভিমানে ও ক্ষোভে জর্জ্জরিত হইয়া ঐ স্থান ত্যাগ করিয়া বাড়ী আসেন এবং আর কোনদিন জ্ঞানের জন্য বা অন্য কোন প্রকার অভাবের জন্য মনুষ্যের দ্বারে ভিক্ষা করিতে যাইবেন না, এইরূপ দৃঢ় সঙ্কল্প অবলম্বন করেন। ঐদিন তিনি মনোবেদনায় এতই অভিভূত হইয়াছিলেন যে অহোরাত্রের মধ্যে অন্নজল কিছুই গ্রহণ করিতে পারেন নাই।

শুনিয়াছি, ঐ রাত্রেই তিনি মহানিশার পর নিজের সাধনগৃহে একজন মহাপুরুষের দর্শনলাভ করেন। আকৃতি দেখিয়াই বুঝিতে পারিলেন, ইনি কোন ঋষি বা সিদ্ধ পুরুষ হইবেন। দিব্য জ্যোতির্ম্ময় দেহ, শান্ত ও প্রসন্ন মুখমণ্ডল, সমগ্র মূর্ত্তিটিতে যেন গভীর প্রভা ও কারুণ্য মাখান ছিল। গৃহদ্বার ভিতর হইতে অর্গলবদ্ধ ছিল—মহাপুরুষ এই গভীর নিশীথে অন্ধকার গৃহে প্রবিষ্ট হইবার সঙ্গে সঙ্গে ঘরটি যেন আলোকিত হইয়া উঠিল এবং ক্ষুব্ধহৃদয় যুবকের দৃষ্টি তাঁহার উপর পতিত হইল।

মহাপুরুষ জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস, এত ক্ষুব্ধ হইয়াছ কেন? জান না কি শরীরকে কষ্ট দেওয়া পাপ। তুমি সমস্ত দিন অন্নজল গ্রহণ কর নাই কেন? কোন বিশিষ্ট ব্যক্তি তোমার জ্ঞান পিপাসা নিবৃত্ত করিতে সম্মত হয় নাই, তাই কি তোমার এই অভিমান? তুমি কি জান না, সুকৃতিমান্ জিজ্ঞাসু ভক্ত একমাত্র ভগবৎ সান্নিধ্য হইতেই তাহার সকল প্রকার জ্ঞানের অভাব মোচন করিতে পারে? আজ আমি তোমাকে ব্যাকরণ ভাষ্যের রহস্য শিক্ষা দিব। আমি গ্রন্থ রচনা করিয়াছি, আমি কি শিক্ষা দিতে জানি না? তুমি শান্ত হও, স্থির ভাবে উপবেশন ক'র।"

বাবাজী অপরিণত বয়স্ক যুবক হইলেও সহজেই বুঝিতে পারিলেন যে, এই আবির্ভূত পুরুষ অন্য কেহ নহেন, স্বয়ং ভগবান পতঞ্জলি দেব। ইহার পর তিনি উঠিয়া বসিলেন। তখন মহাপুরুষ ব্যাকরণ আগমের জটিল রহস্য সকল তাঁহাকে বুঝাইতে লাগিলেন। বলিতে কি, বিশাল

ভাষ্যের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত প্রায় সমস্তটাই তিনি সংক্ষিপ্তভাবে তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলেন।

শ্রোতা তাঁহার জ্ঞানপূর্ণ উপদেশের সঙ্গে ঈপ্সিত জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া ধন্য হইল, তাঁহার সকল সংশয় ছিন্ন হইল ও জিজ্ঞাসা নিবৃত্ত হইল। যখন মহাপুরুষ তাঁহার গৃহ হইতে অন্তর্দ্ধান করিলেন তখন তিনি পূর্ব্ব ভাবে ব্যুত্থিত হইলেন এবং কি ঘটনা ঘটিয়া গেল তাহা বুঝিতে পারিলেন। দেখিলেন যে, মহাপুরুষের আবির্ভাব ও তিরোভাবের মধ্যে খুব বেশী সময়ের ব্যবধান ছিল না, অথচ এই অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি সমগ্র মহাভাষ্য তাঁহাকে ব্যাখ্যা করিয়া বিশদভাবে বুঝাইয়া দিয়াছেন।

আমরা সাধারণতঃ কালের যে মানে অবস্থিত থাকি, ইহা তাহা অপেক্ষা সূক্ষ্মতর মান ইহা তিনি বুঝিতে পারিলেন। শুধু তাহাই নহে, স্থূল দেহাভিমানী অহং কোন জ্ঞানকে ধারণ করিতে বেগ ও বাধা প্রাপ্ত হয়, কিন্তু সূক্ষ্মাভিমানী অহং তাহা অতি সহজেই গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়। তিনি বুঝিলেন, ইহা অসম্ভব কিছুই নহে। তিনি তাঁহার উপলব্ধ জ্ঞান পরীক্ষা করিবার জন্য ভাষ্য গ্রন্থ খুলিয়া অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে মহাপুরুষের তত্ত্ব ব্যাখ্যাগুলি যেন "প্রাক্তন জন্মবিদ্যা"-রূপে, পরিস্ফুট পূর্ব্বস্মৃতিরূপে তাঁহার হৃদয়ে জাগিয়া উঠিতে লাগিল। আমি বাবাজীর মুখ হইতে ভগবান্ পতঞ্জলির ব্যাখ্যার কোন কোন অংশ শ্রবণ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলাম। "স্থানে অন্তরতম্," এবং "স্ত্রিয়াম্" প্রভৃতি সূত্রের আর্ষ ব্যাখ্যা এখনও আমার স্মৃতিফলকে যথাশ্রুতভাবে অঙ্কিত রহিয়াছে।

এইরূপ কোন এক বৎসর শিবরাত্রির মহারাত্রিতে সমগ্র ন্যায়-দর্শন তিনি মহর্ষি গৌতমের নিকট প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা সঙ্গত মনে হয় না। এই সকল বিষয় সাধারণ লোকের বুদ্ধির অগম্য। যিনি ভাগ্যবান্ তিনি ইহা বুঝিতে পারিবেন, সকলে ইহার মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিবে বলিয়া মনে হয় না।

বাবাজীর পূর্ব্ব নাম ছিল শশিভূষণ সান্যাল একথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সেইজন্য অনেকে তাঁহাকে 'সান্যাল মহাশয়' বলিয়া উল্লেখ করিতেন। পরমহংস রামকৃষ্ণ দেব তাঁহাকে শশী বলিয়াই ডাকিতেন এবং ঠাকুরের পুরাতন ভক্তগণও ঐ নামেই তাঁহাকে অভিহিত করিতেন। তাঁহার গুরু ছিলেন মহাসিদ্ধ যোগীরাজ শ্রীশ্রীশিবরামানন্দ পরমহংস। বাবাজী গুরুর আশ্রয় লাভ করার অল্পদিন পরেই গুরুদেবের দেহাবসান হয়। চিদ্‌ঘনানন্দ স্বামী নামক তাঁহার এক জ্যেষ্ঠ গুরুভ্রাতার নিকট তিনি সাধন রহস্য অবগত হন। শ্রীগুরুচরণ আশ্রয় করিবার পর হইতেই তিনি পূর্ব্ব নাম ত্যাগ করিয়া নিজেকে শিবরামকিঙ্কররূপে লোকসান্নিধ্যে প্রখ্যাপিত করেন। কর্ম্ম, ভক্তি ও জ্ঞান এই তিন যোগে তাঁহার সমান রুচি ও অধিকার ছিল বলিয়া ভক্তগণ তাঁহাকে যোগত্রয়ানন্দ নামে নির্দ্দেশ করিতে আরম্ভ করেন। বস্তুতঃ কোন নামকেই তিনি সম্পূর্ণ আদরের সহিত গ্রহণ করিতে পারেন নাই। তাঁহার প্রাচীন গ্রন্থাদিতে তাঁহার কোন নামেরই উল্লেখ নাই। পরবর্ত্তী গ্রন্থাদিতে শিবরামকিঙ্কর নাম দেখা যায় বটে, কিন্তু ইহা ভক্ত ও প্রকাশকগণের কার্য্য বলিয়াই মনে হয়।

বাবাজী গৃহী ছিলেন কিম্বা ত্যাগী ছিলেন, এই সম্বন্ধে আমার শুধু ইহাই বক্তব্য যে, তিনি গৃহস্থ হইলেও পরম ত্যাগী ছিলেন। "নিবৃত্তরাগস্য গৃহং তপোবনং"—এই শাস্ত্র বাক্য তাঁহার ন্যায় রাগদ্বেষহীন, পূর্ণ বৈরাগ্যসম্পন্ন কর্ত্তব্যনিষ্ঠ গৃহস্থ সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। তিনি বিবাহ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার পুত্রাদিও ছিল। থাকিতেনও তিনি গৃহেই। কিন্তু তাঁহার ব্যবহারটি ছিল ভিতরে এবং বাহিরে নির্লিপ্ত সন্ন্যাসীর মতন। আমি তাঁহার পূর্ব্বাবস্থা দেখি নাই এবং সে সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞানমূলক কিছুই বলিতে পারিব না। তবে আমি যখন তাঁহাকে দেখিয়াছি তখন হইতে তাঁহাকে বরাবর স্থিতপ্রজ্ঞ অথবা জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ বলিয়াই শ্রদ্ধা করিয়াছি।

তাঁহার পূর্ব্ব জীবনে দুশ্চর তপস্যা, ভগবৎ-শরণাগতি, পূর্ণ আত্ম-

সংযম ও শাস্ত্রে নিষ্ঠার ভাব উজ্জ্বলভাবে প্রস্ফুটিত হইয়াছিল। তাঁহারই মুখে ঐ সময়কার বহু ঘটনা শুনিয়াছিলাম। তাঁহার মধ্যে কিছু কিছু মনে আছে, অনেক ভুলিয়া গিয়াছি। প্রসঙ্গক্রমে এইখানে একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করিতেছি। যে সময়কার কথা বলিতেছি তখন তিনি বরাহনগরে। ঐ সময় তিনি অযাচকভাবে গৃহস্থ আশ্রমে অবস্থান করিতেছিলেন। চিকিৎসা ব্যবসায় করিতে পারিতেন, কিন্তু করেন নাই। সর্ব্বপ্রকার চিকিৎসার তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক জ্ঞান তাঁহার ছিল। চিকিৎসা করিলে তিনি সহজেই অর্থ উপার্জ্জন করিতে পরিতেন। বস্তুতঃ চিকিৎসা তিনি করিতেন না এমনও নহে, কারণ নানা দেশ হইতে আগত বহু লোকই তাঁহার দ্বারা চিকিৎসিত হইয়াছে। কিন্তু কোথাও তিনি অর্থ গ্রহণ করেন নাই। শুনিয়াছি, একদিন অর্থসঙ্কটের সময় তাঁহার মনে চিকিৎসা বৃত্তি গ্রহণ করিবেন কিনা এইরূপ একটি সংশয়ের উদয় হয়। ঐ সংশয়ে অতি তীব্রভাবে তাঁহার চিত্ত দুলিতে থাকে। সমাধানের কোন উপায় না পাইয়া তিনি ব্যাকুল হইয়া পড়েন। এমন সময়ে হঠাৎ হাওয়াতে উড়িয়া একখানা ছিন্ন পুস্তকের একটি খণ্ডপত্র তাঁহার নিকট আসিয়া পড়ে। ঐ পত্র একখানা শাস্ত্রীয় গ্রন্থের (বৈদিক গ্রন্থের) একটি ছিন্ন পত্র ছিল। উহার দিকে দৃষ্টি পতিত হওয়ার সঙ্গেই তিনি দেখিতে পাইলেন, লেখা রহিয়াছে—ব্রাহ্মণের পক্ষে ভেষজের আশ্রয় গ্রহণ উচিত নহে। তিনি বুঝিলেন, তাঁহার পক্ষে চিকিৎসা বৃত্তিকে জীবিকা রূপে গ্রহণ করা চলিবে না। তখন হইতেই তিনি ঐ সঙ্কল্প ত্যাগ করিলেন। চাকুরী অবলম্বন করার ত কোন প্রশ্নই ছিল না। তাঁহার পরিবারও নিতান্ত অল্প ছিল না, কারণ তাঁহার নিজের কুটুম্বাদি ব্যতীত ছাত্র এবং চিকিৎসার্থীরূপেও অনেকে তাঁহার নিকট আসিয়া থাকিত।

সকলের ভরণপোষণ করাকে তিনি নিজের কর্ত্তব্য মনে করিতেন। কাহারও নিকট হইতে এক কপর্দ্দকও তিনি চাহিতেন না—অযাচিত

ভাবে সাত্ত্বিক অন্তঃকরণে যে যাহা তাঁহাকে দিত তাহার দ্বারাই তাঁহার আশ্রিতগণের ভরণপোষণের ব্যবস্থা হইত। এই ভাবে কোন প্রকারে দিন চলিয়া যাইত। এক সময় এমন হইয়াছিল যে, সেদিন কোথাও হইতে কিছুই জোটে নাই। তখন তাঁহার আদেশে সকলে বিল্বপত্রের রস গ্রহণ করিয়া আনন্দের সহিত সেই দিন অতিবাহিত করে। পর পর দুই দিন এই প্রকারে কাটিয়া যায়। তারপর তৃতীয় দিনও মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত কোথাও হইতে কিছু প্রাপ্তির নিদর্শন দৃষ্ট হয় নাই। কিন্তু বাবাজী শান্ত ও অক্ষুব্ধভাবে, অবিচলিত অন্তঃকরণে, এই কয়দিন নিজের দৈনন্দিন কার্য্য করিয়া যাইতেছিলেন। রোগীর রোগের চিকিৎসা ও জিজ্ঞাসুর সংশয় ভঞ্জন, ইহাই ছিল তাঁহার নিত্য কার্য। অপরাহ্নকালে প্রয়োজন অনুসারে শাস্ত্রগ্রন্থের অধ্যাপনা করিতেন। তৃতীয়দিন মধ্যাহ্নোত্তরকালে তিনি ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য সম্বন্ধে সম্মিলিত শ্রোতৃমণ্ডলীর সমক্ষে আলোচনা করিতেছিলেন। এই আলোচনাতে অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। শুনিয়াছি ঐ সময় স্বামী অভেদানন্দও উপস্থিত ছিলেন। অবশ্য তখন ঐ নামে তিনি পরিচিত ছিলেন না—তখন সকলে তাঁহাকে কালী মহারাজ বলিয়া ডাকিত। বাবাজীর ভক্তগণ কেহই জানিতেন না যে, তাঁহার ঘরে তিনদিন যাবৎ কি প্রকার অবস্থা চলিয়াছে। কারণ বাবাজী নিজের অভাবের কথা কখনও কাহাকেও ঘুণাক্ষরেও জানাইতেন না। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, যিনি জানিবার তিনি সবই জানেন, অন্যকে জানাইবার প্রয়োজন কি? দিবার মালিকও তিনি, দিতে হইলে কোনও না কোন সূত্র অবলম্বন করিয়া তিনিই দিবেন। তাহার জন্য বৃথা অভিযোগ করিবার কি আছে?

এইভাবে ঐদিন অপরাহ্ন কালে যখন দার্শনিক আলোচনা ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছিল এমন সময় ডাক বিভাগের একজন পত্র বাহক (পিয়ন) একখানা রেজেষ্টারী পত্র লইয়া ঐস্থানে উপস্থিত হয়। পত্রখানা ইন্‌সিওর করা ছিল এবং সাক্ষাৎ বাবাজীর নামেই প্রেরিত

হইয়াছিল। বাবাজী যথাবিধি নাম স্বাক্ষর করিয়া পত্রখানা গ্রহণ করেন এবং উহা খুলিয়া সমস্ত লিপিখানা আদ্যোপান্ত মনে মনে পাঠ করেন। ইহার পর পত্রখানা যথাস্থানে রক্ষা করিয়া কিছুক্ষণ উর্দ্ধদৃষ্টি হইয়া অবস্থান করেন। তখন দেখা যাইতেছিল, তাঁহার নয়নদ্বয় অশ্রুসিক্ত, শুধু অশ্রুসিক্ত নহে নয়ন হইতে অশ্রু অবিরলধারে বর্ষিত হইতেছিল। প্রায় ১৫ মিনিট পর্য্যন্ত এইরূপ হইতে থাকে। ভক্ত, জিজ্ঞাসু ও শ্রোতৃবর্গ তখন নিস্তব্ধ ভাবে উপবিষ্ট হইয়া এই দৃশ্য দেখিতেছিল। ইহা একটি অভুতপূর্ব্ব দৃশ্য—এইরূপ দৃশ্য তাহারা আর কখনও দেখে নাই।

কালী মহারাজ বলিলেন, "বাবা, ব্যাপারটি কি ? পত্রে কি কোন শোক সংবাদ আসিয়াছে ? আপনার চক্ষুতে অশ্রুর উদ্গম তো আমরা কখনও দেখি নাই! যিনি হাসিতে হাসিতে নিজের প্রিয় শিশুকে স্বহস্তে গ্রহণ করিয়া শ্মশান ভূমিতে নিয়া চিতার উপর শোয়াইতে পারেন, তিনি যে শোকের দ্বারা অভিভূত হইবেন ইহা ত মনে হয় না। কিন্তু বুঝিতে পারিতেছি না, আপনার চক্ষুতে জল কেন এবং আপনি পত্রটি পাঠ করিয়া স্তব্ধ হইয়া গেলেন কেন ?"

এই কথা শুনিয়া বাবাজী বলিলেন, "দেখ, ইহা শোকের জন্য অশ্রু নহে। শোক আমাকে অভিভূত করিতে পারে না। আমি ভগবানের করুণাতে অভিভূত হইয়াছি। তাঁহার করুণার কথা চিন্তা করিয়া আমি কঠোর সংযম সত্ত্বেও অশ্রু সম্বরণ করিতে পারি নাই।" এই বলিয়া তিনি পত্রখানা সমবেত ভক্তদের নিকট ফেলিয়া দিলেন এবং বলিলেন, "তোমরা পড়িয়া দেখ।" তখন সকলের সম্মুখেই পত্রখানা পড়া হইল। তাহা হইতে যাহা বোঝা গেল তাহা এই—পত্রখানা ৺কাশীধাম হইতে আসিয়াছে এবং লিখিয়াছেন স্থানীয় চৌখাম্বা মহল্লার একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি। তাঁহার নাম মিত্র। তিনি লিখিয়াছেন যে, তিনি পূর্ব্ব রাত্রে স্বপ্নে দেখিয়াছেন।—ইষ্ট দেবতা ৺কাশীনাথ বিশ্বেশ্বর প্রকট হইয়া ক্ষুধার্ত্তভাবে তাঁহার নিকট হইতে অন্ন ভিক্ষা

করিতেছেন। তাঁহার মনে হইল, বিশ্বনাথ যেন বলিতেছেন "আমি উপবাসী আছি—অন্নজল কিছুই গ্রহণ করি নাই। আমার একজন পরম ভক্ত উপবাসী রহিয়াছে, তাই আমিও উপবাসী। তুমি যদি আমাকে লেশমাত্র ভক্তি ক'র, তাহা হইলে অবিলম্বে আমার অন্নজলের সংস্থান করিয়া দাও অর্থাৎ এই ভক্তের অন্ন গ্রহণের ব্যবস্থা ক'র। ইহা অবিলম্বে করা চাই, বিলম্ব যেন না হয়। এই বলিয়া তিনি যেন মিত্র মহাশয়কে তাঁহার ভক্তের নাম এবং ঠিকানা বলিয়া দিলেন এবং জ্যোতির্ম্ময় অক্ষরে উহা লিখিতভাবে দেখাইয়াও দিলেন। মিত্র মহাশয় এই স্বপ্নটি দেখিবার পরেই জাগিয়া উঠিয়া স্মৃতি অনুসারে নাম ও ঠিকানা লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। তদনুসারে ইনসিওর করিয়া তিনি ৫০০৲ পাঁচশত টাকার নোট বাবাজীর নামে পাঠাইয়া দিয়াছেন। তিনি আরও লিখিয়াছেন, যদিও তিনি বাবাজীকে চেনেন না এবং তাঁহার ঠিকানাও জানেন না তথাপি তাঁহার বিশ্বাস তাঁহার স্বপ্ন মিথ্যা নহে, এবং তাঁহার প্রেরিত টাকা যথাস্থানে পৌঁছাইবে।"

চিঠির কথা বলিতে বলিতে বাবাজী বাড়ীর ইতিহাস খুলিয়া বলিলেন। তিনদিন পর্য্যন্ত সকলেই যে অনাহারে আছে, তাহাও তিনি তখন বলিতে সঙ্কোচ করিলেন না। তিনি জানিতেন যে, তিনি কিছুমাত্র সূচনা দিলে তাঁহার বহু ভক্ত পরম আনন্দের সহিত তাঁহার অভাব দূর করিবার ব্যবস্থা করিতেন। কিন্তু তিনি তাহা করেন নাই। তাঁহার একমাত্র লক্ষ্য ছিল ভগবৎ চরণে, তাই তিনি জগতের সম্মুখে নিজের অভাব ঘোষণা করিতে সম্মত হন নাই। তিনি জানিতেন, যাঁহার দিকে লক্ষ্য করিয়া রহিয়াছেন তিনি সমস্তই প্রত্যক্ষ দেখিতে পান এবং ইচ্ছা হইলে মুহূর্ত্তের মধ্যে সব ব্যবস্থাই করিতে পারেন। এই বলিয়া তিনি বলিলেন যে, শ্রীভগবানের অপার করুণার কথা স্মরণ করিয়াই তাঁহার হৃদয় বিগলিত হইয়াছে এবং তাঁহার নেত্র অশ্রুতে আপ্লুত হইয়াছে। ইহা শুনিয়া সকলে আনন্দে

বিহ্বলপ্রায় হইয়া ভগবানের নাম কীর্ত্তনে মগ্ন হইলেন। সেদিনকার জন্য পড়াশুনা ঐখানেই বন্ধ রইল।

বাবা রাজঘাটে থাকিবার সময়ে একটি ঘটনা মনে পড়িতেছে। ঐ সময়ে পূর্ব্বোক্ত তর্করত্ন মহাশয়ের পুত্র বৃন্দাবন অত্যন্ত অসুস্থ ছিল। সে স্বভাবতঃ চির-রোগী থাকিলেও কিছুদিন হইতে নানা প্রকার স্নায়বিক উপসর্গে কষ্ট পাইতেছিল। চিত্রকূট, কটক, ভুবনেশ্বর, প্রভৃতি বহু স্বাস্থ্যকর স্থানে অবস্থান করিয়াও সে আশানুরূপ স্বাস্থ্যের উন্নতিলাভ করিতে পারে নাই। অবশেষে সে অত্যন্ত অবসন্ন হইয়া পড়ে এবং জীবন সম্বন্ধে একপ্রকার হতাশ হয়।

পিতা মাতা তাহার অবস্থা দেখিয়া অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়েন। কিছুদিন পর্য্যন্ত বৃন্দাবনের অবস্থা এরূপ সঙ্কটাপন্ন হইয়াছিল যে, তাঁহার পূজনীয় পিতৃদেব অনন্যগতি হইয়া বাবার শরণ গ্রহণ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। আমি তখন কুইন্স কলেজের বোর্ডিং হাউসে থাকিতাম। একদিন প্রাতঃকালে দেখিতে পাইলাম, তর্করত্ন মহাশয়ের পুরাতন ভৃত্য কালী সিংহ তাঁহার একখানা চিঠি লইয়া আমার নিকট আসিয়া উপস্থিত। তর্করত্ন মহাশয় আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন এবং আমাকে তাঁহার নিজের পুত্রের ন্যায়ই আত্মদৃষ্টিতে দেখিতেন, আমিও বৃন্দাবনকে ছোট ভাইয়ের মত মনে করিতাম। তর্করত্ন মহাশয় লিখিয়াছিলেন যে, পূর্ব্ব রাত্রে বৃন্দাবনের শারীরিক অবস্থা অত্যন্ত সঙ্কটাপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। যদিও ঐ অবস্থাটি কাটিয়া গিয়াছে তথাপি তখনও তাহার স্থিতি আশাপ্রদ ছিল না। তিনি আমাকে ঐ পত্র পাঠমাত্র তাঁহার সহিত দেখা করিতে লিখিয়াছিলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, আমি যেন তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া একবার রাজঘাটে বাবার নিকট উপস্থিত হই, যেন তিনি বাবার শ্রীচরণে বৃন্দাবনের কল্যাণ প্রার্থনা করিতে পারেন।

বোর্ডিং হাউস হইতে অধ্যক্ষ মহাশয়ের অনুমতি লইয়া কালী সিংহের সঙ্গে তৎক্ষণাৎ অগস্ত্য কুণ্ডে রওনা হইলাম এবং অল্প ক্ষণের

মধ্যেই তর্করত্ন মহাশয়ের নিকট উপস্থিত হইলাম। সেখানে যে দৃশ্য দেখিলাম তাহাতে হৃদয় বিগলিত না হইয়া পারে না। দেখিলাম, বৃন্দাবন অসারের মত পড়িয়া রহিয়াছে এবং তাহার স্নেহশীলা মাতা শিয়রে বসিয়া রোদন করিতেছেন। অদূরে একটি পৃথক আসনে তর্করত্ন মহাশয় উপবেশন করিয়া কি যেন কবিতা লিখিতেছিলেন। আমি যাইয়া প্রণাম করিতেই তর্করত্ন মহাশয় আমাকে বলিলেন, "সংস্কৃত ভাষায় নিবদ্ধ প্রার্থনারূপ এই কয়েকটি শ্লোক আমি বাবাজীর নিকট পাঠ করিব এবং ইহা তাঁহার চরণে অর্পণ করিব এইরূপ মনে করিয়াছি।" এই বলিয়া তিনি শ্লোকগুলি পড়িয়া আমাকে শুনাইলেন। দেখিলাম, শ্লোকগুলি অতি সুন্দর হইয়াছে এবং বাবার ন্যায় সুপণ্ডিত এবং সিদ্ধযোগী পুরুষের নিকট ইহা অর্পণ করিবার যোগ্য। যাহা হউক, পরেই তিনি আমাকে রাজঘাট রওনা হওয়ার জন্য প্রস্তুত হইতে বলিলেন।

তখনকার সময় অতি মূল্যবান, বিলম্ব করা উচিত মনে হইল না। আমি কিন্তু তাঁহার প্রস্তাবে কিছু ইতস্ততঃ করিতেছিলাম, কারণ আমি জানিতাম প্রাতঃকালে বাবার সঙ্গে দেখা করা সম্ভব নয়, অপরাহ্ন কালেই দেখা করার প্রশস্ত সময়। প্রাতঃকালে সেখানে গেলেও হয়তো নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আসিতে হইবে, হয়তো তাঁহার নিকট সংবাদ পেঁৗছানও সম্ভব হইবে না। সাধারণতঃ ঐ সময়ে তিনি সাধন গৃহে একান্তে অবস্থান করেন, সাধারণ কোন লোকেরই, এমন কি তাঁহার অন্তরঙ্গ জনেরও, ঐ সময়ে তাঁহার নিকট যাওয়া সহজ নহে। কিন্তু আমার প্রতিবাদ সত্ত্বেও তর্করত্ন মহাশয় তখনই যাইতে উদ্যত হইলেন, কারণ অপরাহ্ন পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা করার সাহস বা ধৈর্য্য তাঁহার ছিল না। অগত্যা একখানা এক্কাতে আমরা উভয়ে রাজঘাট যাত্রা করিলাম।

যথাসময়ে নয়া মহাদেবস্থিত বাবাজীর আবাস স্থানে উপনীত হইলাম। যাইবামাত্রই যাহা দেখিলাম তাহাতে আমার মনে যুগপৎ

বিস্ময় ও আনন্দ উদ্ভূত হইল। দেখিলাম, বাবাজীর একনিষ্ঠ প্রিয় সেবক সতীশ গৃহের দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে এবং আমাদিগকে দেখিয়া অত্যন্ত আদরের সহিত আমাদিগকে বাবাজীর সান্নিধ্যে নিয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে। ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য্য মনে হইল। সে বলিল, বাবা তাঁহাকে বলিয়াছেন, "গোপীনাথ ও তর্করত্ন মহাশয়ের এখনই এখানে আসিবার কথা। বৃন্দাবনের শরীর অত্যন্ত অসুস্থ। তাহারা যেন আসিয়া ফিরিয়া না যায়। তুমি নীচে যাইয়া দ্বারদেশে অপেক্ষা ক'র এবং তাঁহারা আসলে তৎক্ষণাৎ তাঁহাদিগকে সঙ্গে করিয়া আমার নিকট লইয়া আসিবে। আমি তাহাদের জন্য একেলা প্রতীক্ষা করিব। এখন সাধারণতঃ দেখা করার সময় না হইলেও আমি অবশ্যই দেখা করিব, কেহ যেন তাহাদিগকে বাধা না দেয়।" সতীশের এই কথা শুনিয়া তর্করত্ন মহাশয়ের চক্ষুতে অশ্রুর উদ্গম হইয়াছিল। আমরা নীরবে সতীশের সঙ্গে দোতলায় উঠিয়া বাবাজীর প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলাম।

দেখিলাম, বাবা পূজাগৃহ হইতে বাহির হইয়া আসিয়া নিজের আসনে শান্তভাবে উপবিষ্ট রহিয়াছেন এবং উৎকণ্ঠিতভাবে আমাদিগের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন। সম্মুখে একখানা গালিচার আসন তর্করত্ন মহাশয়ের জন্য বিছানো ছিল। তকরত্ন মহাশয় প্রণতিপূর্ব্বক স্বস্থানে উপবিষ্ট হইলেন এবং তাঁহার প্রশস্তি-শ্লোক পাঠ করিয়া শুনাইতে আরম্ভ করিলেন।

বাবা প্রথমেই বৃন্দাবনের কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিয়া পরে বলিলেন, "আমি গত রাত্রেই আসনে বসিয়া বৃন্দাবনের শরীরের অবস্থা দেখিতে পাইলাম। ইহাও দেখিতে পাইলাম যে, আপনি অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়াছেন এবং প্রাতঃকালে গোপীনাথকে সঙ্গে লইয়া আমার নিকট আসিতেছেন। ইহার পরই আমি ক্রিয়া স্থান হইতে উঠিয়া সতীশকে বলিয়া রাখিয়াছিলাম, আপনারা আসিলে যেন বিনা বাধায় আমার নিকট উপস্থিত হইতে পারেন। সাধারণতঃ ইহা আমার নিকট

আসিবার সময় না হইলেও আমি নিশ্চয়ই আপনার সহিত দেখা করিব, ইহা তাহাকে বলিয়া দিয়াছিলাম। তাছাড়া আপনার উপবেশনের জন্য আসনের ব্যবস্থাও করাইয়া রাখিয়াছিলাম।" তর্করত্ন মহাশয় এই সব কথা শুনিয়া তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইহা কি যোগশক্তির ব্যাপার?" বাবা উত্তরে বলিলেন, "যোগশক্তি বৈ আর কি? হৃদয়ের সহিত হৃদয়ের যোগ স্থাপিত হইলে এইরূপ স্বভাবতঃই হইয়া থাকে—তখন দূরকেও নিকটে দেখা যায় এবং ভবিষ্যৎকেও বর্ত্তমানরূপে জানা যায়। যাহা হউক, আপনি বৃন্দাবনের জন্য চিন্তা করিবেন না। যখন সে আমার দৃষ্টিতে পড়িয়াছে তখন সে অবশ্যই ভাল হইয়া যাইবে। আপনারা বাড়ী ফিরিয়া গেলে দেখিতে পাইবেন তাহার অবস্থার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে।" ইহার পর তর্করত্ন মহাশয়ের আর কিছু বলিবার থাকিল না। তিনি দুঃখের কথা বিস্তারিতভাবে বলিবারও অবসর পাইলেন না এবং দুঃখ নিবৃত্তির প্রার্থনাও স্পষ্টভাবে জানাইতে পারিলেন না। অথচ তাঁহার উদ্দেশ্য পূর্ণ হইয়া গেল। কারণ যাঁহাকে তিনি দুঃখ জানাইবেন, তিনি নিজে হইতেই দুঃখ জানিয়া নিয়াছেন এবং ঐ দুঃখ অপসারণের প্রার্থনা না করিলেও তিনি নিজে হইতেই দুঃখের উপশমের ব্যবস্থা করিয়াছেন। দৈবানুগ্রহ এই প্রকারই হইয়া থাকে। ইহার পর আমরা অনেকক্ষণ ঐস্থানে ছিলাম এবং নানা বিষয়ে আলোচনা করিতেছিলাম। সে সকল অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া এখানে তাহার বর্ণনা দিতে ইচ্ছা করি না।

বাবা দীক্ষা দিতেন। তাঁহার দীক্ষাপ্রণালী যদিও শাস্ত্রীয় প্রণালী হইতে কোন অংশে পৃথক ছিল না তথাপি ইহা বলিতেই হইবে যে, সাধারণ গুরুকরণের পদ্ধতি হইতে উহা কোন কোন বিষয়ে বৈশিষ্ট্য-সম্পন্ন ছিল। শিষ্যের রুচি এবং প্রবৃত্তি লক্ষ্য করিয়াই তিনি ইষ্ট নিরূপণ করিতেন, কিন্তু তাহার বাহ্য প্রকৃতির অথবা প্রবৃত্তির দিকে তিনি দৃক্‌পাত করিতেন না। তিনি তাহার আভ্যন্তরীণ প্রকৃতি লক্ষ্য

করিয়া তাহার ইষ্ট বিচার ও সাধন মার্গ নির্ণয় করিতেন। এই সম্বন্ধে একটি ঘটনা আমার জানা আছে। একটি ভদ্রলোক তখন কাশীতে থাকিয়া কিছু কিছু ভজন সাধন করিতেন। এই লোকটির বাড়ী ছিল বঙ্গদেশে ২৪ পরগণার অন্তর্গত খড়দহ গ্রামে। এই লোকটি কাশীতে আসিয়া স্থানীয় হরিনাম প্রদায়িনী সভার সহিত সংশ্লিষ্ট হয়। এই সংসর্গে থাকিবার ফলে তাহার হৃদয়ে বৈষ্ণব ভাবের উন্মেষ হয় এবং শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন লীলার প্রতি আকর্ষণ হয়। নামকীর্ত্তন করা, লীলা কীর্ত্তন শ্রবণ করা, শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করা, তাঁহার দৈনন্দিন কার্য্যের অন্তর্গত ছিল। কোন সূত্রে এই লোকটি বাবার সহিত পরিচিত হয়। বাবাকে দর্শনের পর হইতে সে নিয়মিতভাবে তাঁহার সৎসঙ্গ করিতে চেষ্টা করিত এবং মধ্যে মধ্যে তাঁহার উপদেশবাণীও শ্রবণ করিত। সে বাবার ব্যক্তিত্বে এবং সাধন বৈভবে এত মুগ্ধ হইয়াছিল যে, সে কিছুদিন পরে বাবার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া তাঁহারই শ্রীচরণে আত্মসমর্পণ করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প হয়। একদিন সঙ্কোচের সহিত সে তাহার প্রাণের আকাঙ্ক্ষা নিবেদন করে।

বাবা তাহার প্রার্থনা শুনিয়া তাহাকে বলেন, যদি তাহার একান্ত ইচ্ছা হইয়া থাকে তবে একটি শুভদিন দেখিয়া তাহার ব্যবস্থা করা যাইবে। তিনি আরও বলেন, শুদ্ধ সংযতভাবে জীবনযাপন করিলে সুফল লাভ অবশ্যম্ভাবী। লোকটি আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া শুভদিনের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। ইহার পর একদিন কথাপ্রসঙ্গে বাবা তাহাকে বলিলেন, "শক্তিমন্ত্র তোমার ইষ্ট। জগজ্জননী মহাশক্তিকে মাতৃভাবে উপাসনা করিয়াই তোমাকে সাধনক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে হইবে। এখন হইতে তাহার জন্য প্রস্তুত হও—নিজে সন্তান হইয়া জগজ্জননীকে প্রত্যক্ষ অনুভব করিতে অভিলাষ ক'র এবং সমগ্র রমণী মূর্ত্তিতেই সেই পরমা মাতৃশক্তিকে দেখিতে অভ্যাস ক'র।"

মহাপুরুষের বাক্য শুনিয়া ভদ্রলোকটি বাসায় ফিরিয়া আসেন, উহার পর হইতেই তাহার মনে এক বিচিত্র আন্দোলন উপস্থিত হয়।

সে বৈষ্ণব ভাবে ভাবিত ছিল, কিন্তু বাবা তাহাকে শাক্তভাবে দীক্ষা দিবেন বুঝিতে পারিয়া তাহার মনে ঘোর সংশয় উপস্থিত হইল। তাহার বিশ্বাস ছিল—বাবা অন্তর্যামী। কিন্তু তাহার মনে হইল, তাহার অন্তরের ভাব যে শক্তি সাধনার অনুকূল নহে তাহা তো বাবা বুঝিতে পারিলেন না।

এই সময়ের পর হইতেই বাবার প্রতি তাহার শ্রদ্ধা অনেকাংশে শিথিল হইয়া আসিল। সে মনে করিল, যাঁহার অন্তর্দৃষ্টি নাই তাঁহাকে মহাপুরুষ মনে করা চলে না, তাঁহার নিকট দীক্ষা লওয়াও নিষ্ফল। ইহার পর হইতে সে বাবার নিকট আর যাইত না এবং তাঁহার প্রস্তাবিত দীক্ষাও অনির্দ্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত হইয়া গেল। এইভাবে দীর্ঘকাল কাটিয়া যায়। তাহার কাশী অবস্থান সমাপ্ত হইলে সে বাড়ী ফিরিয়া যায়। বাড়ী ফিরিবার পর তাহার জীবন যাত্রার প্রণালী পরিবর্ত্তিত হয়। হরিসভার সংসর্গে তাহার চিত্তে যে ভাবের উচ্ছ্বাস উঠিয়াছিল তাহা তখন শান্ত হইয়া গিয়াছে।

দেশে থাকিতে একবার সে কঠিন রোগ যন্ত্রণায় পীড়িত হয়। ক্রমে ক্রমে রোগ দুঃসাধ্য আকার ধারণ করে এবং সেই সঙ্গে বেদনার মাত্রাও চরমে উঠে। একদিন মহানিশার সময় রুগ্ন শয্যায় শায়িত অবস্থায় সে হঠাৎ দেখিতে পায়—এক জ্যোতির্ম্ময়ী মাতৃমূর্ত্তি তাহার শিয়রে দাঁড়াইয়া আছেন। মূর্ত্তিতে অপার স্নেহ এবং করুণা যেন ফুটিয়া উঠিতেছে। এই দর্শনের পর হইতেই তাহার রোগের উপশম হয় এবং কিছুদিনের মধ্যেই সে আরোগ্য লাভ করে। এই ঘটনার পর তাহার মনে হইতে লাগিল যেন সে ভয়ানক অপরাধ করিয়াছে এবং তাহার দণ্ডরূপেই তাহাকে এই যন্ত্রনা ভোগ করিতে হইয়াছে। বাবাজীর প্রতি অশ্রদ্ধার উদয়ই এই অপরাধ বলিয়া তাহার মনে হইল। সে তখন বুঝিতে পরিল যে, তাহার অন্তঃপ্রকৃতি শাক্ত ভাবের অনুকূল, তাই অতি কঠিন দুঃখের সময় সে নিজের ইষ্টকেই দর্শন করিয়াছে এবং দর্শনের ফলেই তাহার সকল দুঃখের

শান্তি হইয়াছে। মনে হইল, কাশীতে অবস্থান কালে তাহার মনে যে ভাবের উদয় হইত তাহা স্বাভাবিক নহে, তাহা সঙ্গের প্রভাববশতঃ দেখা দিত। তখন তাহার মনে হইল, বাবাজী যাহা বলিয়াছিলেন তাহা ঠিকই। সে নিজের অন্তঃপ্রকৃতির প্রকৃত প্রবণতা বুঝিতে পারে নাই, কিন্তু তিনি বিশুদ্ধ অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে উহা দেখিতে পাইয়াছিলেন। ইহার পর সে পুনর্ব্বার কাশীতে চলিয়া যায় এবং বাবাকে দর্শন করিয়া তাঁহার নিকট নিজের অবিশ্বাসজনিত অপরাধের ক্ষমা প্রার্থনা করে। শুনিয়াছি, পরে ভদ্রলোকটি বাবার নিকট শাক্তমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া সাধন পথে অগ্রসর হইয়াছিল।

বাবা বলিতেন, "বিশ্বাস ব্যতীত কেবল যুক্তি তর্কের দ্বারা সাধকের পক্ষে আধ্যাত্মিক জীবনে অগ্রসর হওয়া সম্ভবপর নহে।" তিনি বলিতেন, "বিশ্বাসের বলে সবই হইতে পারে। যাহা লৌকিক দৃষ্টিতে অসম্ভব বলিয়া মনে হয়, বিশ্বাসের বলে তাহাও সংঘটিত হইতে পারে। কিভাবে কোন্ শক্তির দ্বারা কোন্ কার্য্য সাধিত হয় তাহা মানুষ বুঝিতে পারে না। একটা ঘটনা বলি—বহু দিন পূর্বে একটি ছেলে ম্যাট্রিকুলেশন ক্লাসে পড়িত, কিন্তু সে সংস্কৃত মোটেই জানিত না, এমন কি দেবনাগরী অক্ষর পর্য্যন্ত চিনিত না। আমার প্রতি তাহার অত্যন্ত শ্রদ্ধা ছিল। আমি তাহাকে পড়িতে বলিতাম কিন্তু সংস্কৃত পড়িতে তাহার মোটেই প্রবৃত্তি হইত না। পরীক্ষার পূর্বে তাহাকে বিশেষ করিয়া সংস্কৃত পড়িতে বলিলাম, কিন্তু সে বলিল যে, আমার অনুগ্রহে সে না পড়িলেও পাশ হইবেই। তখন আমি বলিলাম—আচ্ছা, এই পুস্তক খুলিতে প্রথমেই যে পৃষ্ঠা বাহির হইবে তাহাই ভাল করিয়া তৈয়ার করিলে পাশ হইবে। পুস্তক খোলা হইল, কিন্তু সে দেবনাগরী অক্ষর পরিতে পারিত না বলিয়া আমি তাহাকে বাংলা অক্ষরে শ্লোকাদি লিখিয়া দিলাম ও সেই পৃষ্ঠা তাহাকে ভাল করিয়া পড়াইলাম। আশ্চর্য্যের কথা এই যে, পরীক্ষার পত্রে সেই পৃষ্ঠা হইতেই প্রশ্ন আসিয়াছিল এবং সে তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছিল।"

বাবা ঐ প্রকার আর একটি ঘটনার কথা বলিয়াছিলেন। সে ছেলেটি এফ, এ, পড়িত। সে মোটেই পড়ে নাই কিন্তু তাহার বিশ্বাস ছিল যে, বাবার আশীর্ব্বাদে কিছু না পড়িয়াই সে পাশ করিবে—বস্তুতঃ হইয়াছিলও তাহাই।

বাস্তবিক পক্ষে, বিশ্বাস থাকিলে অসম্ভবও সম্ভব হয়, ইহা সত্য। তাঁহার একটি ভক্ত কলিকাতার মিউনিসিপ্যালিটির ইঞ্জিনীয়ার ছিলেন, বেতন ছিল ৫০০৲ শত টাকার উপর। পূর্ব্বে সেই ভদ্রলোক কাশ্মীরে কাজ করিতেন। ভদ্রলোকটির মায়ের হৃদ্‌রোগ ছিল। ঐ সময়ে ঐ রোগের অবস্থাও অত্যন্ত সঙ্কটাপন্ন হইয়াছিল। একদিন তাঁহার মা অত্যন্ত দুঃখ ও আগ্রহের সহিত বাবাকে বলিলেন, "বাবা, আমার তো এই অবস্থা। আমার বড় ইচ্ছা হয়, আমি মৃত্যুর পূর্ব্বে কয়েকটি তীর্থস্থান দর্শন করিব।"

বাবা তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, আমি আপনাকে তীর্থ দর্শন করাইব। কিন্তু আমি যে যে স্থানে যে যে দৃশ্য দেখিতে নির্দ্দেশ করিব, আপনি শুধু তাহাই দেখিবেন, তদতিরিক্ত কিছু দেখিবেন না। আমার কথা মত চলিলে আপনি বিনা আশঙ্কায় সব দেখিতে পাইবেন, নতুবা কষ্ট পাইতে হইবে।" তিনি বাবার আদেশ মানিয়া লইলেন এবং যথাসময়ে যাত্রায় বাহির হইয়া পড়িলেন, কিন্তু তাঁহার আদেশমত চলিবেন এই প্রতিশ্রুতি দিলেও ঠিক ঠিক উহা রক্ষা করিতে পারিলেন না। তাঁহার ধর্ম্মবিশ্বাস অত্যন্ত বলবান ছিল। তাই কোন স্থানে গেলে সেখানকার সকল বস্তুই দেখিবার জন্য তাঁহার আগ্রহ হইত ও সেই স্থানের সব কিছু না দেখিয়া ফিরিতে পারিতেন না। অবশেষে বাবার নির্দ্দেশের বিরুদ্ধে স্ব-ইচ্ছায় যখন গিরনার পাহাড়ে উঠিতেছিলেন সে সময় হঠাৎ তাঁহার হৃদ্‌প্রদেশে ভয়ানক স্পন্দন আরম্ভ হইল। ক্রমে এমন অবস্থার উদয় হইল যে, আর উঠিতেও পারেন না, আবার নামিয়া যাইবেন সে ক্ষমতাও নাই। তাঁহার মনে হইতে লাগিল মৃত্যু অনিবার্য্য। তখন

আকুল প্রাণে অত্যন্ত উৎকণ্ঠিতভাবে বাবাকে মনে মনে স্মরণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার আকাঙ্ক্ষা এবং তদনুসারে বাবারও প্রতিজ্ঞা ছিল যে বাবা তাঁহাকে কাশীতে দেহত্যাগ করাইবেন। কিন্তু ঐ সময়ের পরিস্থিতিতে তাহা হওয়ার সম্ভাবনা নাই দেখিয়া বৃদ্ধা অত্যন্ত কাতরভাবে বাবাকে স্মরণ করিতে লাগিলেন। কিছুকাল পরে তিনি দেখিতে পাইলেন, একজন লোক হঠাৎ সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে আশ্বাস প্রদান করিতে লাগিলেন।

ঐ লোকটির মূর্ত্তি দেখিতে ঠিক বাবারই অনুরূপ। তিনি সত্যই মনে করিয়াছিলেন যে, বাবাই যেন তাঁহার সাহায্য করিবার জন্য সেখানে গিয়াছেন। ঐ লোকটি তাঁহাকে কোলে করিয়া উপরে তুলিয়া দিলেন, সেখানে এক একটি করিয়া সব কিছু দেখাইলেন এবং পরে ধীরে ধীরে নীচে নামাইয়া দিলেন। ঐ আগন্তুক লোকটির স্পর্শে বৃদ্ধার বুকের কাঁপুনি কমিয়া গেল এবং সুস্থ হইলেন। বৃদ্ধা কলিকাতায় নির্দ্দিষ্ট সময়ে নিরাপদেই আসিয়া পৌঁছিলেন। এই ঘটনার বর্ণনা করিয়া বাবা বলিলেন—ইহার প্রকৃত রহস্য কি? ইহার তাৎপর্য্য এই, ভগবান্ বিশ্বরূপ স্বরূপ—তাঁহার যে ভক্ত তাঁহাকে যেরূপে দর্শন করিতে ইচ্ছা করে সেইরূপেই ভগবান্ তাঁহাকে দর্শন দিয়া চরিতার্থ করেন। গুরুকে ঈশ্বর জ্ঞান করাই শাস্ত্রের উপদেশ। বৃদ্ধা তাহাই করিয়াছিলেন। আমি তো পাষাণ; কিন্তু পাষাণেও ভক্তির প্রভাবে শ্রীভগবানের অভিব্যক্তি হয়।"

ইহার পর সেই বৃদ্ধা কাশী আসিবার জন্য ব্যগ্র হন। কিন্তু ডাঃ আর, এল্, দত্ত ও তাঁহার পুত্রের জামাতা বলিলেন যে, কাশী যাওয়া তো দূরের কথা—উপর তলা হইতে নীচে নামিতেই তাঁহার প্রাণবিয়োগ হওয়ার সম্ভাবনা। তখনই অনুমতির জন্য তার করা হইল। বাবা তখন সোনারপুরায় থাকিতেন। তিনি উত্তর দিলেন—"যে যাহা বলুক, কোন ভয় নাই, চলিয়া আইস।" তখন অদম্য উৎসাহে উপর হইতে তিনি নামিয়া পড়িলেন, কোন কষ্ট হইল না। বৃদ্ধাকে কাশীতে আনা হইল,

পথে কোন বিঘ্ন ঘটে নাই। পথে কোন স্থানে তিনি জল গ্রহণ পর্য্যন্ত করেন নাই। কিন্তু তাহাতেও তাঁহার কোন ক্ষতি হয় নাই। তাঁহারা রাজঘাট বা কাশী ষ্টেশনে নামিয়া নৌকাযোগে কেদারঘাটে পৌঁছিয়াছিলেন। অভিপ্রায় ছিল, ঐখান হইতে খুঁজিয়া খুঁজিয়া বাবার আবাস স্থানের সন্ধান লইবেন। ঐ দিন বাবা দৈবক্রমে নৌকা করিয়া বরুণা সঙ্গমে স্নান করিতে গিয়াছিলেন। সেখান হইতে ফিরিবার সময় তাঁহাদের সঙ্গে দেখা হইল। সকলেই তখন আনন্দে বিভোর। কি আশ্চর্য্য! মনে হয়, ভগবানই যেন সেদিন বাবাকে এখানে নিয়াছিলেন, নতুবা হয়তো তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করা তাঁহাদের পক্ষে কষ্টকর হইত। বৃদ্ধা কিন্তু ছেলেদের দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়াও বাবাকে দর্শন না করা পর্য্যন্ত জলগ্রহণ করেন নাই। যাহা হউক, ঐ বৃদ্ধার দুইটি পুত্র বাবার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করে এবং তিনি নিজেও তাঁহার নিকট পূর্ব্বগৃহীত মন্ত্রের সংস্কার করাইয়া লন। এই বৃদ্ধা যথাসময়ে সজ্ঞানে কাশীলাভ করিয়াছিলেন।

বাবাজী বলিতেন, "যাহাকে দেখিয়াই আমার সহানুভূতি হয়, প্রথম হইতেই যাহার প্রতি আমার হৃদয় আকৃষ্ট হয়, তাহাকে আমি ভাল করিতে পারিব এইরূপ বিশ্বাস জন্মে। কিন্তু অনেক সময় কোন লোককে দেখিয়া একটা বিরুদ্ধভাবের উদয় হয়। অবশ্য বিনা কারণেই ইহা হয়। তখন বুঝিতে পারি, আমার দ্বারা ইহার কোন উপকার হইবে না। কেন যে কাহাকেও ভাল লাগে না তাহা বাহির হইতে কোন লক্ষণের দ্বারা বুঝান সহজ নহে। অনেক সময় মনের অবস্থা এমন থাকে যে, যে-লোককে অন্য সময়ে দেখিলে ভাল লাগিত না, তখন তাহাকে খুবই ভাল লাগে। একজনের লেখা দেখিলেই যেন কোন কারণে মনে হয়, লোকটি বড় ভাল। শক্তির খেলা অনির্ব্বচনীয়। যাহাকে খুব ভালবাসা যায়, তাহাকেও কোন কোন সময় ভাল লাগে না। ভাল না লাগিবার লৌকিক কোন কারণই থাকে না, তবু

এইরূপ হয়। সময়ের প্রভাবে চিত্তবৃত্তির এইরূপ পরিবর্ত্তন ঘটে, মূলে কিন্তু একটি অচিন্ত্য শক্তির ব্যাপার রহিয়াছে। সকলকে সমভাবে ভালবাসিতে চাহিলেও পারা যায় না। অবশ্য একথা আমার নিজের সম্বন্ধে বলিতেছি। আমি লোকের নিকট হইতে দীনতা চাই না, আমাকে কেহ খুব প্রণতি দেখাইলেই যে আমি খুব সন্তুষ্ট থাকি তাহাও নহে। আমি চাই লোকটি বেশ হাসিয়া কথা বলুক, বেশ সদানন্দ ও প্রফুল্ল থাকুক, তাহা হইলেই আমার ভাল লাগে। তবে দীনতা যে একেবারে ভালবাসি না তাহাও নহে। যে আমাকে প্রাণের সহিত ভালবাসে ও ভক্তি করে তাহাকে আমারও ভাল লাগে। এইরূপ কেন হয় তাহা জানি না, তবে সময় সময় মনে হয়—ভগবান তো ইহাই চান। দীনতা বা প্রপত্তি ভাল জিনিষ—ইহা না হইলে সত্যের সঙ্গে যোগ স্থাপনই হয় না।"

বাবাজী কখনও কখনও পাশ্চাত্ত্য বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির অত্যন্ত প্রশংসা করিতেন এবং শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধ না হইলে উহা দ্বারা ঐ সিদ্ধান্তকে সমর্থন করিতে চেষ্টা করিতেন। কিন্তু কখনও কখনও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি আর্য সিদ্ধান্ত হইতে বিরুদ্ধ প্রতীত হইলে উহার তীব্র সমালোচনা করিতেও তিনি ইতঃস্তত করিতেন না। তিনি ঋষিগণকে অভ্রান্ত মনে করিতেন এবং ঋষিগণের সিদ্ধান্ত সকলের মধ্যে প্রকৃত বিরোধ আছে বলিয়া কখনো স্বীকার করিতেন না। বিভিন্ন ঋষি অথবা মুনির যে মতভেদ দৃষ্ট হয়, তাহার মূলে অধিকার ভেদ আছে বলিয়া তিনি স্বীকার করিতেন। সাধারণ দার্শনিক অথবা বৈজ্ঞানিকের জ্ঞানকে তিনি অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকার করিতেন না। যদি আর্য জ্ঞানের সহিত লৌকিক পুরুষের জ্ঞানের কোনপ্রকার বিরোধ না থাকে তাহা হইলে উহাকে আদর করিতেন এবং সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতেন। লৌকিক জ্ঞানের প্রামাণিকতা তিনি আপেক্ষিক বলিয়া অঙ্গীকার করিতেন। তিনি বলিতেন, ঋষিগণ ঋতম্ভরা প্রজ্ঞাসম্পন্ন

ছিলেন—তাঁহারা যে প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করিতেন তাহাতে কোন ভ্রান্তির বীজ থাকিত না।

নির্বিকল্প সমাধিতে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে যে প্রজ্ঞার উদয় হয় তাহাতে বিকল্পের সংশ্রব থাকে না—তাহাই পর প্রত্যক্ষ। কিন্তু ঐ জ্ঞান বিকল্পরহিত বলিয়া উহা ভ্রমপ্রমাদাদি শূন্য হইলেও উহা কাহাকেও সঞ্চার করা যায় না। অবশ্য সদগুরু শিষ্যকে লৌকিক উপদেশের আশ্রয় না নিয়াও উহা সঞ্চার করিতে পারেন, ইহা পৃথক কথা। কিন্তু ব্যবহার ভূমিতে উক্ত সমাধিলব্ধ জ্ঞান দান অথবা প্রচার করিতে হইলে 'শব্দে'র আশ্রয় গ্রহণ অনিবার্য্য। জ্ঞানের বিষয় অর্থ বা বস্তু, বাচক শব্দের বাচ্যও অর্থ বা বস্তু। অর্থ বিষয়ক জ্ঞানকে অন্যত্র সঞ্চার করিতে হইলে ঐ অর্থের বাচক শব্দকে আশ্রয় করিয়াই সাধারণতঃ উহা করিতে হয়। আমরা শুধু শব্দশক্তির একটি দিক হইতেই কথা বলিতেছি। শ্রোতা ঐ শব্দ শ্রবণ করিয়া যথার্থ জ্ঞান লাভ করিয়া থাকে। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, যে-জ্ঞান মূল বক্তার হৃদয়ে বিরাজমান থাকে তাহা আপেক্ষিক দৃষ্টিতে বিকল্পহীন এবং শুদ্ধ, কিন্তু যে-জ্ঞান শ্রোতা প্রাপ্ত হয় তাহা অভিন্ন জ্ঞান হইলেও তাহাতে বিকল্পের সংশ্রব বর্ত্তমান থাকে, কারণ উহা শব্দকে বাহন করিয়া সঞ্চারিত হইয়াছে। শ্রোতা কৌশলপূর্ব্বক ঐ শব্দাংশকে পরিত্যাগ করিয়া বিশুদ্ধ জ্ঞানকে গ্রহণ করিতে চেষ্টা করে, কিন্তু তাহা হইলেও সমাধিজাত প্রত্যক্ষ জ্ঞানের সহিত এই জ্ঞানের সাম্য হয় না। একটি বিশুদ্ধ এবং অপরটি শুদ্ধ হইলেও খাঁটিভাবে শুদ্ধ নহে।

ঋষিগণ যে শাস্ত্র রচনা করিয়া গিয়াছেন অথবা যে উপদেশ নিবদ্ধ করিয়াছেন তাহা অধিকাংশ স্থলে সাক্ষাৎকারাত্মক জ্ঞানেরই বিকল্পাত্মক প্রকাশ মাত্র, অর্থাৎ তাঁহারা মনের ঊর্দ্ধস্তর হইতে জ্ঞানকে ধারণ করিয়া মনের সাহায্যে বিকল্প অবলম্বন পূর্ব্বক উহা জগতে প্রচার করিয়াছেন। কিন্তু লৌকিক পুরুষের জ্ঞান বিচারাদিমূলক বলিয়া আনুমানিক এবং অবস্থা বিশেষে প্রত্যক্ষরূপ হইলেও উহা লৌকিক

প্রত্যক্ষ মাত্র, উহাতে বিকল্পের বীজ থাকিয়াই যায়। সুতরাং যে জ্ঞান তাঁহারা উপদেশরূপে নিবদ্ধ করেন তাহা মূলে বিশুদ্ধ জ্ঞান নহে। বাবাজী এই প্রসঙ্গে বেদান্তবিদ্ মধুসূদন সরস্বতীর কথা, যাহা 'প্রস্থান ভেদ' নামক ক্ষুদ্র গ্রন্থে তিনি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, প্রায়ই উদ্ধার করিয়া বুঝাইয়া দিতেন। 'প্রস্থান ভেদ' কোন পৃথক পুস্তক নহে, ইহা পুষ্পদন্তকৃত শিবমহিম্ন স্তোত্রের মধুসূদনকৃত ব্যাখ্যার এক অংশ মাত্র। "ত্রয়ী সাংখ্যং যোগঃ" স্তোত্রস্থিত এই শ্লোকটির মধুসূদন-কৃত ব্যাখ্যাতে 'প্রস্থান ভেদ' নাম দিয়া অনেকেই পৃথকভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। এই গ্রন্থের "নহি তে মুনয়ো ভ্রান্তাঃ, সর্ব্বজ্ঞত্বাৎ তেষাম" ইত্যাদি অংশ তাঁহার অত্যন্ত প্রিয় ছিল।

এই জন্যই বর্ত্তমান সময়ের কোন কোন প্রসিদ্ধ বেদ ব্যাখ্যাতাকেও তিনি শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখিতেন না। যাঁহারা বর্ত্তমান বিজ্ঞানের সহিত বেদের সামঞ্জস্য করিতে চেষ্টা করিতেন তাঁহাদিগকে তিনি প্রকৃত ব্যাখ্যাকর্ত্তা বলিয়া মনে করিতেন না। তিনি বলিতেন, বর্ত্তমান বিজ্ঞান অগ্রগতিশীল, বর্ত্তমান সময়ে উহার যে সিদ্ধান্ত উপাদেয় প্রতীত হইতেছে—অগ্রগতির ফলে সত্যের ব্যাপকতর মূর্ত্তির সাক্ষাৎকার হইলে ঐ সিদ্ধান্ত আর উপাদেয় থাকিবে না। বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত ক্রমবিকাশ নিয়মের অধীন, কিন্তু আর্যজ্ঞান ক্রমবিকাশের নীতি হইতে চিরমুক্ত, কারণ উহার পরিবর্ত্তন ঘটিতে পারে না।

এই পর্য্যন্ত যাহা লেখা হইল তাহা হইতে বুঝা যাইবে, তিনি ঋষিগণের এবং তাঁহাদের অবলম্বিত সাধন এবং সিদ্ধান্তের একান্ত পক্ষপাতী ছিলেন। এই পক্ষপাতিত্ব কতকটা তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু অধিক মাত্রাতে ইহা তিনি তাঁহার গুরুদেবের কৃপা এবং নিজের অলৌকিক সাধনপ্রভাব হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

বাবাজী জীবন্মুক্ত পুরুষ ছিলেন, ইহাই অনেকের বিশ্বাস। বহু দূর

দেশ হইতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উচ্চাঙ্গের বিভিন্ন সাধক তাঁহার নিকট সদ্-উপদেশের জন্য উপস্থিত হইতেন। যতি, সন্ন্যাসী, অবধূত, যোগী কর্ম্মী, ভক্ত অনেকেই তাঁহার নিকট আসিতেন। সকলেই তাঁহার নিকট নিজ নিজ সমস্যার প্রকৃত সমাধান প্রাপ্ত হইতেন। সকল সম্প্রদায়কেই তিনি আপন বলিয়া মনে করিতেন এবং সকলকেই যথাযোগ্য উপদেশ দান করিতেন। গৃহস্থের নিকট সন্ন্যাসীর জ্ঞান-লিপ্সাতে আগমন অপূর্ব্ব, সন্দেহ নাই। কিন্তু জনক ও শুকদেবের কিংবদন্তী এই দেশে এখনও জাগরূক রহিয়াছে। কিছু দিন পূর্ব্বেও কাশীনিবাসী ৺শ্যামাচরণ লাহিড়ীর সান্নিধ্যে বহুসংখ্যক জিজ্ঞাসু এবং সাধনপ্রার্থী সন্ন্যাসীর ভিড় প্রায় সর্ব্বদাই লাগিয়া থাকিত।

আমার ব্যক্তিগত জীবনে বাবাজীর প্রভাব যে কতটা পড়িয়াছিল আজ তাহা ঠিক ঠিক নির্দ্দেশ করা সহজ নহে, তবে তাঁহার সহিত আমার সম্বন্ধ যে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ছিল তাহা আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিব। তাঁহার কৃপাতে অনেক সময় অলৌকিকভাবে আমি দৈহিক রোগ হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছি। তাঁহার অযাচিত করুণার প্রতিদান আমি দিতে পারি নাই এবং কখনও দিতে পারিব না। বুদ্ধি সংক্রান্ত জ্ঞানের বিকাশের ক্ষেত্রে তাঁহার সাহায্য অতুলনীয়—শুধু তাঁহার জ্ঞানময় জীবনের আদর্শ নহে, সাক্ষাৎভাবেও তিনি বহু জ্ঞান এই আধারে সঞ্চার করিয়াছেন। তাঁহার আদর্শ জীবন, পবিত্র হৃদয়, অমায়িক স্বভাব এবং কর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত জ্ঞানভক্তির অপূর্ব্ব সমন্বয় আমার প্রথম যৌবনকে মুগ্ধ করিয়াছিল। বুদ্ধির অতীত অধ্যাত্মক্ষেত্রে তাঁহার অবদান আমি নত শিরে স্বীকার করিতে বাধ্য। যখন তাঁহার শেষ দর্শন পাইয়াছিলাম তাহার কিছুদিন পরেই তাঁহাকে কোন বিশেষ কারণবশতঃ-কাশীধাম ত্যাগ করিয়া বঙ্গদেশে ফিরিয়া যাইতে হইয়াছিল—তাঁহার কাশী ত্যাগ করিবার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু নিয়তির বিপাকে তাঁহাকে বাধ্য হইয়া ৺কাশী ছাড়িতে হইয়াছিল। অবশ্য জ্ঞানীর পক্ষে সর্ব্বত্রই ৺কাশী—ইহা সত্য, তথাপি এই মহাক্ষেত্র ত্যাগ

করিবার সময় তাঁহার হৃদয়ে যে ব্যথা লাগিয়াছিল আজিও তাহা আমাকে স্পর্শ করিয়া থাকে। তিনি কলিকাতার সন্নিকটে গঙ্গাতটে তাহার পর কয়েক বৎসর অতিবাহিত করিয়াছিলেন। ঐ অবসরে তাঁহার কোন কোন নবীন রচনাও প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহার পর তিনি পূর্ব্ব হইতেই আয়োজন করিয়া স্বেচ্ছাক্রমে নিত্য সাকেত ধামে প্রয়াণ করেন। তাঁহার সেই উজ্জ্বল গৌরবর্ণ হেমকান্ত শরার, প্রজ্ঞা ও করুণা মিশ্রিত অপূর্ব্ব স্নিগ্ধ দৃষ্টি, আজানুলম্বিত বাহু, কণ্ঠে রুদ্রাক্ষমালার শোভা, আসনবদ্ধ চরণযুগল, আজিও তাঁহার ভক্তগণের অন্তর্দৃষ্টির সম্মুখে ধ্যেয়রূপে জাগিয়া উঠে।

ক্ষেপা সাধু

প্রায় ৩৩ বৎসর পূর্ব্বে শীতকালে সন্ধ্যার সময় ইঁহার প্রথম দর্শন প্রাপ্ত হই। ৺হরিপ্রসাদ বিদ্যান্ত মহাশয় এই প্রদেশের সুপারিণ্টেণ্ডিং ইঞ্জিনীয়ার ছিলেন। তিনি কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করার পর কাশীতেই স্থায়ীভাবে বাস করিতেন। কাশীতে তাঁহার নিজের বাড়ী ছিল এবং তাহা ছাড়া এখানে তাঁহার নানাপ্রকার কীর্ত্তিও ছিল। তিনি অতিশয় বদান্য, ধর্ম্মপ্রাণ, সরল এবং অমায়িক প্রকৃতির লোক ছিলেন। সাধু ও সৎ পুরুষের দর্শন ও সঙ্গ লাভ করার সংস্কার তাঁহার বাল্যকাল হইতেই ছিল। তিনি কাশীতে আসিয়া অবস্থান করার সময়ে কোন সূত্রে আমার সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। তাহার পর হইতে তিনি প্রায় প্রতিদিনই আমার নিকট আসিতেন এবং অনেকক্ষণ আমাদের মধ্যে সৎ প্রসঙ্গ চলিত। এই প্রসঙ্গের সময় কখনও কখনও অনেক ভদ্রলোক উপস্থিত থাকিতেন, আবার কখনও তিনি একাও থাকিতেন। কয়েক বৎসর এইভাবে অতিবাহিত হয়।

একদিন বিদ্যান্ত মহাশয় আমাকে ক্ষেপা সাধুর বিষয়ে সংবাদ দেন। তিনিও অল্প দিন পূর্ব্বেই এই মহাত্মার দর্শন লাভ করিয়াছিলেন এবং ইঁহাকে দর্শন করিয়া তাঁহার মনে বিশিষ্ট শ্রদ্ধার ভাব জাগিয়াছিল। কিন্তু মহাত্মার বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করিতে অসমর্থ হইয়া একদিন আমার নিকট সাধুর নাম উত্থাপন পূর্ব্বক তাঁহার পরিচয় প্রকাশ করেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, আমাকে সঙ্গে লইয়া সাধুবাবার নিকট যাইবেন এবং আমার সমক্ষে তাঁহার সঙ্গে ধর্ম্মতত্ত্বের আলোচনা করিবেন। যদিও সাধুটি আমাদের প্রচলিত সাধুমণ্ডলীর আদর্শের ঠিক অনুরূপ নহেন, তবু বিদ্যান্ত মহাশয় ভাবিতেন যে, ইঁহার মধ্যে এমন একটি

অসাধারণতা আছে যাহা সাধারণ সাধুবর্গে লক্ষিত হয় না। ইঁহার অপরিসীম জ্ঞানের পরিচয় পাইয়া তিনি স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিলেন।

যেদিন তিনি সাধুটির প্রসঙ্গ আমার নিকট উথাপন করেন আমি সেইদিনই তাঁহার সহিত যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করি। সাধুটিকে পূর্ব্বে সূচনা দেওয়া হয় নাই বলিয়া কোন প্রকার অসুবিধা হইতে পারে, এইরূপ আমি মনে করি নাই। কারণ, আমি ভাবিয়াছিলাম ঐ সময়ে আমাদের দর্শনলাভ যদি নাও হয় তাহা হইলেও তাঁহার আবাসস্থানটি দেখা হইয়া যাইবে। এই মনে করিয়া আমি বিত্থান্ত মহাশয়কে তখনই যাইতে অনুরোধ করিলাম, কারণ শুভকাজে বিলম্ব করিতে নাই। ইহা ডিসেম্বর মাসের কথা। আমরা উভয়েই সাধুটির তৎকালীন আবাসস্থানে গিয়া পৌঁছিলাম এবং বিত্থান্ত মহাশয় সাধুটির সহিত দেখা করিয়া তাঁহার নিকট আমার পরিচয় প্রদান করিলেন। আমি নিকটেই একটি নির্দ্দিষ্টস্থানে উপবেশন করিয়া সাধুর আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম।

অল্পক্ষণ পরেই সাধুটি ভিতর হইতে বাহিরে আসিলেন এবং আমরা যেখানে বসিয়াছিলাম সেইখানেই আসিয়া নিকটে উপবেশন করিলেন। মহাত্মাকে দেখিয়া প্রচলিত সাধুর ন্যায় সাধু বলিয়া মনে হইল না, কারণ তিনি কখনই সাধুর বেশ ধারণ করিতেন না। তাঁহার পরিধানে ছিল সাধারণ শ্বেতবস্ত্র, তাহাও হাঁটু পর্য্যন্ত নিবদ্ধ ছিল। গলায় মালা ছিল না, মস্তকে জটা ছিল না অথবা মস্তক মুণ্ডিতও ছিল না। মস্তকে রুক্ষ কেশজাল আলুথালুভাবে ছড়ান ছিল। দেখিয়া মনে হইল, ইনি কোনকালে তেল ব্যবহার করেন না। দেহও রুক্ষ ছিল, অবস্থা পঞ্চাশের উপর বলিয়া মনে হইল। তাঁহার আকৃতিতে সর্ব্বপ্রধান আকর্ষণ ছিল চক্ষু। চক্ষু দুইটিতে একটি অপার্থিব তেজ লক্ষিত হইতেছিল, চক্ষু দুইটি যেন ঢুলু ঢুলু অথচ অন্তরে অন্তরে সজাগ—দৃষ্টিটি ছিল অন্তর্ভেদী। তিনি বসিলেন এবং আমাদিগকে কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করিয়া আমাদিগের আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন।

তাঁহার প্রশ্ন শুনিয়া বন্ধুবর বিদ্যান্ত মহাশয় আমার দিকে ইসারা করিয়া আমাকেই তাঁহার সঙ্গে আলোচনা করিতে অনুরোধ করিলেন। তদনুসারে আমিই নিঃসঙ্কোচে তাঁহার সহিত কথা কহিতে আরম্ভ করিলাম। আমি তাঁহাকে বলিলাম—"আপনার নাম শুনিয়া আপনার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছি। শুনিয়াছি, আপনি বহু প্রকার বিজ্ঞানের রহস্য অবগত আছেন। তাছাড়া অধ্যাত্মসাধনের রহস্য সম্বন্ধেও আপনার নিকট দুই চারিটি প্রশ্ন করিতে ইচ্ছা করিতেছি। যদি আপনি অনুমতি দেন তাহা হইলে আপনাকে দুই একটি প্রশ্ন করিব।"

মহাত্মা বলিলেন—"আপনি যাহা ইচ্ছা জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। আমি যথাশক্তি উত্তর দিব।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"আপনি সাধনপথে তীর্থযাত্রীর ন্যায় অগ্রসর হইয়াছেন—এই পথে বহু প্রকার দৃশ্য দেখিয়া থাকিবেন। কিন্তু প্রকৃত লক্ষ্য প্রাপ্ত হইয়াছেন বলিয়া মনে হয় কি?"

তখন মহাত্মা বলিলেন—"সাধনপথে চলিতে চলিতে রাস্তায় অনেক কিছুরই দর্শন হয়; আবার মাঝে মাঝে সব দর্শন মিটিয়াও যায়। সাধনার প্রকৃত লক্ষ্য ভগবৎ-প্রাপ্তি, উহা অতি কঠিন এবং দুরূহ বিষয়। ঐ লক্ষ্য এখনও আমি প্রাপ্ত হইয়াছি বলিয়া মনে করিতে পারি না। সাধনার প্রকৃত লক্ষ্য যে নিরঞ্জন জ্যোতি উহা আজ পর্য্যন্ত একমাত্র পরমেশ্বরই প্রাপ্ত হইয়াছেন, আর কেহ উহা লাভ করিতে পারেন নাই। দেখুন, আমরা যে স্তরে রহিয়াছি উহা গ্রহের স্তর। এই স্তর হইতে উত্থিত হইয়া সূর্য্যমণ্ডলে প্রবেশ করিতে হয়, এই সূর্য্য জগৎ-সূর্য্য নামে প্রসিদ্ধ।

"ইহা সমষ্টিভাবে এক হইলেও ব্যষ্টিভাবে দ্বাদশভাগে বিভক্ত। বিভিন্ন রাশির সহিত সংশ্লিষ্ট সূর্য্যের বিভিন্ন রূপ আছে। আপনারা যে দ্বাদশ আদিত্যের কথা বলিয়া থাকেন তাহা খুবই সত্য। এই জগৎ-সূর্য্যকে ভেদ করিতে পারিলে প্রণবরূপী সূর্য্যকে প্রাপ্ত হওয়া

যায়। প্রণবস্‌র্য্য বার ভাগে বিভক্ত, এইজন্য প্রণবও ব্যষ্টিভাবে বারটি। প্রণব সূর্য্যের ঊর্দ্ধে উত্থিত হইলেই বিন্দুতে প্রবেশ করিবার অধিকার জন্মে। এই বিন্দুর নাম ঈশ্বর-জ্যোতি। বিন্দু ভেদ করিতে পারিলে ঈশ্বর-জ্যোতি হইতেও নির্ম্মল বিশাল একটি জ্যোতির সাক্ষাৎকার হয়। তাহাকেই আমি পরমেশ্বর জ্যোতি বলি। কিন্তু ইহাও নিরঞ্জন জ্যোতি নহে। নিরঞ্জন জ্যোতির সন্ধান এইখান হইতেই পাওয়া যায়। সুতরাং একমাত্র পরমেশ্বরই নিরঞ্জন জ্যোতির সন্ধান জানেন, আর কেহ জানে না। এই নিরঞ্জন জ্যোতিতে স্থিতিই প্রকৃত ভগবৎ স্থিতি। আমি এখনও তাহা প্রাপ্ত হই নাই।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"আপনি যে পথে অগ্রসর হইয়াছেন সেই পথে চলিতে চলিতে শূন্যের দর্শন পাওয়া যায় কি ?"

মহাত্মা হাসিয়া বলিলেন "নিশ্চয়ই। এক একটি স্তর শেষ হইলেই সেই পথের শূন্য দৃষ্টিপথে পতিত হয়। তখন ক্রিয়া রুদ্ধ হইবার উপক্রম হয়। কারণ শূন্য ভেদও ক্রিয়াসাপেক্ষ। শূন্য ভেদ করিতে পারিলে আবার একটি স্তর পাওয়া যায় এবং সেই স্তরে তাহার উপযোগী ক্রিয়ার সাক্ষাৎকার ঘটে। সেই ক্রিয়ার অবসানের সঙ্গে সঙ্গে শূন্য পরিদৃষ্ট হয়। এই শূন্য পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর ব্যাপক। স্তর অনুসারে শূন্য বহু আছে।

"সকলের অন্তিম শূন্য—অনন্ত শূন্য নামে পরিচিত। মহাশূন্যও ভেদ করা যায়। মহাশূন্যকে ভেদ না করিলে পরমেশ্বরের সাক্ষাৎকার হয় না, কিন্তু অনন্তশূন্য ভেদ এ পর্য্যন্ত কোন যোগী বা জ্ঞানী করিয়াছেন বলিয়া আমি বিশ্বাস করি না। কারণ, তাহা হইলে জগতের অবস্থা অন্যরূপ হইত। এই অনন্তশূন্য ভেদ ভিন্ন নিরঞ্জন জ্যোতির সাক্ষাৎকার দুর্ঘট। একমাত্র পরমেশ্বরই অনন্তের অন্ত দর্শন করিতে সমর্থ, আর কাহারও পক্ষে তাহা সম্ভবপর নহে। তবে স্বয়ং পরমেশ্বরত্ব লাভ করিলে উহা হইতে পারে, কিন্তু আজও তাহা

কাহারও হয় নাই। আমি আজও মহাশূন্য ভেদ করিয়া অনন্তশূন্য ভেদের যোগ্যতা লাভ করি নাই। এখনও অনন্তশূন্যের পারেই বসিয়া আছি, কখনও ভেদ করিতে পারিব কিনা তাহাও জানি না।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"সৃষ্টির প্রক্রিয়া সম্বন্ধে আপনার ধারণা কি? সৃষ্টির লহর কোন্ স্থান হইতে উত্থিত হয় এবং কেন হয়?"

মহাত্মা বলিলেন—"দেখুন ইহা অতি রহস্যময় বিষয়। যাহাকে যোগিগণ কূল বলেন আমি তাঁহাকে ভাবাকাশ বলি। এই ভাবাকাশে ভাবের দর্শন হয়, সৃষ্টির ব্যাপার তাহার পরবর্ত্তী। সৃষ্টির মূলে আছে ইচ্ছা। কারণ, ইচ্ছা ভিন্ন সৃষ্টি হইতে পারে না। কিন্তু এই ইচ্ছা কামও হইতে পারে অথবা প্রেমও হইতে পারে। কাম হইতে সাধারণ সৃষ্টি হয়—প্রেম হইতে দিব্য সৃষ্টি হয়, উভয়ই সৃষ্টির অন্তর্গত। ভাবরাশির কম্পন বিশিষ্ট—ইচ্ছার প্রভাবে ভাব ঘনীভূত হইয়া বিন্দুর আকার ধারণ করে। অবশ্য যে কোন ভাবই বিন্দুরূপে সংহত হইতে পারে, বিন্দু রচনা সম্পন্ন হইলে ঐ বিন্দুটি সঞ্চারিত হয় ত্রিকোণে। ইহারই নামান্তর যোনি। এই বিন্দু মস্তকে, বক্ষঃস্থলে, নাভিমূলে অথবা লিঙ্গমূলে প্রস্ফুটিত হইতে পারে। তৎ-তৎস্থান হইতে উৎসর্গের ফলে বিভিন্ন বর্ণের উৎপত্তি হয়। তান্ত্রিক সৃষ্টিতে ব্রাহ্মণাদি বর্ণভেদের ইহাই মূল কারণ। যখন বিন্দু রচনা হইল তখন আর ভাব নাই—ভাব শূন্য হইয়াছে, কম্পন নিবৃত্ত হইয়াছে। ভাব ও বিন্দুর মধ্যে যে ব্যবধানটি আছে তাহারই নাম শূন্য। এই শূন্যকে ভেদ করিতে পারিলে ভাব কম্পন বিন্দুরূপে পরিণতি লাভ করে। বিন্দুতে ঐ কম্পন নিরুদ্ধগতি হইয়া বর্ত্তমান থাকে। পরে ঐ গতির বিকাশ হয়, ইহার নাম রেখা—ইহা সরল রেখা। এই গতি পূর্ণ বিকাশ প্রাপ্ত হইলে আর তখন ইহা থাকিবে না, ইহা শূন্য হইয়া যাইবে। তখন অক্ষরের বিকাশ হইবে। বিন্দু এক, রেখা দুই, বৃত্ত তিন, ক্রুস চারি, ইত্যাদি—এই প্রকার দশটি মাপ বা মান আছে। নয়

এর পরেই শূন্য সহকারে দশ হয়। বিন্দু ক্ষুব্ধ হইয়া রেখা হয়, যেমন প্রদীপের প্রভা। রেখা সরল পথে চলিতে চলিতে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণে বাঁকিয়া যায় ও বৃত্তের আকার ধারণ করে। বৃত্ত পূর্ণভাবে গঠিত হইবা-মাত্রই কেন্দ্র ফুটিয়া উঠে, তখন কেন্দ্রের আকর্ষণে ব্যাস হয়। আহ্নিক ও বার্ষিক গতিতে দুইটি ব্যাস হয় ও উহারা পরস্পর কাটাকাটি করে। উভয়ের পরস্পর যোগবিন্দু অর্থাৎ পূর্ব্ববর্ণিত কেন্দ্র গুরুত্বাকার ধারণ করে। এইরূপ ক্রমশঃ। এই চারিটি মান জয় করিতে পারিলে শরীর মাধ্যাকর্ষণ দ্বারা আকৃষ্ট হয় না। তখন উহা প্রাচীর, পাহাড় পর্ব্বত সব ভেদ করিতে পারে।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"আপনি এই যে বিভিন্ন মানের কথা বলিলেন, মহাপুরুষগণ সকলেই কি এই সকল মান ভেদ করিয়া থাকেন।"

তিনি বলিলেন—"সকলের অগ্রগতি সমান হয় না। বুদ্ধদেব আটটি মান লঙ্ঘন করিয়া নবমে যাইয়া আবদ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি নবমটি ভেদ করিতে পারেন নাই। অনেকে আট পর্য্যন্তও যাইতে পারেন না।" তিনি আরও বলিলেন—"দেখুন, এই যে শূন্যের কথা বলিলাম ইহার সংখ্যা হয় না। তবে মোটামুটি তিনটি সংখ্যার কথা বলা চলে—প্রথমটি শূন্য বা জাগতিক শূন্য, দ্বিতীয়টি মহাশূন্য, তৃতীয়টি অনন্ত শূন্য যাহার কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। যেখানে একটা গতির অবসান হয় সেইখানেই শূন্য। সেইখানেই বিন্দু হইয়া থাকে। পুনরায় গতি প্রাপ্ত হইয়া শূন্য ভেদ করিয়া চলে, সেটা শেষ করিলে আবার শূন্য প্রাপ্ত হয়। এই প্রকার বুঝিতে হইবে।"

একদিন ক্ষেপা বাবার সহিত ভক্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা হয়। তিনি বলিলেন—"জগতে সর্ব্বত্র ভক্তিনামে যে বস্তুর প্রকার দেখিতে পাওয়া যায় তাহা বাস্তবিক পক্ষে ভক্তি নহে। উহাকে আমি ভূতভক্তি বা ভৌতিকভক্তি বলি। কারণ অজ্ঞান অবস্থা কাটিয়া না গেলে ভৌতিক সংস্কারের উর্দ্ধে উঠিতে পারা যায় না। এবং প্রকৃত ভক্তি

ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায় না। মন ও প্রাণের সহিত 'আমি' নামক সত্তাটিকে লইয়া যদি এক ভাবে ভগবানে গতি ও স্থিতি করান যায় তাহা হইলেই ভগবৎ প্রাপ্তি সম্ভবপর হয়। বস্তুতঃ অনন্তকালের সাধনা ভিন্ন ইহা হইতে পারে না। ভগবৎ প্রাপ্তির পথে চলিতে হইলে সর্ব্বপ্রথম স্বভাব-প্রকৃতির কর্ত্তব্য কার্য্যগুলি সমাধান করিতে হইবে, কারণ তাহা না হইলে জ্ঞান লাভ করা ঘটিবে না। জ্ঞান প্রাপ্ত হইলে ঐ জ্ঞানের দ্বারা ভক্তি অর্জ্জন করিতে হইবে। তখন প্রকৃত প্রস্তাবে ভগবৎ-প্রাপ্তির সম্ভাবনা দেখা দিবে। তাহার পূর্ব্বে ভক্তির প্রশ্ন উঠিতেই পারে না। শুদ্ধ ভক্তিই প্রকৃত ভক্তি। এই শুদ্ধভক্তি অজ্ঞান নিবৃত্তি না হইলে পাওয়া যাইতে পারে না। ভগবানের সৃষ্টি-কার্য্যের রহস্য ও অনন্ত শক্তির পরিচয় না পাইলে আমিত্বের নাশ হয় না। আমিত্বের নাশ না হইলে শুদ্ধ ভক্তি কোথা হইতে আসিবে? শুদ্ধ ভক্তির পর বিশুদ্ধ ভাবের উদয় হয়, তখন ভগবৎ সত্তার উপলব্ধি আপনি হইয়া থাকে। ভক্তের প্রকৃত লক্ষণ এই যে, সে ভগবান্ ছাড়া অন্য কিছু জানে না।"

ভগবানের অবতরণ সম্বন্ধে একদিন বাবাজী প্রসঙ্গতঃ বলিলেন—"বাস্তবিকপক্ষে ভগবানের মর্ত্ত্যলোকে অবতরণ কখনই হয় না ও হইতেও পারে না, কারণ তিনি ষড়ৈশ্বর্য্যশালী ও পূর্ণ। তাঁহার পক্ষে ঊর্দ্ধগতি বা অধোগতি কিছুই সম্ভবপর নহে। যাঁহাকে শাস্ত্রে অবতার বলা হয় তাহা অন্য জিনিষ। অবতার সকল নিত্যসিদ্ধ অংশ ও কলারূপে ঊর্দ্ধে বিদ্যমান রহিয়াছে। মর্ত্ত্যলোকের প্রয়োজন হইলে তাঁহারাই নামিয়া আসেন। সাধারণতঃ তাঁহাদিগকেই ভগবানের অবতার বলা হয়।"

একদিন পুরুষ ও প্রকৃতিতত্ত্ব নিয়া বাবাজী অনেক আলোচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার সিদ্ধান্ত এই—"মনের কয়েকটি অবস্থা আছে —এই সকল অবস্থা মনের গতির উপর নির্ভর করে। যখন মনের সব প্রকার গতি নিরুদ্ধ হইয়া যায় তাহাকেই সাধারণতঃ নিরোধ বলে।

মনের লয় ও নির্ব্বিকল্প সমাধি এই অবস্থাতেই হইয়া থাকে। প্রকৃত প্রস্তাবে ইহা মনের পুরুষভাব প্রাপ্তি মাত্র অর্থাৎ মন যখন নিষ্ক্রিয় হয় তখন বুঝিতে হইবে মন পুরুষ ভাবাপন্ন হইয়াছে, আবার মন যখন ক্রিয়াশীল হয় তখন বুঝিতে হইবে মন প্রকৃতি ভাবাপন্ন হইয়াছে। এই যে পূর্ব্বে মনের নির্ব্বিকল্প সমাধিতে পুরুষভাব প্রাপ্তির কথা বলিলাম উহা মনের চরম অবস্থা নহে। উহার পর ঐ পুরুষরূপী মনকে প্রকৃতি সাজাইয়া পুনর্ব্বার তাহাকে গতি দিতে হইবে, তখন ক্রিয়াশীল হইয়া মন পুনর্ব্বার চলিতে থাকিবে।

"এইটি ইচ্ছার ভূমি, নির্ব্বিকল্প অবস্থার পূর্ব্বে ইচ্ছা শক্তির জাগরণ হইতেই পারে না। কিন্তু এই গতিও নিরুদ্ধ হইয়া যাইবে এবং কেন্দ্রের বিকাশ হইবে। তখন ইচ্ছা আর ইচ্ছা থাকিবে না—ইহার নাম ইচ্ছার পুরুষভাব প্রাপ্তি। তখন ইচ্ছা পূর্ণ হইয়া ইচ্ছা ও অনিচ্ছা এক হইয়া যায়।"

বাবাজী বলিতেন—"ভাবাকাশে ভাবের ছবি বিদ্যমান রহিয়াছে। ভাবাকাশ আমার ভিতরেও আছে এবং বাহিরেও আছে। বাহ্য ভাবাকাশে স্থিত ভাবের প্রভাবে বা যোগে আমার নিজের ভাবাকাশে ভাবের ছবি ফুটিয়া উঠে। ইহাকেই ভাবের বিকাশ বলে। এই বিকাশ ঘটিলেই জ্যোতির উদয় হয়। জ্যোতি হইতে নাদের উন্মেষ হয়। নাদ হইতে সকল প্রকার প্রবৃত্তি বা ক্রিয়ার আবির্ভাব হইয়া থাকে। নাদ ও ক্রিয়া সৃষ্টির অন্তর্গত, জ্যোতি সৃষ্টির অতীত। জ্যোতি হইতে সৃষ্টি হয়। যে বল প্রয়োগে একটি সৃষ্টির আবির্ভাব হয় তাহা অপেক্ষা অধিকতর বল প্রয়োগ করিতে না পারিলে জ্যোতি ভেদ করিতে পারা যায় না। জ্যোতি ভেদ করিতে না পারিলে জ্যোতিতে অথবা শূন্যে ডুবিয়া যাওয়া অবশ্যম্ভাবী। এ প্রকারে তথাকথিত নির্ব্বাণ লাভ পূর্ণত্বের পথে বাঞ্ছনীয় নয়, কিন্তু বাঞ্ছনীয় না হইলেও অসমর্থের পক্ষে অন্য কোন উপায় নাই। ঐ জ্যোতি বা শূন্য হইতে অভিনব সৃষ্টিতে পুনর্ব্বার বাহির হইয়া আসিতে হয়। ঐ স্থানে নিত্য

স্থিতি প্রাপ্ত হওয়া যায়। সমগ্র জগতের মুক্তি না হওয়া পর্য্যন্ত নিজের যথার্থ মুক্তি লাভের কোনই উপায় নাই।"

জ্ঞানের প্রসঙ্গে তিনি বলিতেন—"আমি জ্ঞানকেই গুরু বা আত্মস্বরূপ বলিয়া মনে করি। এই জ্ঞান মানে জ্ঞান-জ্যোতি। ইহার নীচে জ্ঞান দর্শন নামে একটি অবস্থা আছে। সেই অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া অনেক সাধকই ভ্রষ্ট হন।"

মনকে বাদ দিয়া শুধু জ্ঞান দ্বারাও দর্শন হইতে পারে; সেই দর্শন এবং মনের দর্শন ঠিক এক প্রকার নহে। মন দিয়া স্বর্গ দর্শন করিলে নিজ হইতে পৃথকরূপে স্বর্গের দর্শন হয় অর্থাৎ নিজের বাহিরে স্বর্গের সত্তা দৃষ্ট হয় কিন্তু মনকে বাদ দিয়া স্বর্গ দর্শন করিলে অর্থাৎ বিশুদ্ধ জ্ঞানের দ্বারা স্বর্গ দর্শন করিলে এইরূপ অনুভূতি হয় যে আমি ঠিক স্বর্গেই আছি অর্থাৎ মনের দর্শন ভেদ দর্শন এবং জ্ঞানের দর্শন অভেদ দর্শন—ইহাই পার্থক্য। ইহা ছাড়া সাত্ত্বিক আলোতেও দর্শনাদি হইতে পারে, কিন্তু ইহা আরও নীচের জিনিষ। ভবিষ্যৎ দর্শনাদি সাত্ত্বিক আলোকেই হইয়া থাকে। সাধারণ দর্শনাদিও সাত্ত্বিক আলোকেই হয় সন্দেহ নাই, তবে উহাতে কিছু ভেদ আছে। সূর্য্যমণ্ডল হইতে এক সঙ্গে সব কিছু দেখিতে পাওয়া যায়—উহাও সাত্ত্বিক আলোকের দর্শন মনে করিতে হইবে। জ্ঞানের পরেই নির্ব্বাণ বা মহাশূন্য। নির্ব্বাণ মানে বাণহীন। বাণ বলিতে বুঝিতে হইবে গণ্ডী বা সীমা। গাণ্ডীবের পাঁচটি বাণ বা সীমা থাকে। জ্ঞানও একটি গণ্ডিবিশেষ, নির্ব্বাণে তাও থাকে না কারণ জ্ঞান নিভিয়া না গেলে প্রকৃত নির্ব্বাণ হইতেই পারে না। নির্ব্বাণে ডুবিতে পারিলে একটি অখণ্ড সত্তার সাক্ষাৎকার হয়, তাহারই নাম ভাব। ভাব হইতেই গতি ক্রমে সৃষ্টি হয়, ভাবের অতীত যাহা তাহাই নিরঞ্জন। নির্ব্বাণ ও নিরঞ্জন এক নহে কারণ নির্ব্বাণ অভাবাত্মক ও নিরঞ্জন ভাবাতীত।"

"এই যে জ্যোতিস্বরূপ গুরুর কথা বলা হইল উহাই বিন্দু। মনুষ্যের মস্তকে বারটি বিন্দু আছে। সাধকের ভাব-প্রকৃতি ঠিক না হইলে

বিন্দুর সহিত যোগ হয় না। যে বিন্দুর সঙ্গে যোগ হয় তদনুরূপ আনন্দপ্রাপ্তি ঘটে। ভাব-প্রকৃতি ঠিক করিবার জন্য সর্ব্বপ্রথম আবশ্যক ভাবকুণ্ডলী রচনা করা। কুণ্ডলী রচনা সম্পন্ন হইলে ইচ্ছানুসারে উহা কার্য্যে পরিণত হইতে পারে। সকল কার্য্যই ইচ্ছামূলক হইলেও চরমে আপন আপন ভাব কুণ্ডলীরই বিকাশ। ভাব কুণ্ডলী রচনা মানেই জন্মগ্রহণ, ইহা প্রকৃতিই ঠিকভাবে করিয়া থাকে। প্রবর্ত্তক অবস্থায় তিনটি দশা আছে। এই অবস্থার মূলে সবই প্রকৃতির ব্যাপার। ইহার পর সাধনা। সাধককে দশটি দশার মধ্য দিয়া যাইতে হয়। তারপর সিদ্ধ অবস্থা। তাহারও অন্তর্গতভাবে নয়টি অবান্তর অবস্থা আছে। বস্তুতঃ এই নয়টি অবান্তর অবস্থা নবগ্রহের সহিত সংশ্লিষ্ট ; ইহার এক একটি অবস্থাতে এক একটি গ্রহের কার্য্য হইয়া থাকে। ক্রমশঃ নয়টি গ্রহের কার্য্যই সম্পূর্ণ হইলে রবি প্রণবসূর্য্যকে স্পর্শ করেন। তখনই সিদ্ধির আবির্ভাব হয়। ইহাই সিদ্ধাবস্থা।

কুণ্ডলীকে পরিবর্ত্তন করিতে না পারিলে জীবনের ধারায় পরিবর্ত্তন ঘটিতে পারে না। উপনয়ন অথবা দীক্ষার সময় সদ্গুরু কুণ্ডলীকে বদ্‌লাইয়া ফেলেন। কুণ্ডলী পরিবর্ত্তনের সময় পূর্ব্বসত্তার অভাব হয়, উহাকেই মৃত্যু বলে। তাহার পর নবীন জন্ম হয়, যাহাকে সাধারণতঃ দ্বিতীয় জন্ম বলা হয়।”

“এই প্রণব অতিদূরের জিনিষ, ইহাকে প্রাপ্ত হইতে হইলে বিশ্ব ভেদ করিতে হইবে। কিন্তু যতক্ষণ বিশ্বে প্রবেশ না হয় ততক্ষণ বিশ্ব ভেদের কোন প্রশ্নই উঠে না। বিশ্বে প্রবেশ করিতে হইলে তৎপূর্ব্বে জগৎকে ভেদ করিতে হইবে। এই যে জগৎ আমরা নিরন্তর দেখিতে পাইতেছি ইহা একটি পুরুষের আকার। আমরা নিজের দেহ হইতে ব্রহ্মরন্ধ্রের দ্বারা অথবা আংশিকভাবে নাভির দ্বারা বাহিরে যাইতে পারি। বাহিরে যাইবার অন্য কোন রাস্তা নাই। কিন্তু নিজের বাহিরে গেলেও জগতের বাহিরে যাইতে পারি না। আমরা যে জগৎটি প্রত্যক্ষ অনুভব করিতেছি সেই জগৎ যে বিরাট দেহের অন্তর্গত সেই দেহকেও

ভেদ করিতে পারিলে বিশ্বে প্রবেশ করা সম্ভবপর। জগতের পরে বিশ্ব এবং বিশ্বের পরে প্রণব। এই প্রণব পর্য্যন্ত গেলে তবে সিদ্ধি।"

"আর একটি কথা। অনেকে বিদেহ স্থিতির কথা বলিয়া থাকে। আমার মনে হয় বিদেহ অবস্থা লাভ করা অত্যন্ত কঠিন। রাধাচক্র পার না হইতে পারিলে বিদেহ হওয়া যায় না। কিন্তু এটা পার হওয়া অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার; ইহা অতি ভীষণ তীব্র বেগে নিরন্তর ঘুরিতেছে। ইহাকে পার হইতে হইলে ইহার মধ্যস্থিত ছিদ্র পথে নির্গত হইতে হয়। নতুবা উহা অর্থাৎ ঐ তীব্রবেগসম্পন্ন চক্র, মনকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ছড়াইয়া ফেলিবে। তাহার ফল জড়ত্ব। আত্মা মনের সংযোগেই চেতন—যেখানে মন নাই সেখানেই জড়ত্ব, আত্মার সত্তা থাকা সত্ত্বেও। রাধাচক্র ঠিক চেতন স্থানের উপর অর্থাৎ মস্তকের যে স্থানে শিখা রাখা হয় তাহার সন্নিকটে। ঐস্থান হইতেই সমস্ত দেহে চৈতন্য সঞ্চার হইতেছে।"

তিনি আরও বলিতেন—"যেখানে মাথার খুলি, দেহের সমস্ত গতি গুটাইয়া ঐস্থানে লইয়া যাইতে পারিলে শবাধার হয়। উহাই প্রকৃত প্রস্তাবে শ্মশান বা শবস্থান। চৈতন্য শক্তিকে বাহির করিতে হইলে দেহকে শবরূপে পরিণত করা আবশ্যক।"

তিনি বলিতেন—"তীর্থস্থানে অথবা কোন মন্দিরে দেব দর্শনে যাইতে হইলে দেবতার চিন্তা করিতে করিতে যাইতে হয়। তাহা হইলে দেহে নবীন বলের সঞ্চার হয়। কারণ তিনিই দেহকে টানিয়া আনিতে থাকেন। এই টানের অনুভব তখনই হয় যখন তাঁহাকে চিন্তা করিতে করিতে নিজে খালি হইয়া যাওয়া যায়। তখন স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে তিনিই টানিয়া নিতেছেন।"

সীতারামদাস বাবাজীর কথা

বাবাজী সীতারামদাস রামায়েত সম্প্রদায়ের একজন বিশিষ্ট ও উন্নত ভক্ত। তিনি দীর্ঘকাল চিত্রকুটে মন্দাকিনী তীরে এবং অনসূয়া প্রভৃতি স্থানে কঠোর তপশ্চর্য্যা করিয়া ভগবানের বিশেষ অনুগ্রহ লাভ করিয়াছিলেন। ইঁহার একজন বিশিষ্ট অনুরাগী ভক্তের নিকট ইঁহার অনুভূতির বিষয় জানিতে পারিয়াছিলাম। ইনি লোকতঃ বিশিষ্টা-দ্বৈতবাদী বৈষ্ণব হইলেও ইঁহার অনুভূতির ক্রমে একটু বৈলক্ষণ্য ছিল। যদিও আমি সাক্ষাৎভাবে ইঁহার দর্শন ও সঙ্গলাভ করিবার অবসর পাই নাই তথাপি আমার একজন বিশিষ্ট মিত্র ইঁহার সম্বন্ধে নিজের সঙ্গজনিত যে অনুভবপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহা হইতেই আমি ইঁহাকে বিশিষ্ট শ্রেণীর অন্তর্গত মহাত্মা বলিয়া চিনিতে পারিয়াছিলাম এবং স্থূলে না হইলেও অন্তরাল অবস্থায় ইহার স্পর্শলাভ না করিয়াছিলাম এমন নহে।

ইনি যাহা কিছু অনুভবগত বৈশিষ্ট্যলাভ করিয়াছিলেন তাহা সাধনমার্গের অতি উর্দ্ধ ভূমি সম্বন্ধে। নিম্ন ভূমির সাধন ক্ষেত্র সম্বন্ধে বিশেষ কোন কথা তিনি বলিতেন না। অর্থাৎ মনুষ্য দেহে তত্ত্ব আলোচনা করিতে গেলে ইহার মধ্যে তিনটি পৃথক্ পৃথক্ খণ্ড আছে ইহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। বাবাজী মহারাজ বলিতেন, "মূলাধার হইতে আজ্ঞাচক্র পর্য্যন্ত ছয়টি চক্র, এমন কি সহস্রারও দেহের প্রথমখণ্ডের অন্তর্গত। ইহার পর ব্যাপকরূপে শূন্য বিরাজমান। এই শূন্য ভেদ করিতে পারিলেই দেহের দ্বিতীয় খণ্ডে প্রবেশ করিতে পারা যায়। এই দ্বিতীয় খণ্ডের প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে অতি বিশাল তেজঃ-পুঞ্জের সাক্ষাৎকার হয়। কোটি কোটি সূর্য্য হইতেও এই তেজের

প্রকাশ অধিক। অনেক সাধক সহস্রার ভেদ করিয়া কি উহার অতীত শূন্য ভেদ করিয়া, এই মহাতেজের মধ্যে যাইয়া লীন হইয়া পড়ে, ইহাকে ভেদ করিতে পারে না। এই তেজের ভিতরে প্রবেশ করিলে জানা যায় ইহার মধ্যে তিনটি পৃথক্ পৃথক্ বিভাগ আছে। প্রথম বিভাগের নাম—অক্ষর—ইহা একপ্রকার শূন্য স্বরূপ। দ্বিতীয় বিভাগের নাম—নিরক্ষর—ইহা মহাশূন্য স্বরূপ। এই পথে অগ্রসর হইতে পারিলে ক্রমশঃ সহজ পথ ও অচিন্ত্য পরব্রহ্ম পদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। যাহারা অক্ষর ভূমিতে থাকে তাহারা শূন্যেই স্থিত হয়। কিন্তু যাহারা নিরক্ষর ভূমিতে আসিতে পারে তাহারা এই অচিন্ত্য পরব্রহ্ম পদ পর্য্যন্ত উঠিতে পারে। ইহার পর আর কোন পথ নাই। কিন্তু নিরক্ষরের অতীত অবস্থাও আছে। যদি কেহ সেই পর্য্যন্ত যাইতে পারে তাহা হইলে সত্য লোক, কুমারলোক এবং চরমে উমা লোক পর্য্যন্ত তাহারই ঊর্দ্ধগতি সম্ভবপর। ইহার পর আর কোথাও যাইবার পথ পাওয়া যায় না।

সিদ্ধিমাতা

সে আজ অনেক দিনের কথা। সম্ভবতঃ ১৩৩৮ সাল অথবা তাহার নিকটবর্ত্তী কোন সময় হইবে। আমি তখন বড়দেব মহল্লাতে সর্ব্বমঙ্গলা লেনে অবস্থান করিতাম। একদিন শ্রীস্বামী শঙ্করানন্দজী এবং ৺বীরেশ্বর চট্টোপাধ্যায় আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। স্বামীজী কথাপ্রসঙ্গে বলিলেন যে, খালিসপুরা মহল্লায় একজন মাতাজী আছেন। তাঁহার আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ এবং নিষ্ঠা, ভক্তি ও তন্ময়তা বর্ত্তমান সময়ে অনন্যসাধারণ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তিনি তাঁহাকে দর্শন করিয়া প্রকৃত সাধু দর্শন করিয়াছেন বলিয়া মনে করেন। তাঁহার ইচ্ছা ও আগ্রহে আমি তাঁহাদেরই সঙ্গে একদিন শ্রীশ্রীমাতাজীকে দর্শন করিবার জন্য গমন করিলাম। সেখানে যাইয়া যাহা দেখিলাম, তাহাতে বিস্ময় ও আনন্দ উভয়ই লাভ করিয়াছিলাম। মা তখন খালিসপুরাতে শিবালয়ের বাড়ীতে ছিলেন। দেখিলাম একটি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে একখানা আসনের উপর মা উপবিষ্টা রহিয়াছেন। মস্তক হইতে পা পর্য্যন্ত বিশাল অবগুণ্ঠন—ঘোমটার আড়াল হইতে মুখশ্রী দর্শন করিবার উপায় ছিল না। আমরা যাইবার পর তিনি আমাদিগের দিকে পিঠ করিয়া বসিলেন। বুঝিলাম—নবাগত দর্শকদের নিকট হইতে সংকোচবশতঃ যথাশক্তি আত্মগোপন করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। মুখ দেখিতে না দিলেও, আমাদের জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর দিতে তিনি সঙ্কোচ বোধ করেন নাই। তাঁহার কণ্ঠস্বর মৃদু হইলেও দৃঢ় এবং করুণাব্যঞ্জক মনে হইতেছিল। তাঁহার দর্শন পাইয়া এবং সৎপ্রসঙ্গ শ্রবণ করিয়া আমি অত্যন্ত আনন্দ বোধ করিয়াছিলাম। সরলতা, একাগ্রতা, অব্যভিচারিণী নিষ্ঠা এবং একমাত্র ভগবানের চিন্তাতে

সমগ্র জীবনের উৎসর্গ—ইহাই তাঁহার জীবনের বৈশিষ্ট্য ছিল। সুদৃঢ় বৈরাগ্যের উপর ভগবদ্‌ভক্তির সাহায্যে তিনি তাঁহার নিজের জীবন প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।

ইহার পর হইতে অবসর পাইলেই তাঁহার নিকট যাইতাম ও নানা প্রকার ভগবৎ-প্রসঙ্গের আলোচনা করিতাম। তিনি শাস্ত্রে অভিজ্ঞ না হইলেও, সুদীর্ঘ সাধনার ফলে ভগবৎতত্ত্ব সম্বন্ধে অনুভূতি-সম্পন্ন ছিলেন। সেই অনুভূতির সাহায্যেই তিনি আমার সকল প্রশ্নের সমাধান করিতে চেষ্টা করিতেন। ঠাকুর ছাড়া তিনি অপর কিছু জানিতেন না এবং মানিতেন না। তিনি নিজের জীবনে প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়াছেন—ঠাকুরই তাঁহার পথ-প্রদর্শক এবং ঠাকুরই তাঁহার একমাত্র লক্ষ্য। তিনি শাস্ত্রের উপদেশ, মহাজনগণের নির্দ্দেশ অথবা জ্ঞানবৃদ্ধ ও বয়োবৃদ্ধগণের অনুশাসন কিছুই জানিতেন না। প্রতি মুহূর্ত্তে ঠাকুরই তাঁহাকে পরিচালনা করিতেন। ঠাকুর ছিলেন তাঁহার সাথের সাথী, তাঁহার উপদেষ্টা, তাঁহার সান্ত্বনাদাতা, তাঁহার বল-ভরসা, তাঁহার ঐশ্বর্য্য, তাঁহার জ্ঞানবিজ্ঞান, তাঁহার সর্ব্বস্ব। ঠাকুর তাঁহাকে যখন যেমন ভাবে চলিতে বলিতেন, তিনি তখন তেমনিভাবেই চলিতে চেষ্টা করিতেন। ঠাকুর ছিলেন তাঁহার একাধারে ইষ্ট ও গুরু।

মা খালিসপুরার শিবালয়ের বাড়ী হইতে হাড়ারবাগ গুরুমার বাড়ী পর্য্যন্ত যখন যে স্থানে অবস্থান করিয়াছেন, আমি যথাশক্তি সেই স্থানেই তাঁহাকে অবসর-মত দর্শন করিয়াছি। পর পর যে সকল আধ্যাত্মিক অনুভূতি তিনি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহার সবগুলি সম্বন্ধেই তাঁহার শ্রীমুখ হইতে বর্ণনা শুনিয়াছি এবং সেই সম্বন্ধে প্রশ্নোত্তরচ্ছলে আলোচনা করিবারও অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছি। আমার মনে হয়, তাঁহার এই সুদুর্লভ অধ্যাত্মবিজ্ঞানের আলোচনা প্রাসঙ্গিকভাবে একটু না করিলে তাঁহার জীবনের কথা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। বাহ্য-জীবনের বিবরণ এবং অন্যান্য বৃত্তান্ত তাঁহার জীবনী-গ্রন্থে কিছু কিছু আছে। চিন্তাশীল পাঠক উহা হইতেই তাঁহার জীবনের ধারা চিনিয়া

লইতে পারিবেন। বর্ত্তমান সময়ে নানা স্থানে নানা প্রকার সাধক দেখিতে পাওয়া যায়—তাঁহারা সর্ব্বত্যাগী হইয়া একান্তবাসী এবং ভোগ-বিতৃষ্ণ হইলেও অল্পাধিক পরিমাণে ব্যবহারিক জগতের সহিত পরিচিত। কিন্তু সিদ্ধিমাতা এই বিংশ শতাব্দীতে এবং বারাণসীর ন্যায় নগরে অবস্থান করিয়াও প্রকৃত প্রস্তাবে সেই প্রাচীন দেশ এবং প্রাচীন যুগেই যেন বিদ্যমান ছিলেন। বর্ত্তমান সভ্যতার আড়ম্বর তিনি একপ্রকার চিনিতেন না বলিলেই হয়। এই জাতীয় সাধিকার জীবনে বাহ্যঘটনার বাহুল্য কি থাকিতে পারে ?

সুতরাং যে মহাপ্রস্থানের পথে তিনি সমগ্র মনপ্রাণ দিয়া অগ্রসর হইয়াছিলেন সেই পথের বিবরণ জানিতে পারিলে তাঁহার পরিচয় ঘনিষ্ঠ ভাবে পাওয়া সম্ভবপর। স্থূল দৃষ্টিতে মনে হইতে পারে, মা ভক্তিপথের পথিক ছিলেন। বাস্তবিক পক্ষে ইহা সত্য কথা। কারণ তিনি বলিতেন—সাধনার আগেও ভক্তি, অন্তেও ভক্তি—ভক্তিই সাধনার প্রাণ। তথাপি ইহা বলিতেই হইবে যে জ্ঞান, মহাজ্ঞান প্রভৃতি তিনি পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিয়াছিলেন এবং চরম অবস্থায় পরমপদের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছিলেন। তিনি যে অদ্বৈত ভূমিতে উপনীত হইয়াছিলেন তাহা শাস্ত্রের বিচারজনিত নহে, তাহা নিজের সুদীর্ঘকালব্যাপী সাধনার সুমধুর ফলস্বরূপ।

যখন তাঁহার দেহের পরিবর্ত্তন আরম্ভ হয় তখন প্রথম প্রথম সেটা স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয় নাই। কায়াভেদী বাণী কায়া-আশ্রয়ে প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে আভাসরূপে দেহ মধ্যে অনেক কিছু ফুটিয়া উঠিত। এই অবস্থায় তাঁহার এক ভক্তের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। ইহা বোধ হয় ১৩৪০ সালের কথা। ভক্তটি তাহার পিতা-মাতার সঙ্গে কাশী আগমন করিয়াছিল এবং অবসর মত সাধুদর্শন ও সৎপ্রসঙ্গের আলোচনা করিত। ঐ সময় আমি তাহাকে সঙ্গে লইয়া মার নিকট যাই এবং মার সহিত তাহার পরিচয় করাইয়া দেই। মার সঙ্গ প্রাপ্ত হইয়া তাহার জীবনে অভূতপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়।

সে নিরন্তর মার সঙ্গ করিতে থাকে এবং তাঁহার প্রত্যক্ষ ফলও নিজের জীবনে অনুভব করে। সে শ্রীঅরবিন্দের একজন পরম ভক্ত ছিল এবং সেই সময় তাহার চিন্তার ধারা শ্রীঅরবিন্দের অতিমানস সাধনা অনুসরণ করিয়া চলিত। যদিও সে বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন উপাধিধারী এবং বিদ্বান্ ও বিদ্যানুরাগী ব্যক্তি ছিল, তথাপি তাহার প্রকৃত বৈশিষ্ট্য আত্মানুসন্ধান এবং ভগবদুন্মুখতার মধ্যে লক্ষিত হইত। তাহার নিকট শ্রীঅরবিন্দের অপ্রকাশিত বহু পত্র সংগৃহীত ছিল (এই সকল পত্রের মধ্যে কতকগুলি ঐ সময়ের বহু পরে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে)। এই সকল পথের আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে সে সর্ব্বদাই আলোচনা করিত এবং অন্যের সহিত বিচার বিনিময় করিত। মার সঙ্গ লাভ করার পর হইতে লক্ষ্য করিতাম যে, তাহার মনের গতি যেন অন্যদিকে সঞ্চালিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। মার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার ফলে মারই অহেতুক কৃপাবশতঃ সে মার কায়াভেদী বাণী এবং কায়াতে প্রকাশিত প্রণব ও পাদপদ্ম প্রভৃতি স্বচক্ষে দেখিতে পায়। শুধু তাহাই নহে। বাণী যেমন যেমন প্রকাশিত হইত, সে উপস্থিত থাকিলে (অনেক সময়েই সে উপস্থিত থাকিত) তাহা ধৈর্য্য সহকারে যথাসম্ভব শুদ্ধভাবে খাতাতে প্রতিলিপি করিয়া রাখিত। সঙ্গে সঙ্গে বাণীনির্গমের সময়টিও সঠিক ভাবে লিখিয়া রাখিত। কিছুদিন পর পর সংগৃহীত বাণীর একটি প্রতিলিপি আমাকে দিয়া যাইত। এইভাবে সমস্ত কায়াভেদী বাণী আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত আমার নিকট সংগৃহীত হইয়াছিল। 'শ্রীশ্রীসিদ্ধিমাতা' নামক গ্রন্থে যে কায়াভেদী বাণী প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা মূলতঃ আমার সংগ্রহ হইতেই গৃহীত। কায়াভেদী বাণীর সঙ্গে সঙ্গে মাঝে মাঝে বিভিন্ন দেবতার মন্ত্র ও গায়ত্রীও ফুটিয়া বাহির হইত। ঐগুলি নিজের ব্যক্তিগত সম্পদ বলিয়া সে আমাকে দিত না, নিজের নিকট রাখিয়া দিত। উক্ত গ্রন্থে ঐগুলিও প্রকাশিত হইয়াছে।

সাধন-পথ অত্যন্ত রহস্যময়। একই গুরু হইতে শক্তি লাভ

করিলেও বিভিন্ন সাধক অন্তর্নিহিত আধারের তারতম্য বশতঃ বিভিন্ন পথে চালিত হয়। শ্রীশ্রীসিদ্ধিমাতা নিজে যে ক্রম অবলম্বন করিয়া অগ্রসর হইয়াছিলেন তাহা এবং পূর্ব্বোক্ত ভক্তটি শক্তিলাভের পর যে ক্রম প্রাপ্ত হইয়াছিল তাহা সর্ব্বাংশে একপ্রকার নহে। মূলে সাদৃশ্য থাকিলেও, শাখা-প্রশাখাতে ভেদ লক্ষিত হয়। শ্রীকৃষ্ণা-মা নামক একটি মহিলা ভক্ত সিদ্ধিমাতাজী হইতে শক্তিলাভ করিলেও, ঠিক গুরুর অনুরূপ পথে চলেন নাই। নিজের অবস্থার একটি ক্রমবদ্ধ বিবরণ তিনি নিজেই তাঁহার 'কণিকা-মালা' গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এইরূপ অন্যত্রও বুঝিতে হইবে। ইহার একমাত্র কারণ, প্রত্যেক সাধকের নিজ নিজ ব্যক্তিগত সংস্কার ও প্রতিভা।

সিদ্ধিমা প্রকৃত প্রস্তাবে ভক্ত ছিলেন, যোগী ছিলেন না। বাল্য অবস্থা হইতেই তিনি তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ভক্তিভাবে সিদ্ধ ছিলেন। দেব-দেবীর দর্শন তাঁহার সহজ সংস্কারের ফল। যে অলৌকিক উৎকর্ষ তিনি উত্তর জীবনে লাভ করিয়াছিলেন, তাহার একমাত্র মূল তাঁহার স্বাভাবিক বৈরাগ্য-ভাব এবং সরল ভক্তি। দীক্ষা তাহার কুলক্রমাগত নিয়ম অনুসারেই হইয়াছিল, কিন্তু সে দীক্ষায় তিনি জাগিয়া উঠিতে পারেন নাই। উহা একটি লৌকিক প্রথা পালন মাত্র হইয়াছিল। কারণ তাঁহার জীবনের প্রকৃত মহত্ত্ব, যতদিন তাঁহার ভক্তি-বিকাশের ফলে ঠাকুরের সবিশেষ কৃপালাভ না হইয়াছে, ততদিন হয় নাই। তিনি যোগাভ্যাস কখনও করেন নাই। সাধু-সঙ্গও করেন নাই। কাশী আসার পর অন্যান্য কাশীবাসী ভক্তের ন্যায় নিয়মিত গঙ্গাস্নান ও কাশীস্থ দেব-বেবী দর্শন করিতেন এবং বাকী সময়ে নির্জ্জনে ভগবদ-ভজন করিতেন। তাঁহার জীবনে কোন বিষয়েই আড়ম্বর ছিল না। তাই দিনের পর দিন অদ্ভুত নিষ্ঠা ও ধৈর্য্য সহকারে তিনি যে ভজন করিয়া যাইতেন, এক সময়ে তাহারই প্রভাবে তাঁহার জীবন উষর মরুভূমি হইতে শস্যশ্যামল, স্নিগ্ধ ও সরল ক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছিল। তাঁহার মুখে শুনিয়াছি, যে সময়ে তিনি বিভিন্ন মন্দিরে যাত্রা করিতেন,

সে সময়ে তিনি সাধনার অন্তঃস্তরে প্রবেশ করিতে পারেন নাই। বাহিরের দিক্ দিয়া ভক্তি-অভিব্যক্তির ফলে দেব-দেবীর আবির্ভাব এবং তাঁহাদের অনেক কিছু অলৌকিক লীলাখেলা অবশ্যই হইত। কিন্তু ইহা বাহ্য ব্যাপারমাত্র। ইহাতে প্রকৃত আত্মজ্ঞানের পথ তিনি প্রাপ্ত হইতে পারেন নাই। ইহার পর যখন দেহতত্ত্ব বুঝিবার জন্য দেহে প্রবেশলাভ করিলেন অর্থাৎ কুণ্ডলিনী শক্তি জাগরণের পর যখন তিনি দেহে চক্রের পর চক্র ভেদ করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন, তখন হইতেই তাঁহার প্রকৃত উন্নতির পথ খুলিয়া গেল। তাঁহার সাধনার ক্রমিক ইতিহাস আলোচনা প্রসঙ্গে এই বিষয়ে বিশেষভাবে চিন্তা করা যাইবে।

মনুষ্যদেহধারী প্রত্যেক জীবের মূলাধার চক্রে কুণ্ডলিনী শক্তি নিদ্রিত রহিয়াছে। এই শক্তিকে জাগাইতে না পারিলে, সাধন-ভজন যাহাই কিছু অনুষ্ঠিত হউক, তাহা অল্পাধিক পরিমাণে বাহ্য ব্যাপারে পর্য্যবসিত হয়। সাধনার উদ্দেশ্য মৃত্যুর পর স্বর্গে অথবা অন্যান্য উর্দ্ধলোকে উত্থিত হইয়া সেখানকার উপভোগ্য ঐশ্বর্য্য ও আনন্দ সম্ভোগ করা নহে, কারণ ঐ জাতীয় ভোগ পুণ্যকর্ম্মপ্রভাবে জীব বিনা সাধনাতেই প্রাপ্ত হইতে পারে। উহা কৃতকর্ম্মের ফলভোগমাত্র, উহা প্রকৃত সাধনার ফল নহে। যে সাধনায় জীব মোহনিদ্রা হইতে উত্থিত হইয়া নিজের শিবত্ব অনুভবপূর্ব্বক পূর্ণতত্ত্বের দিকে অগ্রসর হইতে না পারে, তাহা প্রকৃত সাধনা নহে। এই জন্য কুণ্ডলিনী-জাগরণ হইতেই প্রকৃত সাধনার সূত্রপাত হয়। সিদ্ধিমা নিজের জীবনে গভীরভাবে এই সত্য উপলব্ধি করিয়াছিলেন। জীবের আত্মা শিবস্বরূপ, মোহ ও অজ্ঞানে আচ্ছন্ন হইয়া উহা মূর্চ্ছিতবৎ হইয়া রহিয়াছে। এই শিবরূপী আত্মা ব্যোমতত্ত্বে অর্থাৎ বিশুদ্ধ চক্রে শবরূপে অবস্থান করিতেছে। ইহা গভীর প্রসুপ্তি। এই সুপ্ত আত্মাকে অর্থাৎ শবরূপী শিবকে না জাগাইতে পারিলে, আত্মজ্ঞানের পথে অগ্রসর হওয়া সুদূরপরাহত।

কিন্তু শক্তি ভিন্ন এই সুপ্ত শিবকে জাগাইবার অন্য কোন উপায় নাই। অথচ শক্তি স্বয়ং নিদ্রাতে অভিভূত হইয়া আধারচক্রে জড়পিণ্ডবৎ পড়িয়া রহিয়াছে। এই জন্য সাধকের সর্ব্বপ্রধান এবং সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য, এই সুপ্ত শক্তিকে জাগ্রৎ করিয়া তাহার সাহায্যে শবরূপী শিবকে প্রবুদ্ধ করা। মূলাধার হইতে বিশুদ্ধ চক্র পর্য্যন্ত পাঁচটি চক্র পাঁচটি ভৌতিক তত্ত্বের কেন্দ্র। শক্তি ব্যাপকভাবে সর্ব্বত্রই সুপ্ত রহিয়াছে। শক্তি এক ও অভিন্ন, তথাপি চক্র-ভেদে তাহার স্থিতি পৃথক্ পৃথক্। মূলাধার চক্রে শক্তি জাগ্রৎ হইলে তাহার প্রভাবে স্বাধিষ্ঠান চক্রস্থিত শক্তি জাগ্রৎ হয়। এই প্রকারে তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম চক্রের শক্তির জাগরণও বুঝিতে হইবে। মোট কথা, একই শক্তি জাগ্রৎ হইয়া যেমন যেমন সুষুম্নাপথে ঊর্দ্ধে উত্থিত হইতে থাকে, তেমনি তেমনি তাহার জাগরণ ক্রমশঃ অধিক উজ্জ্বল ও স্পষ্ট হয় এবং চরমাবস্থায় শক্তির পূর্ণ জাগরণ-কালে পাঁচটি চক্রই মুক্ত হইয়া যায়। তখন আর কোথাও লেশমাত্র জড়ত্বের আভাস বর্ত্তমান থাকে না। এই অবস্থায় অর্থাৎ আকাশতত্ত্বে শক্তির পূর্ণ জাগরণের ফলে শবরূপী শিব জাগ্রৎ হন, আত্মার অনাদি নিদ্রা ভাঙ্গিয়া যায়। তখন শিব-শক্তি উভয়েই জাগ্রৎ বলিয়া কেহ কাহাকেও ছাড়িয়া থাকিতে পারেন না, অর্থাৎ পরস্পর পরস্পরের আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া যুগল-রূপে মিলিত হইবার জন্য ঊর্দ্ধে উত্থিত হন। আজ্ঞাচক্রে, ভ্রূমধ্যস্থলে, শিব-শক্তির এই মিলন সংঘটিত হয়।

মিলন হইলেও, এই মিলনে অপূর্ণতা থাকে; কারণ ইহা খণ্ডমিলন—মহামিলন নহে। আজ্ঞাচক্র হইতে সহস্রার পর্য্যন্ত মহামিলনের পথ নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। যতক্ষণ খণ্ডমিলন মহামিলনে পরিণত না হয়, ততক্ষণ পাকা আমিকে পাওয়া যায় না। আজ্ঞাচক্রে শিব-শক্তির মিলনের ফলে যে অহং-ভাবের উন্মেষ হয়, তাহা খণ্ড-আমি; তাই তাহাকে 'পাকা-আমি' বলা যাইতে পারে না। পাকা আমিই অখণ্ড আমি—সেই এক আমিত্বেই অসংখ্য অনন্ত খণ্ড আমি

এক হইয়া যায়। এই এক হওয়ার মধ্যে একটা গভীর রহস্য আছে।

চিদাকাশ সহস্রারেরই অন্তর্গত। এই আকাশে অন্ত সূর্য্য ও বহিঃসূর্য্য পরস্পর মিলিত হইয়া অভিন্নরূপে প্রকাশিত হয়। মহামিলন পূর্ণভাবে সিদ্ধ হইবার পূর্ব্বে আত্মদর্শন হইয়া থাকে, এবং মহামিলনের পর পাকা আমি প্রতিষ্ঠিত হয়। সুতরাং আত্মদর্শন, মহামিলন এবং পাকা আমিতে স্থিতি, এই তিনটি উপলব্ধি ক্রম অনুসারে হইয়া থাকে। যদি কোন সাধক আত্মদর্শনের পরে দেহত্যাগ করে, তাহা হইলে সে শিবলোকে প্রবেশ লাভ করে; কিন্তু মহামিলন পর্য্যন্ত আয়ত্ত করিয়া দেহত্যাগ করিলে, শিবত্বলাভ অবশ্যম্ভাবী। মহামিলনের পর পাকা আমিকে প্রাপ্ত হইয়া দেহত্যাগ করিলে, বৈকুণ্ঠে গতি হয়। এই অবস্থা অতি অদ্ভুত; কারণ পাকা আমিই মূল আমি, ইহা এক ও অখণ্ড। স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায়, এই আমি হইতেই শুধু নিম্নস্তরের দেবতাবর্গ নহে, ঊর্দ্ধস্তরের ব্রহ্মাদি সকল দেবতা, এমনকি সমগ্র জগৎ বহির্গত হয়, এবং পুনরায় সমগ্র বিশ্ব ঐ আমিতে প্রবিষ্ট হইয়া লীন হইয়া যায়। আমি যেমন ছিল তেমনই থাকে, তাহার লয় নাই। বলা বাহুল্য, এইটি সাকার অবস্থা—এক হিসাবে সাকার সত্তার চরমস্থিতি। লীলা অর্থাৎ নিত্যলীলা এই পর্য্যন্তই বিরাজ করে। ইহার পর আর লীলা থাকে না। লীলা তখন ব্রহ্মে লীন হইয়া যায়। তখন একমাত্র ব্রহ্মময় এবং তাঁহার সঙ্গে অভিন্নরূপে বিরাজমানা ব্রহ্মময়ী বিদ্যমান থাকেন—আর থাকে একটি বিশাল আমি। সাকার ও নিরাকারের মধ্যস্থলে এই বিশাল আমি সাক্ষিস্বরূপে বিদ্যমান থাকে। ইহার পরমাবস্থা শুদ্ধ ব্রহ্ম। তখন ব্রহ্মময়ীও ব্রহ্মসত্তাতে অভিন্ন হইয়া যান। বলা বাহুল্য, এই অবস্থাতেও আমি থাকে। ব্রহ্মাবস্থা লাভ করার পর যদি কোন সাধকের দেহত্যাগ হয়, তাহা হইলে ঐ সাধক মৃত্যুর পর বৈকুণ্ঠধামে না যাইয়া একেবারে গোলকধামে প্রবেশ লাভ

করে। স্থূল দেহে ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত না হইলে, গোলোকে প্রবেশলাভ করিবার অধিকার জন্মে না।

কিন্তু এই ব্রহ্মভাবের মধ্যেও অনেক অবান্তর ভেদ আছে। প্রথমে যে ব্রহ্মের উপলব্ধি হয়, উহা শান্তব্রহ্ম এবং জ্যোতিঃ-স্বরূপ। ইহার পর পূর্ণব্রহ্মের উদয় হয়। পূর্ণব্রহ্মের পরাবস্থা পরব্রহ্ম—ইনি-নীল জ্যোতিঃ অথবা কৃষ্ণতেজঃ দ্বারা উপলক্ষিত। বলা বাহুল্য, জাগতিক শ্রীকৃষ্ণ পরব্রহ্ম হইতে অভিন্ন। এই পর্য্যন্তই একপ্রকার দেহের সীমা। ইহার পর মহাশূন্যের উদয় হয়। দিগন্তপ্রসারী মহাশূন্যে অবস্থিতি-কালে সাধক নিজের পূর্ব্ব-পূর্ব্ব জন্মের সকল কর্ম্ম প্রত্যক্ষ দর্শন করিতে পারে, ঐ অবস্থায় তাহার সকল কর্ম্মসংস্কার শিথিল হইয়া তাহাকে পরিত্যাগ করে। ব্রহ্মজ্ঞান আরম্ভ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই কর্ম্মক্ষয় হইতে আরম্ভ হয়। মহাশূন্যে কর্ম্ম প্রায় সম্পূর্ণভাবে ক্ষীণ হইয়া যায়, তবে কর্ম্মের বীজটা তখনও থাকে। মহাশূন্যের পর পরিপূর্ণ ব্রহ্মাবস্থাতে ব্রহ্মাগ্নির উদয় হইলে, কর্ম্মবীজটি দগ্ধ হইয়া যায়। তখনই কর্ম্ম একেবারে শান্ত হয় এবং মায়ারও অবসান হয়। পরিপূর্ণ ব্রহ্মাবস্থায় পরাভক্তি, পরমজ্ঞান প্রভৃতি সব এক সঙ্গে মিশিয়া যায় এবং ভরপুর হইয়া যেন উছলিয়া পড়িতে থাকে। এই অবস্থায় আত্মা সিদ্ধিলাভ করে। তখন অর্থাৎ ব্রহ্মাগ্নিতে কর্ম্মবীজ দগ্ধ হইয়া জ্ঞান-ভক্তির পূর্ণতা সিদ্ধ হইলে, মহাশক্তি অবতীর্ণ হন। যতক্ষণ কর্ম্মের বীজ নষ্ট না হয় অথচ কর্ম্ম সকল সাধনা ও জ্ঞানের প্রভাবে শিথিল হইয়া অপসারিত হইতে থাকে, ততক্ষণ মহাশক্তির অবতরণ হয় না। মহাশক্তির অবতরণের ফলে আত্মা ব্রহ্মত্ব লাভ করিয়া সিদ্ধ হয়। তখন সিদ্ধ আত্মা পরমপদের দর্শন প্রাপ্ত হইয়া থাকে ও তাহার প্রকৃত জ্ঞানচক্ষুর উন্মীলন হয়। ব্রহ্ম হইতে পরিপূর্ণ ব্রহ্ম পর্য্যন্ত যে জ্ঞান-লাভ হয়, মা বলিতেন, তাহাও আভাস-জ্ঞান। তাহাতে বিশ্বচরাচরের সন্ধান পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তথাপি তাহা আভাস। মা বলিতেন, শিব, নারায়ণ, ব্রহ্মময়ী, দুর্গা প্রভৃতি এই প্রকৃত

জ্ঞানচক্ষুর উপাসক। তবে ইঁহাদের ইহাতে স্থিতি নাই। কারণ ইঁহারা জগতের শাসনকার্য্যে ভিন্ন ভিন্ন অধিকার পদে অধিষ্ঠিত। এই জন্য ইঁহারা পূর্ণজ্ঞানে যাতায়াত করিতে পারিলেও, স্থিতিহীন। সাধারণ দেবতা* সকল এই জ্ঞানের সন্ধান পান না, স্থিতি-লাভ তো দুরের কথা!

মা বলিতেন, সাধনার পথ অতি বিশাল। আত্মদর্শন, নিত্যলীলা, মহামিলন, মিলনমিশ্রণ এবং ব্রহ্মলাভ হইলেও সাধনার শেষ হয় না। মহাশূন্য ভেদ করিয়া পরিপূর্ণ ব্রহ্মতত্ত্বে স্থিতি লাভ না হইলে আত্মার সিদ্ধি হয় না। সাধন অবস্থাতে পতনের ভয় অবশ্যই থাকে। পরিপূর্ণ ব্রহ্মাবস্থার পরে পতনের আশঙ্কা থাকে না বলিয়া উহাই অভয়পদ।

এই প্রসঙ্গে গুরুতত্ত্ব সম্বন্ধে মায়ের কয়েকটি কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মা বলিতেন, "সাধকের অবস্থার তারতম্য অনুসারে গুরু মূলতঃ এক হইলেও, ক্রিয়া-ভেদে চারি প্রকারে প্রকাশিত হইয়া থাকেন।" তদনুসারে এই চারি প্রকার গুরুর নাম—গুরু, বিশ্বগুরু, গুরুব্রহ্ম এবং সদ্‌গুরু দেওয়া যাইতে পারে। যিনি শিষ্যের কুণ্ডলিনী জাগাইয়া তাহাকে চক্র-ভেদ করিতে সাহায্য করেন—তিনি গুরু। যাহার কুণ্ডলিনী জাগাইবার শক্তি নাই, তাহাকে তিনি প্রকৃত গুরু বলিয়া স্বীকার করিতেন না। ষট্‌চক্র-ভেদের পর বিশ্বভেদ যাঁহার কৃপায় সম্ভবপর হয়, তিনি বিশ্বগুরু। ষট্‌চক্র-ভেদের পর এবং ব্রহ্মজ্ঞান উদিত হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বিশ্বগুরুর অধিকার জানিতে

---

*শিব, বিষ্ণু প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ দেবতার অন্তর্গত। নিম্নস্তরের দেবতাবর্গ ব্রহ্মে প্রবেশ করিতে পারেন না। মা বলিতেন, উর্দ্ধস্তরের দেবতা সকল একবার ব্রহ্মে প্রবিষ্ট হন, আবার সেখান হইতে নির্গত হন। প্রবিষ্ট হইবার পর একমাত্র ব্রহ্মই থাকেন, ভিন্ন ভিন্ন দেবতার চিহ্ন তখন লক্ষিত হয় না। কিন্তু নির্গমের পরেও সেই ব্রহ্মজ্যোতিঃ থাকে বটে, তবে সেই জ্যোতির মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন দেবতার ভিন্ন ভিন্ন আকারটি প্রকাশ পায়। এই আকারটি জাগতিক বলিয়া বায়, জ্যোতিঃটি ব্রহ্ম।

হইবে। ইহার পর ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার হয়—ইহা বিশ্বের অতীত অবস্থা। যাঁহার কৃপা-কটাক্ষপাতে অশেষ-বিশেষ সহকারে ব্রহ্মজ্ঞান আয়ত্ত হয়, তিনি ব্রহ্মগুরু নামে বর্ণিত হইয়া থাকেন। মা বলিতেন, ইনিও সদ্গুরু নহেন। যাঁহার মহাকৃপাতে জীবের আত্মসাক্ষাৎকার ঘটে, তিনিই সদ্গুরু। সদ্গুরুর স্থান ব্রহ্মগুরুরও ঊর্দ্ধে। পরিপূর্ণ ব্রহ্মাবস্থায় প্রতিষ্ঠিত হইবার পর যথার্থ আত্মসাক্ষাৎকার হয়, তৎপূর্ব্বে নহে। পূর্ব্বে যে আত্মদর্শন ঘটিয়া থাকে, তাহা বস্তুতঃ আভাসমাত্র।

জ্ঞানের অথবা মহাজ্ঞানের স্বরূপ-নির্ণয়-প্রসঙ্গে অনেক সময়ে মার সঙ্গে আলোচনা করিয়াছি। তিনি বলিতেন, জ্ঞান ততক্ষণ পূর্ণভাবে উজ্জ্বলতা লাভ করে না, যতক্ষণ চৈতন্যের বিকাশ না হয়। জ্ঞান ও চৈতন্য স্বরূপত অভিন্ন হইলেও, উভয়ের মধ্যে কিঞ্চিৎ পার্থক্য আছে। চৈতন্য অত্যন্ত নিগূঢ় বস্তু, ব্রহ্মজ্ঞান হইতে মহাশূন্যের সাক্ষাৎকারের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যে জ্ঞান, তাহাতে চৈতন্যের অভিব্যক্তি সম্ভবপর হয় না; কারণ তখনও কর্ম্মবীজ অথবা মূল অবিদ্যা নষ্ট হয় নাই। মহাশূন্য ভেদ করার পর পরিপূর্ণ ব্রহ্মাবস্থাতে যে জ্ঞানের আবির্ভাব হয়, তাহা অনেক উন্নত স্তরের জ্ঞান। ঐ জ্ঞান অগ্নিস্বরূপ হইয়া মূল অজ্ঞানকে দগ্ধ করে। অবিদ্যা-নিবৃত্তির পর ব্রহ্মাগ্নি শান্ত হইয়া গেলে, চৈতন্যের অভিব্যক্তি হয়। তখনকার জ্ঞান জ্ঞানাগ্নি হইতেও শ্রেষ্ঠ। ইহাই উজ্জ্বল মহাজ্ঞান। চৈতন্যের অভিব্যক্তি হইলে, জ্ঞানের প্রকৃত স্বরূপ ফুটিয়া উঠে এবং স্বরূপানন্দ উদ্বুদ্ধ হয়। যদিও জ্ঞান ও চৈতন্য একই বস্তু, তথাপি পূর্ণতার অনুরোধে মা বলিতেন, "জ্ঞানও চাই, চৈতন্যও চাই।" চৈতন্যহীন জ্ঞানকে তিনি শ্রেষ্ঠ জ্ঞান বলিয়া গণ্য করিতেন না।

জ্ঞান ও চৈতন্যে ভেদ না থাকিলেও, যে কিঞ্চিৎ ভেদ আছে, তাহা মার পূর্ব্বোক্ত বাণী হইতেই স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। শিব ও শক্তি যেমন অভিন্ন বস্তু হইলেও, শক্তিহীন শিব শিব নহে, শবরূপ, ইহাই শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত, সেই প্রকার মা বলিতেন, "জ্ঞান ও চৈতন্য অভিন্ন হইলেও, চৈতন্যহীন জ্ঞান প্রকৃত জ্ঞান নহে।" মহাশক্তির অবতরণের

পূর্ব্বে যে জ্ঞান উপলব্ধ হয়, তাহাই চৈতন্যহীন জ্ঞান। মহাশক্তির অবতরণের পর চৈতন্যের উন্মেষ হয় বলিয়া জ্ঞানটি চৈতন্যের সঙ্গে অভিন্নরূপে উজ্জ্বলভাবে প্রকাশ পায়।

এইখানে একটি কথা বিশেষভাবে প্রণিধানের যোগ্য। পরিপূর্ণ ব্রহ্মাবস্থাতে ব্রহ্মাগ্নির শিখা কর্ম্মের শেষকে দগ্ধ করিয়াও নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয় না, বরং উজ্জ্বল হইয়া জ্বলিয়া উঠে। এই যে উজ্জ্বলতা, ইহাই মহাশক্তির অবতরণের নিদর্শন। কিন্তু এই অবতরণের সঙ্গে সঙ্গে যে পরিপূর্ণ আনন্দের বিকাশ হয়, তাহাতে কোন উল্লাস নাই। মা বলিতেন, "মনে করিলাম, এত বিরাট আনন্দ ধারণ করিব কিরূপে? কিন্তু এমন দেখিতেছি, তাহাতেও বিচলিত ভাব আসে না। আনন্দজনিত কোন চঞ্চলতা আসে না। একটা উদাসীনতা বা স্থিরতা অক্ষুন্নভাবে বিদ্যমান থাকে।"

প্রকৃত নির্ব্বাণ পরমপদে স্থিতির নামান্তর। উহাই নিরাকার-স্থিতি। ইহার পর একটি বিকাশের অবস্থা আছে, তাহাকে মা পরামুক্তি বলিতেন। নির্ব্বাণ নিরাকার, তাহার পূর্ব্বাবস্থায় সব কিছুই সাকার; কিন্তু পরামুক্তি হইলে বুঝা যায় নিরাকার ও সাকারে কোন দ্বন্দ্ব নাই। যাহা নিরাকার তাহাই অনন্ত সাকার রূপে প্রকাশমান, কোনই বিরোধ নাই। পূর্ব্ববর্ণিত বিকাশটি আয়ত্ত না হওয়া পর্য্যন্ত নিরাকার ও সাকার পৃথক্ পৃথক্ অবস্থান করে। উভয়ের সম্যগ্‌দর্শন হয় না। পরমপদে স্থিতি না হওয়া পর্য্যন্ত বিকাশ অবস্থা আসে না, এবং বিকাশ না আসা পর্য্যন্ত পরম সাম্যের উপলব্ধি হয় না।

মা একদিন বলিয়াছিলেন, "জগৎ আর নাই, কোনদিকেই কিছু দেখিতে পাই না, সেই এক ছাড়া। যেদিকে তাকাই, দেখি সেই আছে। ঘর, দ্বার, লোকজন কিছুই দেখি না। জগৎ সত্যই নাই—এক ছাড়া আর কিছু ভাসে না, তবে বক্র দৃষ্টি করিয়া দেখিলে সবই আছে। আসল কথা এই—সবই আছে—জগৎ আছে, আমিই জগৎ ছাড়িয়া উঠিয়াছি অথচ তোমাদের সঙ্গে কথা বলিতেছি। ইহা দেহে

থাকিলে আবশ্যক, তাই হয়। তাই বলিতে হয়, জগতের অতীত হইয়াও জগতে থাকা।”

মার ভক্তটির কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। সে বিশেষ অনুগ্রহ লাভ করিয়াছিল। তাহার ফলে সে সাধনায় দ্রুতগতিতে উন্নতির পথে আরোহণ করিতেছিল। শুধু মায়ের কৃপা পাইয়াই সে তৃপ্ত হয় নাই, কঠোর পরিশ্রম সহকারে সে ঐ কৃপার যোগ্যতা অর্জ্জন করিবার চেষ্টা করিত এবং উহা যে অনেকাংশে অর্জ্জন করিয়াছিল তাহা তাহার জীবনের পরবর্ত্তী ধারা হইতে বুঝিতে পারা যায়। ৺কাশীধামে উত্তরবাহিনী গঙ্গার তটে পাঁড়ে ঘাট নামক স্থানে একটি নিভৃত প্রকোষ্ঠে সে দ্বার রুদ্ধ করিয়া অহোরাত্র বসিয়া থাকিত। কেবল আহার-নিদ্রা প্রভৃতি অত্যাবশ্যকীয় দৈহিক কর্ত্তব্যের অনুরোধে কতকটা সময় সে বাহিরে থাকিত। দীর্ঘকাল সাধনার ফলে পর পর অনেক অনুভূতি সে প্রাপ্ত হইয়াছিল। এমনকি, তাহার জীবনের সমগ্র ধারাটি পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছিল। সে মাঝে মাঝে আমার বাড়ীতে আসিয়া আমার সঙ্গে দেখা করিত এবং কিছুক্ষণ একান্তে বসিয়া তাহার ব্যক্তিগত উপলব্ধির বিষয় আলোচনা করিত। এইভাবে তাহার নিজের ক্রমবিকাশের ধারা আমি জানিতে পারিয়াছিলাম। ইহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় সাধারণের বোধগম্য ভাষাতে যথাসম্ভব সরল করিয়া নীচে দেওয়া হইল।

মূলাধার চক্রেই কুণ্ডলিনীর জাগরণ আরম্ভ হয়। ব্যোমতত্ত্বের কেন্দ্র বিশুদ্ধ চক্রে উহা অনেকটা পূর্ণ হয়। কুণ্ডলিনী তাঁহার দিব্যস্বরূপে নিজের দেহদ্বারা ব্রহ্মপথ রুদ্ধ করিয়া নিদ্রিত রহিয়াছেন। তিনি পথ ছাড়িয়া না দিলে ঐ পথে প্রবেশ করিবার উপায় নাই। কিন্তু তাঁহাকে না জাগাইতে পারিলে, তাঁহার পক্ষে পথ ছাড়িয়া দেওয়ার সম্ভাবনা নাই। এই জন্য সর্ব্বপ্রথম তাঁহাকেই জাগাইবার চেষ্টা করিতে হয়। ব্যোমতত্ত্বে যেমন শক্তির জাগরণ অনেকটা পূর্ণ হয়, তদ্রূপ ঐখানেই

আত্মার জাগরণ আরব্ধ হয়। আত্মার সাতটি ভাব আছে। এইগুলি আত্মার ক্রমিক জাগরণের অবস্থার সূচক। এই সাতটির মধ্যে যেটি অন্তিম ভাব, তাহার নাম জ্ঞান-আত্মা। আত্মা জাগ্রত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই শিবরূপে প্রকাশিত হয়। সর্ব্বপ্রথম শুধু শিবেরই দর্শন হয়, পূর্ব্বোক্ত জাগ্রত শক্তির দর্শন হয় না। কিন্তু তাহার পর শিব-শক্তির যুগলরূপ দর্শন হয়। তখন বুঝা যায়—শিব ছাড়া শক্তি নাই, শক্তি ছাড়া শিব নাই। এই যুগলরূপ দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে উপর হইতে একটি জ্যোতির মত জিনিষ নামিয়া আসে—ঐ যুগলরূপ দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে ঐ জ্যোতিরও দর্শন হইয়া থাকে। ক্রমশঃ ঐ জ্যোতিটি উজ্জ্বল হইয়া উঠে। সঙ্গে সঙ্গে শিব ও শক্তিও প্রকাশিত থাকেন। ধীরে ধীরে ঐ জ্যোতিটি যেন ঘনীভূত হইয়া সাকারত্ব প্রাপ্ত হয়। অন্তে উহা সাধকের নিজের আকার ধারণ করে। এই সময়ে শিব-শক্তির আকার আর থাকে না। একমাত্র নিজের আকারই বিদ্যমান থাকে। ইহারই নাম আত্ম-দর্শন। এই অবস্থা লাভ হইলে, নিজের দেহের নড়াচড়া অথবা সঞ্চালন হইলে ঐ আত্মার নড়াচড়া বা সঞ্চালন হইতেছে, এরূপ দৃষ্টিগোচর হয়। ক্রিয়া একই, কিন্তু মনে হয়, উহা দুই স্থানে একই সময়ে দৃষ্টিগোচর হইতেছে। আজ্ঞাচক্রে এই মিলনের আভাস পাওয়া যায়। ইহারই পূর্ণতা মহামিলন, যাহা সহস্রারে সংঘটিত হয়। ক্রমশঃ ঐ দেহে ও আত্মায় নানাপ্রকার লীলা ফুটিয়া উঠে। প্রথমে এই সকল লীলা সাময়িকভাবে আবির্ভূত হয়, পরে উহা স্থায়ী হয়। এই প্রক্রিয়া নিরন্তর হইতেছে বলিয়া ইহাকে নিত্যলীলা বলিয়া বর্ণনা করা হয়। নিত্যলীলার কেন্দ্র বৈকুণ্ঠ হইতে গোলোক পর্য্যন্ত। ইহা ব্রহ্মময় হইলেও, বাস্তবিক পক্ষে ব্রহ্ম নহে। নিত্যলীলার পর ব্রহ্মাবস্থা। মিলমিশ্রণ হইতেই এই অবস্থার আরম্ভ বলা চলে। এই সময় সাধকের অন্তঃকরণে আমি-তুমি ভাব কাটিয়া গিয়া আমি-আমি ভাবের প্রতিষ্ঠা হয়। তখন আনন্দ-সত্তা যাহা নিত্যলীলাতে প্রতিষ্ঠিত তাহা চিৎসত্তার সঙ্গে যোগযুক্ত থাকে।

তখন চিৎই প্রধান এবং আনন্দ তাহার অন্তর্গত। মাঝে মাঝে আনন্দ অথবা লীলা ফুটিয়া বাহির হয়। দেহ থাকা পর্য্যন্ত ইহাই স্বাভাবিক। কারণ, দেহে থাকিয়া চিদ্‌ব্রহ্মে স্থিতি-লাভ ঘটে না। কিন্তু যদি দেহে থাকিতেই চিৎকে সতে যুক্ত করার কৌশল আয়ত্ত করা যায়, যাহার প্রভাবে চিৎ সতের অন্তর্গতভাবে থাকিতে পারে, তাহা হইলে দেহান্তে সদ্‌ব্রহ্মে স্থিতি হইতে পারে। নতুবা চিদ্‌ব্রহ্মে স্থিতি অবশ্যম্ভাবী। কারণ দেহ নিবৃত্ত হইলে, আর অগ্রসর হওয়ার কোন উপায় নাই। এই চিৎপ্রতিষ্ঠাও লীলার অন্তর্গত। ইহার পরাবস্থা লীলাতীত। এই অবস্থায় পৃথক্‌ভাবে ধ্বনি হয় না, নিজের মুখেই ধ্বনি হয় এবং নিজেই শ্রবণ করেন।

অবস্থাগুলি এই প্রকার—(ক) লীলানিম্ন, (খ) লীলার অন্তর্গত। ইহার দুইটি অবান্তর ভেদ আছে—একটি আনন্দপ্রধান এবং অপরটি চিৎপ্রধান। চিৎপ্রধান অবস্থাটি আনন্দপ্রধান অবস্থা হইতে উন্নত। ইহারই নাম অন্তর্দ্রষ্টা। (গ) যেটি দ্রষ্টার অতীত অবস্থা, তাহার নাম লীলাতীত। (ঘ) যেটি তাহারও অতীত, তাহার নাম লীলাতীতাতীত। এই চারিটি অবস্থাই ব্রহ্মের মধ্যে। এইগুলি পূর্ণতারই ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা। লীলাতীতাতীত অতি দুর্লভ। লীলাতীত দ্রষ্টা চিৎ ও সতের মধ্যবর্ত্তী দশা। এই অবস্থায় কখনো চিদ্‌ভাব থাকে না, একমাত্র সদ্‌ভাব থাকে। আবার কখন কখন উহা ফুটিয়া উঠে। যেটি লীলাতীতাতীত ভাব, সেইটি প্রশান্ত সত্তা, উহা নিস্তরঙ্গ। লীলান্তর্গতের যেটি আনন্দপ্রধান দিক্, সেই দিকে লীলারসের আস্বাদন হয়। ঐ অসীম আনন্দের তরঙ্গ হইতে মুক্ত হওয়া অত্যন্ত কঠিন। অনেক বড় বড় ভক্ত ঐখানেই স্থিতি লইয়াছেন।

ভক্তটি যে অবস্থাটিকে আত্মদর্শন বলিয়াছে, তাহা প্রাপ্ত হওয়ার পর দেহান্ত হইলে শিবত্ব-লাভ হয়। অবশ্য ইহা নিম্নস্তরের। শিবত্বেরও নানা প্রকার ভেদ আছে ; কারণ আত্মদর্শনের পরিপক্কতা সকল ক্ষেত্রে সমান হয় না। নিম্নতম শিবত্ব জন্ম-মৃত্যু-চক্র হইতে

উত্তীর্ণ, কিন্তু চৈতন্যহীন। তবে এটিও কৃপারাজ্যের অন্তর্গত। সাধারণতঃ এই অবস্থা অতিক্রম করা অত্যন্ত কঠিন; তবে কোন দেহধারী জীব ঐ পথ ভেদ করিয়া যাওয়ার সময়ে ঈশ্বর-কৃপায় ঐ অচেতন শিব বুঝিতে পারে ও অচৈতন্য অবস্থা হইতে জাগিয়া উঠে। সঙ্গ পাইলে বোধ হয় উত্তীর্ণ হইয়া যাইতে সমর্থ হয়। ইহার উর্দ্ধতন অবস্থাতে চৈতন্য থাকে। তবে তাহার মধ্যেও অবান্তর ভেদ আছে। মহামিলন পর্য্যন্ত সীমার গণ্ডী আছে, তাহার পর কোন গণ্ডী নাই।

পূর্ব্বে যাহা বলা হইল, তাহা হইতে বুঝা যাইবে যে, মার অনুভূতির ক্রম হইতে ভক্তটির অনুভূতিক্রমে কোন কোন অংশে পার্থক্য আছে। এইরূপ শ্রীকৃষ্ণা-মার অনুভূতিক্রম আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, উহাতেও কোন কোন অংশে পার্থক্য আছে। অথচ উক্ত ভক্ত ও কৃষ্ণা-মা উভয়েই সিদ্ধিমাতাজীর নিকট শক্তিপ্রাপ্ত হইয়া কুণ্ডলিনীর জাগরণ অনুভবপূর্ব্বক সাধনপথে অগ্রসর হইয়াছিলেন। গুরুদত্ত শক্তি সুপ্তকুণ্ডলিনীকে জাগাইয়া দেয়, তাহার পর যাহার যেমন ব্যক্তিগত প্রকৃতি তাহার বিকাশ তদনুরূপ মার্গেই হইয়া থাকে। এইজন্য গুরুশিষ্য সর্ব্বপ্রকারে একই অনুভূতিক্রম প্রাপ্ত হয় না।

শ্রীকৃষ্ণা-মার অনুভূতির বিশ্লেষণ করিলে, দেখিতে পাই যে, তিনি কুণ্ডলিনীর জাগরণ হইতেই আধ্যাত্মিক উন্নতির ক্রমিক বিকাশ অনুভব করিয়াছেন। গুরুকৃপা ও অনুরাগবশতঃ নাভিগুহাতে সুপ্তকুণ্ডলিনী প্রবুদ্ধ হইয়া ক্রমে উর্দ্ধে উত্থিত হয়। এই সময়ে তিনি নানাপ্রকার দেবদেবী, মহাজন এবং অন্যান্য দৃশ্য দর্শন করিয়াছিলেন। তাহার পর অন্তশ্চক্ষু উন্মীলিত হইলে, সূর্য্যের সঙ্গে নিজের মিলন অনুভব করেন। ইহার পর মস্তকে শিব-শক্তির অধিষ্ঠান হয়, তখন ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে হইতে সহস্রার ভেদ করিয়া পরে সাক্ষাৎকার লাভ করেন। তখন গুরুশিষ্যের ভেদ বিলীন হইয়া যায়; আত্মাকে জ্যোতিস্বরূপ অনুভব হয় এবং এই অনুভবের ক্রমে নীলজ্যোতিঃ

হইতে আরম্ভ করিয়া ব্যাপক জ্যোতিঃ পর্য্যন্ত অনুভব গোচর হয়। ইহার পর এমন একটি অবস্থার উদয় হয়, যখন কোন প্রকার দৃশ্য থাকে না, এমনকি জ্যোতিও থাকে না। তখন আলো ও অন্ধকার থাকে না, সুখ ও দুঃখের বোধ থাকে না এবং স্তুতি ও নিন্দা সমান বলিয়া প্রতীত হয়। তখন মহা-চৈতন্যের উদয়ে নিদ্রা ও জাগরণ এক প্রকার মনে হয় এবং বাসনা কামনা রহিত হয়। তখন কোন প্রকার কম্পন থাকে না এবং শান্তি ও নিবৃত্তি পূর্ণরূপে বিরাজ করে। অতি মধুর প্রণবের ঝঙ্কার দিব্য ধামের যাত্রীকে আকুল করিয়া তোলে। এই পর্য্যন্ত সাধনের পথ অত্যন্ত দুর্গম।

মহাশূন্যের পর সত্যজগৎ আরব্ধ হয়। সত্যরাজ্যে চলার পথ অপেক্ষাকৃত সুগম। পরিপূর্ণ পরমপদের সন্ধান এই সত্যরাজ্য হইতেই পাওয়া যায়। মহাশূন্যে জ্যোতিঃ থাকে না, ইহা বলা হইয়াছে। মহাশূন্যের পূর্ব্বে জ্যোতিঃ আছে এবং মহাশূন্যের পরেও জ্যোতিঃ আছে; কিন্তু উভয় জ্যোতিঃ পরস্পর ভিন্ন। এই জ্যোতিঃ ভগবানের চিন্ময়রূপ হইতে অভিন্ন। ইহাই মহাকারণ এবং বিশ্রামের পরমস্থান। জীব স্বধাম অন্বেষণ করিতে করিতে এই পর্য্যন্ত আসিয়াই শান্তি লাভ করে, ইহা অদ্বৈত সত্য। দেহ থাকিতে ঠিক ঠিক এই অবস্থা না পাইলেও, ইহার আভাস পাওয়া যায়। তাহারই নাম মিলমিশ্রণ। এই অবস্থায় এক অখণ্ড জ্যোতিই থাকে, কিন্তু দেহ থাকা পর্য্যন্ত ইহা আভাসমাত্র। তাই ভিতরে অখণ্ড জ্যোতিঃ থাকে এবং বাহিরে ভগবানের মহিমা ও গৌরব প্রকাশিত হয়।

ভ্রমর-গুহাভেদ, লিঙ্গশরীর-ত্যাগ, বিন্দুরূপে পরিণত অলিঙ্গশরীরে স্থিতি, বিন্দু-শরীর ত্যাগ এবং তাহার পর কারণ-শরীর ত্যাগ—ইহাই সাধনার ক্রম। ভ্রমর-গুহা হইতেই বিন্দুসুধা-ক্ষরণের আরম্ভ। শুদ্ধ জ্যোতির পর পরম জ্যোতিতে যাইয়া সাধনার শেষ হয়। পূর্ব্বে যাহা সম্মুখ-দৃষ্টি ছিল, পরম জ্যোতির স্থিতিতে তাহাই চারিদিকের ব্যাপক দৃষ্টিরূপে ফুটিয়া ওঠে। তখন মনবুদ্ধি শান্ত হয় এবং মহা-ইচ্ছা

আত্মপ্রকাশ করে। মহা-ইচ্ছা নির্ব্বিচার—তাহাতে অসম্ভবও সম্ভব হয়। যেখানে চিত্ত নাই, অথচ কার্য্য হয়, সেখানেই মহা-ইচ্ছা জানিতে হইবে। ইহা আনন্দের অতীত পরাশান্তির অবস্থা। তখন পরম পুরুষের সাক্ষাৎকার হয় ও মনের পরিবর্ত্তন ও পরামুক্তি-লাভ হইয়া আত্মসমর্পণ সিদ্ধ হয়। জগৎ ব্রহ্মময় প্রতীত হয়, ঐশ্বর্য্য ত্যাগ হইয়া পরাভক্তি ও মাধুর্য্যের বিকাশ হয়। মিলমিশ্রণের পূর্ণত্ব এই সময়েই প্রকাশিত হয়। দেহস্থিতিতে শুদ্ধ মন, বুদ্ধি ও শ্বাস পরম জ্যোতির সহিত অভিন্নরূপে স্থিত হয়। কখন কখন ক্ষণিকের জন্য পরমপদের প্রকাশ হয়। দেহান্তে পরমপদে স্থিতি-লাভ হয়।

মার পরমলক্ষ্য পরমপদ বলিয়াই আমরা তাঁহার শেষ সময়কার বাণী হইতে জানিতে পারিয়াছি। কিন্তু এই পরমপদ সম্বন্ধে সকলের ধারণা ঠিক এক প্রকার নহে। বৈদিক যুগে ঋষিগণের ধারণা ছিল যে বিষ্ণুর পরমপদকে সূরিগণ দিব্যচক্ষুর ন্যায় নিরন্তর দর্শন করিয়া থাকেন। এই ধারণা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, দিব্যসূরিগণ পরমপদ নিরন্তর অনিমেষ-দৃষ্টির সম্মুখে প্রকাশমান দেখিতে পাইতেন। উহাতে তাঁহারা প্রবেশ করিতেন, এরূপ কোন নিদর্শন বেদমন্ত্র হইতে জানা যায় না। কারণ 'সদাপশ্যন্তি' এই বাক্যাংশ দ্বারা অনবচ্ছিন্ন দর্শনই বুঝায়, প্রবেশ বুঝায় না। ইহার কারণ এই হইতে পারে যে, উহাতে প্রবিষ্ট হইলে, নিজের সত্তা লুপ্ত হইয়া যাইবার আশঙ্কা থাকে। প্রাচীন বৈষ্ণবগণ, বিশেষতঃ শ্রীবৈষ্ণবগণ, পরমপদের মহিমা কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা পরমপদ বলিতে পরব্যোমকে বুঝিয়া থাকেন। রামানুজীয় বৈষ্ণবদের ন্যায় পরবর্ত্তী বৈষ্ণব আচার্য্যগণও পরব্যোমের মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন। অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড ভগবানের মায়া, প্রকৃতি অথবা অবিদ্যারূপ অংশে বিদ্যমান রহিয়াছে। এই পর্য্যন্তই ত্রিগুণের খেলা এবং জড়ভাবের প্রভাব লক্ষিত হয়। ইহার পর বিরজা নদী অথবা কারণ সলিল

বিরাজ করে। তাহার উর্দ্ধে পরব্যোম বা চিন্ময় আকাশ, যাহার ভিতরে ভগবানের নিত্যধাম বিরাজমান।

বেদের বহু স্থানে পরব্যোম অথবা পরমব্যোম শব্দের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। তদ্রূপ বিষ্ণুর পরমপদ অথা শুধু পরমপদ বা পরমধাম, এরূপ নির্দ্দেশও বেদে পরবর্ত্তী আর্য্যসাহিত্যে বহু স্থানে দৃষ্ট হয়। বৈষ্ণবগণের বৈকুণ্ঠ প্রভৃতি ভগবদ-ধাম পরব্যোমেরই অন্তর্গত। উহাতে প্রবেশও যে না হয় এমন নহে, কারণ গোলোক, বৈকুণ্ঠ, সাকেত প্রভৃতি সর্ব্বত্রই অন্তরঙ্গ ভক্তগণের প্রবেশের কথা পাওয়া যায়। গীতাতে 'বিশতে তদনন্তরম্' এই স্থানে প্রবেশের কথা স্পষ্টই আছে। গীতাতে অন্যত্রও উল্লিখিত হইয়াছে যে, সেই পরমধামে গেলে, আর সেখান হইতে কেহ ফেরে না। ইহাও প্রবেশেরই অনুকূল বাক্য। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত বিবরণ হইতে বুঝা যাইতেছে যে, পরমপদ অথবা পরমব্যোমে প্রবিষ্ট হওয়া এবং দূর হইতে উহাকে নির্নিমেষ নয়নে নিরন্তর নিরীক্ষণ করা উভয়ই প্রাচীন কালে প্রসিদ্ধ ছিল। অবশ্য অধিকারের তারতম্য অনুসারে এবং রুচির বৈচিত্র্যবশতঃ বিভিন্ন সাধকের বিভিন্ন প্রকার স্থিতিলাভ হইত।

মা অনেক সময়ে পরমপদকে ব্যোম-শব্দে নির্দ্দেশ করিতেন, ইহা আমার মনে আছে। তবে উহাতে প্রবিষ্ট হওয়া যে অত্যন্ত দুরূহ, তাহা তিনি বলিতেন। দেহ থাকিতে পরমপদে ঠিক ঠিক প্রবেশ হয় না—পরমপদ দর্শন হয় এবং পরমপদের স্পর্শ হয়, কিন্তু উহাতে ঠিক প্রবেশ হয় না; ইহাই তাঁহার মত ছিল। একমাত্র শুকদেব ভিন্ন আর কেহ সেখানে প্রবেশ করিয়াছেন, এরূপ কথা তাঁহার নিকট শুনি নাই।

মহাশূন্য-ভেদ সম্বন্ধে মা বলিতেন যে, ইহা না হইলে প্রকৃত সত্য-স্বরূপে স্থিতি লাভ করা যায় না। এই সম্বন্ধে অন্যান্য মহাজনগণের মতও প্রায় একরূপ। সন্তগণ শূন্য এবং মহাশূন্য উভয়েরই ভেদ আবশ্যক, এরূপ বলিয়াছেন। শূন্য ভেদ করিতে না পারিলে, পিণ্ড

হইতে ব্রহ্মাণ্ডে সঞ্চরণ করা যায় না এবং মহাশূন্য ভেদ করিতে না পারিলে, ব্রহ্মাণ্ড হইতে বিশুদ্ধ চৈতন্যময় সত্যরাজ্যে প্রবেশ করা যায় না। মহাশূন্য-ভেদের পর ভ্রমর-গুহা অতিক্রম করিয়া সত্যলোকে অবস্থান করিতে হয়। ইহা সন্তদের মধ্যে সকলেই অনুভব করিয়াছিলেন। মার মুখে ভ্রমর-গুহার কথা শুনিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণা-মা মহাশূন্যের পর ভ্রমর-গুহা এবং তাহার পর সত্যস্বরূপ আত্মার অনুভব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সন্তগণ বলেন, ব্রহ্মাণ্ডের পরমসীমা পর্য্যন্ত মন ও জড়ভাবের আভাস লক্ষিত হয়। মহাশূন্যের অতিক্রম হইলে, উভয় হইতেই মুক্তি-লাভ হয়। চৈতন্যময় সত্যরাজ্যে মন ও জড় থাকে না অথবা চিরদিনের জন্য নিষ্ক্রিয় হইয়া যায়। মন অতিক্রম করিতে না পারিলে কল্পনার জাল হইতে উদ্ধার পাওয়ার অন্য কোন উপায় নাই, কারণ ক্লিষ্ট মনের বিকল্পসমূহই ইন্দ্রজাল-রূপে শুদ্ধ আত্মাকে ঘেরিয়া তাহাকে পাশবদ্ধ করিয়া থাকে।

মা ব্রহ্মাবস্থা-লাভের পূর্বে এবং মহামিলনের পরে মিলমিশ্রণ অবস্থায় লীলাদর্শন করিয়াছিলেন, ব্রহ্মাবস্থার পর আর লীলার আস্বাদন পান নাই। তখন একমাত্র ব্রহ্মসত্তারই গভীর ও গভীরতর স্তরসমূহে তিনি ক্রমশঃ প্রবিষ্ট হইতে ছিলেন। ইহা এক হিসাবে লীলার অতীত অবস্থা বলিতে হইবে। কিন্তু বৈষ্ণব আচার্য্যগণ যে নিত্যলীলার বর্ণনা করিয়া থাকেন, তাহার সঙ্গে মার বর্ণিত লীলার কোন কোন অংশে পার্থক্য আছে। লীলা স্বরূপশক্তির খেলা, তাহাতে সন্ধিনী, সংবিৎ ও হ্লাদিনী, এই ত্রিবিধ শক্তিরই ব্যাপার আছে। হ্লাদিনী শক্তির সারাংশই মহাভাব। ভক্তি প্রভৃতি এই হ্লাদিনী শক্তিরই বিভিন্ন বৃত্তির নাম। ভগবৎ স্বরূপ ও তাঁহার স্বরূপ-শক্তির মধ্যে পরস্পর ক্রীড়া চলিতেছে, ইহার ফলে শক্তির আশ্রয় ও বিষয় উভয় স্থানেই রসাস্বাদন হইয়া থাকে। স্বরূপশক্তির, বিশেষতঃ হ্লাদিনী শক্তির, আশ্রয় ভগবান্ এবং ঐ শক্তি অংশরূপে

নিক্ষিপ্ত হওয়ার ফলে উহার দ্বারা অনুগৃহীত জীব উহার আশ্রয় হয়। তখন উহার বিষয় হয় স্বয়ং ভগবান্। এইরূপে ভক্ত ও ভগবানে অনাদিকাল হইতে অনন্ত প্রকার রসাস্বাদনের খেলা চলিতেছে। এই লীলাতে ভগবান রস আস্বাদন করেন এবং ভক্তকে করান এবং ভক্তও রসাস্বাদন করে এবং ভগবানকে করায়। এই আস্বাদনের প্রবাহ অনাদিকাল হইতে প্রবর্ত্তিত হইয়া অনন্তকাল পর্য্যন্ত চলিবে। ইহার আরম্ভ এবং অবসান কিছুরই নির্দ্দেশ করা যায় না। ইহা হইতে ঊর্দ্ধে এমন কোন অবস্থা নাই, যাহা এই লীলা অতিক্রম করিয়া জীব নিজের পুরুষার্থ-রূপে প্রাপ্ত হইতে পারে। নিত্য আবর্ত্তনশীল এই লীলার যেটি মধ্যবিন্দু তাহাকে লীলাতীত বলিয়া বর্ণনা করা যাইতে পারে, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে উহাও নিত্যলীলার অন্তর্গত। এইভাবে বিচার করিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে, মার বর্ণিত মিলমিশ্রণ অবস্থা ইহা হইতে অনেকটা পৃথক্। মিলমিশ্রণ অবস্থার পর অনেকটা অগ্রসর হইলে, ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থিতি হয়; কিন্তু বৈষ্ণব লীলারসিকগণ বলেন যে, কূটস্থ অথবা অক্ষরব্রহ্ম লীলাময় পুরুষোত্তমের ধাম মাত্র। অর্থাৎ ব্রহ্মাবস্থার মধ্য দিয়া স্বরূপশক্তিসম্পন্ন ভগবৎ-অবস্থায় উপনীত না হইলে, নিত্যলীলায় প্রবেশ করা যায় না।

পূর্ব্বোক্ত বিবরণ হইতে মনে হয়—অনন্ত জাগ্রৎ শক্তিসমূহের আশ্রয়-তত্ত্ব এবং সুপ্ত অন্তর্লীন শক্তি-তত্ত্ব—এই দুইটি যদিও একই মহাতত্ত্বের অবস্থাভেদ মাত্র, তথাপি এই অবস্থাগত বৈশিষ্ট্য উপেক্ষা করা যায় না। মার অনুভূত সাধন-ধারাতে শক্তির ক্রিয়ার পরাবস্থায় ব্রহ্মভাবের উদয় পরিদৃষ্ট হয়, কিন্তু বৈষ্ণবগণের অনুসৃত বিশিষ্ট সাধন-ধারাতে অব্যক্ত-শক্তি ব্রহ্মাবস্থা হইতে অভিব্যক্ত-শক্তি অনন্ত লীলাময় ভগবৎ-অবস্থায় বৈশিষ্ট্য আছে। এই সম্বন্ধে অধিক আলোচনা অনাবশ্যক। তবে ইহা মনে রাখিতে হইবে যে, মা ব্রহ্মাবস্থাকে পরমলক্ষ্য বলিয়া গ্রহণ করেন নাই। তাঁহার দৃষ্টিতে পরমলক্ষ্য ছিল

পরমপদ, যাহা মহাশূন্য অতিক্রম করার পর পরিপুর্ণ ব্রহ্মাবস্থাতে অবস্থিত হইয়া তাঁহাকে সাক্ষাৎকার করিতে হইয়াছিল।

আর একটি বিশেষভাবে প্রণিধানের যোগ্য বলিয়া মনে হইতেছে —মা জ্ঞান ও চৈতন্যের মধ্যে অতি সূক্ষ্ম একটি রেখাপাত করিয়াছেন, যদিও তিনি বহুবার স্পষ্টই দৃঢ়তার সহিত বলিয়াছেন যে, উভয়ের স্বরূপে কোন ভেদ নাই। অর্থাৎ স্বরূপের দিক্ হইতে জ্ঞান ও চৈতন্য একই বস্তু, তথাপি অভিব্যক্তির দিক্ হইতে উভয়ের মধ্যে কিঞ্চিৎ ভেদও তিনি স্বীকার করিয়াছেন। তাহা না হইলে, তিনি চৈতন্যহীন জ্ঞানকে হেয় বলিয়া মনে করিতেন না। এই স্থানে প্রাচীন অদ্বৈত আগমে শিব-শক্তির যুগ্ম স্বরূপের কথা মনে পড়ে। শিব ও শক্তি উভরই চিৎস্বরূপ, তথাপি উভয়ে কিঞ্চিৎ পার্থক্যও যে না আছে তাহা নহে। কারণ শিব বিশুদ্ধ প্রকাশময়—তাহাতে স্বাতন্ত্র্য নাই, উল্লাস নাই, অহং-ভাবের বিমর্শ নাই অর্থাৎ এই অনন্ত প্রকাশে বিশুদ্ধ আমি-ভাবের উদয় হয় না; ইহা শক্তিবিবর্জ্জিত শিব-স্বরূপ। কিন্তু ইহা এক প্রকার শবের অবস্থা; কারণ এই স্থলে প্রকাশ শক্তিহীন বলিয়া স্বয়ংপ্রকাশ না হওয়ার দরুণ অপ্রকাশ-স্বরূপ। বিমর্শ অথবা শক্তির যোগ না থাকিলে, প্রকাশ অপ্রকাশের মত হইয়া পড়ে। মা যাহাকে চৈতন্য বলিতেন এবং জ্ঞানের সহিত যাহার স্ফুরণ হইলে আনন্দ বা উল্লাস ফুটিয়া উঠে, তাহাই মহাশক্তি বা বিমর্শের ক্রিয়া। ইহাতে বুঝা যায় যে, মার চরম অনুভূতি অনেকটা অদ্বৈত শৈবাগমের সিদ্ধান্তের অনুরূপ। মা বলিতেন যে, চরম অবস্থাতে আমি, জ্যোতিঃ ও অনিয়ম, এই তিনটি অভিন্নরূপে বর্ত্তমান থাকে। এই স্থলে জ্যোতিটি অখণ্ড প্রকাশ এবং আমি ও অনিয়ম এই দুইটি স্বাতন্ত্র্যময় আমিত্বের উল্লাস বুঝিতে হইবে।

কায়াভেদী বাণী মুলগ্রন্থ মধ্যে সম্পূর্ণভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার প্রকাশন কাল ১৩৪১ সালের ১৪ই জ্যৈষ্ঠ হইতে ঐ সালের ২২শে অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত। ঐ সময়ের মধ্যে শুধু যে বাণীই মার

কায়া-ভেদ করিয়া উঠিয়াছিল তাহা নহে, বিভিন্ন মন্ত্র ও বীজও নির্গত হইয়াছিল। এইগুলি সবই সত্যে জাগ্রৎ। তাই ইহাদের শক্তি অত্যন্ত অধিক। গ্রহণের উপযুক্ত আধার না পাইলে, এগুলি হিত সাধন না করিয়া বরং ক্ষতিরই কারণ হইয়া থাকে। ক্রিয়া, বিশ্বাস ও ভক্তি, এই তিনটি গুণের দ্বারাই আধার যোগ্যতা লাভ করে। অর্থাৎ যে আধার ভগবানে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করিয়াছে, তাহাই যোগ্য আধার। এই জন্য ভগবানে মন ও প্রাণ অর্পণ করিতে না পারিলে, পূর্ণ সত্যলাভের আশা দূরাশা মাত্র।

মার দেহে বিষ্ণু-পাদপদ্মও প্রকাশিত হইয়াছিল। বিষ্ণুর পরমপদ অতি দুর্গম ও সিদ্ধ মহাপুরুষগণের দুরারাধ্য বস্তু। দিব্যজ্ঞান-সম্পন্ন মহাপুরুষগণও ইহাতে প্রবেশ করিতে না পারিয়া দূর হইতেই ইহাকে দর্শন করিয়া থাকেন। মার দেহে যে বিষ্ণুর পাদপদ্ম শোভিত হইত, তাহা পূর্ব্বোক্ত পদেরই আভাস মাত্র। উহা স্বভাবতঃ গোলোকে নিত্য প্রকাশমান থাকে, কিন্তু জগতের মলিন জীবকে উদ্ধার করিবার জন্য উহা মার কায়া ভেদ করিয়া প্রকাশিত হইয়াছিল। উহার শক্তি এতই অসাধারণ যে, ধারণ করিতে পারিলে উহা সমগ্র বিশ্বকে উদ্ধার করিতে পারে।

যে মহাসত্য কায়াভেদী বাণীতে প্রকাশিত হইয়াছে, তদনুসারে পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞানের অবস্থাকে মিলমিশ্রণ নামে অভিহিত করা হইয়াছে এবং উহাই জাগতিক দৃষ্টিতে আধ্যাত্মিক সাধনার এক প্রকার চরম অবস্থা বলিলেও বলা যাইতে পারে। সাধনার বহু পথ জগতে প্রচারিত হইয়াছে, ইহা সত্য। কিন্তু প্রকৃত সত্য পথ কুণ্ডলিনীর জাগরণ না হইলে উন্মুক্ত হয় না। এমনকি উহার সন্ধানও পাওয়া যায় না। সত্য পথ আশ্রয় না করিয়া কেহই পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞানের অবস্থায় উপনীত হইতে পারিবেন, এরূপ সম্ভাবনা নাই। ব্রহ্মময় গোলোক-ধামের অধিষ্ঠাতা অদ্বিতীয় ভগবান। সেখানে যে সকল দেবতাগণ বিরাজ করেন, তাঁহারা সকলেই পূর্ণরূপে ব্রহ্মভাবে জাগ্রৎ। এই সকল

অদ্বৈত ভাবময় দেবগণ শ্রীভগবানের মহা ইচ্ছার অনুবর্ত্তী হইয়া জীবকে সত্য পথের গুপ্ত সন্ধান কৃপাপূর্ব্বক দিয়া থাকেন। ইহার ফলে জীবের অনাদি মোহনিদ্রা ভাঙ্গিয়া যায় এবং জীব জাগিয়া উঠে। অর্থাৎ কুণ্ডলিনী নিজে জাগ্রৎ হইয়া অনাদি নিদ্রা হইতে আত্মাকে জাগাইয়া তোলেন। কারণ কুণ্ডলিনী ব্যতীত আত্মার সুক্তিভঙ্গের অন্য কোন উপায় নাই। এই জন্য কুণ্ডলিনী-জাগরণকেই সত্য সাধনপথের প্রথম সোপান বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।

আত্মা জাগিয়া উঠিলে, শিবের নিদ্রারূপ মহাযোগ ভগ্ন হয়। তখন চিত্তের মলিনতা দূর হয়। কুণ্ডলিনী না জাগিলে এবং আত্মা প্রবুদ্ধ না হইলে, চিত্তশুদ্ধি সম্ভবপর হয় না। কুণ্ডলিনীর জাগরণ শিব-শক্তিরূপে ঘটিয়া থাকে। ইহার ফলে ক্রমশঃ মূলপ্রকৃতি-দর্শন, মহামিলন এবং আত্মদর্শন সঙ্ঘটিত হয়। মূলপ্রকৃতি প্রসন্ন না হইলে, প্রকৃত সত্যের সাধনারম্ভ হয় না। অশুদ্ধ চিত্তে সত্যদর্শন হয় না বলিয়া আত্মা জাগিবার পর সত্যদর্শনের আরম্ভ হয়। কুণ্ডলিনী এবং আত্মার সুপ্ত অবস্থায় যে সকল দর্শন হয়, সেগুলি স্বপ্নদর্শনের ন্যায় অসৎ। সত্যদর্শনের মূলে ভগবানের কৃপাদৃষ্টি এবং পূর্ণ সত্যের আকর্ষণ বিদ্যমান থাকে। সত্যের আকর্ষণ হইতেই সত্যদর্শন উৎপন্ন হয়। সত্যদর্শন এবং স্বপ্নবৎ অলীক দর্শন এক প্রকার নহে। অন্তরে সত্য প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্য্যন্ত সত্যদর্শনের ক্রিয়া চলিতে থাকে। কুণ্ডলিনী জাগার পর মহামিলন পর্য্যন্ত সাধনমার্গ অত্যন্ত দুর্গম। ঐ সময়ে অহঙ্কার, প্রলোভন এবং নানা প্রকার বিভীষিকা এই পথে অন্তরায়রূপে প্রকাশিত হয়। বুঝিতে হইবে যে, এইগুলি সবই পরীক্ষা। মহামিলনের পর এই সকল পরীক্ষা আর থাকে না এবং কুণ্ডলিনী জাগিবার পূর্ব্বেও থাকে না। হৃদয়ে মিথ্যা ভাবের কণামাত্র থাকা পর্য্যন্ত এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া যায় না। এই প্রসঙ্গে ইহা মনে রাখিতে হইবে যে, সাধকগণ সাধারণতঃ যে সকল দর্শন পাইয়া থাকেন, সেগুলি জীবকে মোহিত করিয়া রাখে—জীবকে ভগবানের

স্বরূপ দেখিতে দেয় না। কিন্তু ভগবানের কৃপাতে কুণ্ডলিনী জাগার পর আত্মা জাগিয়া উঠিয়া যে সকল দর্শন লাভ করে, তাহা বাহিরের দর্শন নহে। তাহাই সত্যদর্শন। তাহাতে যে মোহিত হয় না, সে ভগবানের স্বরূপ-দর্শন হইতে বঞ্চিত হয় না। উহার ফলে সত্যপ্রতিষ্ঠা হয়।

সত্যসাধন-পথে দুইটি ক্রমিক স্থিতি লক্ষিত হয়। তন্মধ্যে প্রথমটি আত্মদর্শন এবং দ্বিতীয়টি পূর্ণব্রহ্মজ্ঞান। আত্মদর্শন পর্য্যন্ত পথের কথা বলা হইল। কিন্তু আত্মদর্শন হইলেও, পূর্ণব্রহ্মে স্থিতিলাভের জন্য জাগ্রৎ ব্রহ্মমন্ত্র আবশ্যক হয়। আত্মদর্শনের জন্য যেমন শিব-শক্তি রূপে কুণ্ডলিনী জাগ্রৎ হইয়া মূল প্রকৃতি দর্শন এবং মহামিলনের ভিতর দিয়া অগ্রসর হয়, তদ্রূপ পূর্ণব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার-লাভের জন্য আত্মদর্শনের পর জাগ্রৎ ব্রহ্মমন্ত্র আবশ্যক হয়। শ্রীভগবানের পূর্ব্বোক্ত গোলোক-লীলার সহচর দেবতা সকল ব্রহ্মরূপ হইলেও, তাঁহাদের সহিত ব্রহ্মের কোন সম্বন্ধ নাই। ব্রহ্ম যেমন নামহীন, তেমনি সর্ব্বপ্রকার সম্বন্ধবিবর্জ্জিত। ব্রহ্মের একমাত্র বিকাশ ওঁ-কার। কিন্তু ওঁ-কার বাস্তবিক পক্ষে নাম নহে। এই সকল ব্রহ্মরূপী দেবতা অসংখ্য হইলেও, সকলেরই আত্মা এক ও অভিন্ন। একমাত্র পূর্ণব্রহ্মই সকল দেবতার আত্মা। বিকাশের দিক্ দিয়া লীলার বিচিত্র রসাস্বাদনের জন্য ভেদ লক্ষিত হয়। গোলোকের এই সকল দেবতা একই ব্রহ্মের অনন্তরূপ বলিয়া বিশাল আনন্দে মগ্ন হইয়া আছেন।

মার দেহে কখন কখন যে অসংখ্য পাদপদ্ম শোভা পাইত, সেগুলি সমস্তই দেবতাদের চরণ।

এই যে জাগ্রৎ মন্ত্রের কথা বলা হইল, তাহা একমাত্র ভগবৎকৃপা ভিন্ন প্রাপ্ত হওয়ার কোন উপায় নাই। আত্মদর্শনের সঙ্গে সঙ্গে অনাদি অন্ধকার কাটিয়া গেলেও, এই মন্ত্র-জাগরণ ব্যতিরেকে ব্রহ্মভাবের পূর্ণ রসাস্বাদন হয় না। নিজসত্তা ক্রমশঃ ভগবৎসত্তায় লীন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মানন্দের আস্বাদ আরব্ধ হয়। ইহার চরম বিকাশ বা পরিণতি মিলমিশ্রণ বা পূর্ণত্ব।

বিভিন্ন দেবতার সাহায্যে সত্যপথে অগ্রসর হইতে হয়। ইহাদের মধ্যে গণপতি, মহাকাল ও শক্তি প্রধান। গণপতিকে প্রসন্ন করিতে না পারিলে, শিব-শক্তিকে প্রসন্ন করা যায় না। তাই গণেশকে সিদ্ধিদাতা বলা হয়। কুণ্ডলিনী-জাগরণের পর মূল-প্রকৃতি দর্শন সম্পন্ন হইলে মহাকালের উপাসনা আবশ্যক হয়। ইহার পর মহাশক্তি ভক্তকে নানারূপে সাহায্য করিয়া থাকেন। মহাকালী, মহাসরস্বতী, মহালক্ষ্মী এবং সর্ব্বোপরি মহেশ্বরী—জগন্মাতার এই সকল রূপই ভক্তের সহায়ক। মহাকালী জাগিলে, হৃদয়ে ভজনের বেগ উৎপন্ন হয় এবং হৃদয় শ্মশানরূপে পরিণত হইতে থাকে। মহাসরস্বতী ভক্তকে পথের সন্ধান দেন। মহালক্ষ্মী ও মহেশ্বরীর অধিকার আরও উচ্চে। মহেশ্বরী সকলের শেষে ক্রিয়া করিয়া থাকেন।

সত্যধ্যান ও সত্যদর্শন কাহাকে বলে? জাগ্রৎ শিবশক্তির যুগল-ধ্যানকেই সত্যধ্যান বলে। এই ধ্যানের প্রভাবে বাহিরের আকর্ষণ কাটিয়া যায় ও চিত্ত অন্তর্মুখ হয়। দেবতা ও মন্ত্র উভয়ই জাগ্রৎ বলিয়া ইহাকে শ্রেষ্ঠ বলা হয়। প্রতি দেবতার অর্চ্চনাতে মানস পূজার সময়ে এই উপায় অবলম্বন করিতে পারিলে, দেবতা প্রসন্ন হন ও সাধকের পথে অন্তরায় হন না। এই ধ্যান ক্রমশঃ গাঢ় হইলে, দেবতার সত্যদর্শন লাভ হয়। তখন বাহিরের চেতনা লুপ্ত হয় ও ভিতরে অপূর্ব্ব আনন্দ ও শান্তির উদয় হয়। তখন সমাধি অবস্থার উদয় হয় ও ভক্তের নিকট ভগবান্ ভিন্ন অন্য কোন সত্তা থাকে না। ইহারই নাম চৈতন্য-সমাধি। ভগবানের জন্য প্রাণে সত্য ব্যাকুলতা না হইলে, এই সমাধি জন্মে না। এই অবস্থায় বাহিরের চিন্তা ও আকর্ষণ থাকে না বলিয়া ভগবান্ ভক্তের ভিতরে ঠিক ঠিক কার্য্য করিতে পারেন, যাহার ফলে ভক্ত চিন্তাহীন অবস্থায় উপনীত হইতে সমর্থ হয়। চৈতন্য-সমাধি পূর্ণ আনন্দের অবস্থা। কিন্তু ইহাও অপূর্ণ। তাই ইহা ভাঙ্গিয়া যায়। ইহার পর যে অবস্থার উদয় হয়, তাহাতে ভিতরে ও বাহিরে পূর্ণ চৈতন্যের সঙ্গে 'আমি'—'আমি' ভাব

বিদ্যমান থাকে। 'আমি'—'তুমি' ভাব চিরদিনের জন্য কাটিয়া যায়। এই অবস্থার পূর্ণ বিকাশ দেহাবস্থায় সম্ভবপর নহে। বস্তুতঃ, ইহাই পূর্ণব্রহ্মাবস্থার পূর্ব্বাভাস।

সত্যপথে চলিতে হইলে, কতকগুলি বিশেষ গুণ থাকা আবশ্যক। এই সকল গুণের মধ্যে শ্রদ্ধা, বিশ্বাস, ভক্তি, বৈরাগ্য ও প্রেম প্রধান। শ্রদ্ধা সকলের মূলস্বরূপ, এই জন্য অধ্যাত্মমার্গে প্রবিষ্ট হইতে হইলে, সর্ব্বপ্রথম ইহারই সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়। শ্রদ্ধার পর দ্বিতীয় প্রধান গুণ বিশ্বাস। বিশ্বাস ভিন্ন ভগবানের সন্ধান পাওয়া অসম্ভব। জীবের হৃদয় অসার বাসনাতে আচ্ছন্ন বলিয়া ভগবান্ পৃথিবীতে প্রকট থাকা সত্ত্বেও জগৎ তাঁহাকে ক্ষণেকের জন্য বিশ্বাস করিতে পারিতেছে না। বিশ্বাস করা অত্যন্ত কঠিন। একদিকে ভগবানের কৃপা এবং অপর দিকে নিজের প্রাক্তন সুকৃতি, এই উভয়ের যোগ না থাকিলে, বিশ্বাস জন্মে না। হৃদয়ে সত্য বিশ্বাস অঙ্কুরিত হইলে একমাত্র ভগবান্ ভিন্ন অন্য সব কিছুই অসার বলিয়া মনে হয়। বিশ্বাসের সঙ্গে ভক্তির যোগ হইলে হৃদয়ের আরও উচ্চ অবস্থা প্রকাশিত হয়। মনে বিশ্বাস না থাকিলে, ভক্তির দ্বারা কোন কার্য্য সিদ্ধ হয় না। পরমানন্দস্বরূপ ভগবান্‌কে সার বস্তু বলিয়া বোধ থাকা চাই। তাঁহার অভাবে জীবন অসহ্য বোধ হওয়া চাই। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার উপর পূর্ণ নির্ভর-ভাব থাকা চাই—ইহারই নাম ভক্তি। ভক্তির উদয় হইলে, বাহিরের কোনই আকর্ষণ মনকে চঞ্চল করিতে পারে না। এইভাবে ক্রমশঃ বাহিরের আকর্ষণ কাটিয়া গেলে, অর্থাৎ ভক্তির উদয়ের পর, হৃদয়ে বৈরাগ্যের উদয় হয়। এই অবস্থায় বাহিরের আকর্ষণ তো থাকেই না—ভগবান্‌কেই একমাত্র আপন বলিয়া মনে হয়। অন্য কোনও বিষয় ভাল লাগে না। তখন ভক্ত ভগবানের নানারূপ দর্শন করিয়া থাকেন। এই প্রকারে ভক্তি ও বৈরাগ্যের সহিত প্রেম প্রবল হইলে, সব সময়েই চিত্তে ভগবানের জন্য তরঙ্গ খেলিতে থাকে, একটা অব্যক্ত ব্যথা সব সময়ে চিত্তে জাগিয়া থাকে। অহর্নিশি চক্ষুঃ হইতে

প্রেমাশ্রু ঝরিতে থাকে। ইহার ফলে জীবের পূর্ব্ব-সঞ্চিত দুষ্কৃতি, অপরাধ ও প্রতিবন্ধক সব কাটিয়া যায়। হৃদয় গভীর জ্বালায় জ্বলিতে থাকে, নয়নে জলের ধারা বহিতে থাকে ও বুক ফাটিয়া যায়। সত্যের প্রকৃত সন্ধান পাওয়ার জন্য ইহাই আবশ্যক। কারণ নির্ম্মল না হইলে, সত্যের তীব্র তেজঃ সহ্য করা যায় না। মলিনতা কাটাইবার একমাত্র উপায় প্রেমের বিকাশ। মলিনতা দূর হইলে হৃদয় শ্মশানরূপে পরিণত হয়।

ইহা হইল এক দিক্‌কার কথা। অন্য দিক্ হইতে দেখিতে গেলে, সত্যলাভ করিতে হইলে মনকে নিজের আয়ত্ত করা একান্ত আবশ্যক। কারণ অবশীভূত মনই শত্রু। পূর্ব্বোক্ত প্রকারে প্রেমের উদয় হইলে এবং ভাব গভীর হইলে, মন শান্ত হয়। তখন এই স্থির মনই সত্যলাভের পথে পরম মিত্রের কাজ করে। প্রাণের ব্যাকুলতা ও মনের সাহায্য, ইহাই সত্য পথের সহায়। এই উভয়েরই মূল ভগবানের কৃপা। মন শান্ত না হওয়া পর্য্যন্ত তাহার সঙ্গে নিরন্তর সংঘর্ষে লাগিয়া থাকিতে হয়। ইহারই নাম সাধন-সমর। এই সময়ে প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবে অসংখ্য রিপু আক্রমণ করিতে থাকে। ইহারা সকলে স্বেচ্ছাচারী মনের চর। ভগবান্‌কে স্মরণ করা, প্রেমের সহিত সহজভাবে তাঁহাকে প্রাণ সমর্পণ করা ও ভাবের সহিত অশ্রু বিসর্জ্জন করা—ইহাই সাধন-সমরে জয়লাভ করিবার উপায়। মন যতদিন বশীভূত না হয়, ততদিন অতর্কিতভাবে অনন্ত চিন্তার উদয় হয় ও ভজনে বিঘ্ন জন্মে। ভগবান্ তখন মহাকাল-রূপ্ ধারণ করিয়া মনকে নাশ করিয়া থাকেন।

পূর্ব্বে যে জাগ্রৎ-মন্ত্রের কথা বলা হইয়াছে, তাহাই সত্যপথে চলার সাহায্য করে। কিন্তু ভাব আবশ্যক। 'ভগবানই পরম প্রিয়, তাঁহাকে বাদ দিলে সবই শূন্যময়', এই ভাবকে আশ্রয় করিলে জাগ্রৎ-মন্ত্র ভিতরে কার্য্য করিতে সমর্থ হয়, নতুবা নহে।

ভগবানের স্বরূপ তীব্র জ্যোতির্ম্ময়, অনন্ত তেজোময়, পরমসত্য ও

পবিত্র। ইহা সনাতন অথচ নিত্য নূতন। এই নিরাকার পরম স্বরূপ দেহসম্বন্ধ থাকা পর্য্যন্ত সম্যক্‌রূপে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। নিরাকার ব্রহ্ম প্রেমিকার নিকট সাকার হইয়া আত্মপরিচয় দিয়া থাকেন। এই পরিচয় সত্য হইলেও, চরম সত্য নহে। দেহে বিদ্যমান থাকা কালে ইহাই পূর্ণ পরিচয় বলিয়া ধারণা করিতে হইবে। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে ইহাও প্রশান্ত সত্তার একটি তরঙ্গ মাত্র। গোলোক, বৈকুণ্ঠাদি নিত্যধাম সকল এই তরঙ্গের মধ্যেই প্রকাশিত হইয়া থাকে।

পর-কায়া প্রবেশ ও আকাশগমন

(১)

পর-কায়া প্রবেশ

যোগি সমাজে পর-কায়া প্রবেশকে যোগের একটি শ্রেষ্ঠ বিভূতি (ক্রিয়াত্মক ঐশ্বর্য্য) বলিয়া গণনা করা হয়। প্রসিদ্ধি আছে, ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য পর-কায়ায় প্রবেশ করিয়াছিলেন—তিনি অঙ্গুষ্ঠ হইতে বায়ুকে উঠাইয়া ব্রহ্মরন্ধ্র পথে নির্গত হইয়াছিলেন ও অমরু নামক কোন রাজার দেহে প্রবিষ্ট হইয়া অঙ্গুষ্ঠ পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়াছিলেন। সেই দেহে সমাবিষ্ট হইয়া 'কাম কলা' তত্ত্বের পরিশীলন করিয়া এই তত্ত্ব বিষয়ে প্রকৃষ্ট জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন—তাহার পর এই উপার্জ্জিত জ্ঞান সহকারে ঐ দেহ হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র পথে নির্গত হইয়া পুনরায় স্বীয় শরীরে ব্রহ্মরন্ধ্র পথে প্রবেশ করিয়াছিলেন। ইহার পূর্ব্বে নিজ দেহ হইতে নির্গত হইবার সময় ত্যক্তপ্রাণ স্বীয় দেহকে যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করিবার জন্য অন্তরঙ্গ ভক্তগণকে নিয়োজিত করিয়াছিলেন। প্রচলিত জনশ্রুতি অনুসারে আচার্য্য বিগতপ্রাণ রাজার দেহে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। এই 'কাম কলা'র জ্ঞান তাঁহার ছিল না, কারণ তিনি আজন্ম ব্রহ্মচারী ছিলেন। মণ্ডন মিশ্রের পত্নীর সহিত শাস্ত্রার্থ প্রসঙ্গে ঐ জ্ঞান আবশ্যক হওয়ায়—অথচ তাঁহাতে তখন ঐ জ্ঞান না থাকায়—তাঁহাকে এই প্রকার কৌশলপূর্ব্বক জ্ঞান অর্জ্জন করিতে হইয়াছিল।

আচার্য্য শঙ্কর বিষয়ক এই 'পর-কায়া' প্রবেশের কিংবদন্তী কতটা সত্য তাহা বলা যায় না। অবশ্য কোন কোন প্রাচীন গ্রন্থে ইহার বর্ণনা পরিদৃষ্ট হয় এবং কোন কোন বিশিষ্ট যোগ বিভূতির বর্ণনা প্রসঙ্গে প্রাচীন সাহিত্যের স্থান বিশেষে ইহার নির্দ্দেশও দেখিতে পাওয়া যায়। তথাপি এই কিংবদন্তীর প্রামাণিকতা সম্বন্ধে

সমালোচকগণ একেবারে নিঃসন্দেহ নহেন। ইহাও সম্ভব, তন্ত্রশাস্ত্রের 'কামকলা' তত্ত্বের রহস্য সম্বন্ধে প্রাচীন শাঙ্কর বেদান্তের প্রাথমিক উদাসীনতা এবং তদনন্তর উহার পরিগ্রহ পূর্ব্বোক্ত পর-কায়া প্রবেশ কিংবদন্তীর মূল ভিত্তিও হইতে পারে।

কিংবদন্তী সত্য হউক অথবা অমূলক হউক 'পর-কায়া' প্রবেশ প্রকৃতই সত্য। 'পর-কায়া' প্রবেশ শ্রেষ্ঠ যোগীদিগের একটি উচ্চ ক্ষমতার নিদর্শন। পর-কায়া প্রবেশের প্রয়োজন বিভিন্ন প্রকার হইতে পারে এবং উহার প্রক্রিয়াও নানা প্রকার, এ বিষয়ে যোগিগণের মতৈক্য দৃষ্ট হয়। প্রয়োজনের বিচার না করিয়া আমরা পর-কায়া প্রবেশ প্রণালীসমূহের মধ্যে যদৃচ্ছক্রমে একটি প্রণালী সম্বন্ধে কথা বলিতে ইচ্ছা করি।

যোগশাস্ত্রে সাধারণ সাধকগণের অনুষ্ঠিত 'ধারণা' নামক প্রক্রিয়াকে দেহ-ধারণা বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। অষ্টাঙ্গ যোগের মধ্যে ধারণা একটি অঙ্গ, ইহা মনে রাখিতে হইবে। চিত্তকে দেহের অর্থাৎ নিজ দেহের কোন বিশিষ্ট প্রদেশে আবদ্ধ করিয়া রাখার নাম ধারণা। ধারণার মূল্য কত অধিক যোগে প্রবৃত্ত হইলে তাহা সাধক স্বয়ংই উপলব্ধি করিতে পারে। বস্তুতঃ ধারণা হইতেই অন্তরঙ্গ সাধনের আরম্ভ হয়। প্রত্যাহার পর্য্যন্ত পাঁচটি অঙ্গ বহিরঙ্গ এবং ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এই তিনটি অন্তরঙ্গ। আমরা এইখানে পাতঞ্জল ক্রম অনুসারে আলোচনা করিতেছি। বৌদ্ধ যোগ-সাহিত্যে—অতান্ত্রিক ও তান্ত্রিক উভয়ত্রই—পরিভাষা ও ক্রমে পার্থক্য আছে, আগমেও বহু অংশে পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু উহা হইতে তত্ত্ব স্বরূপের জ্ঞানে কোন বাধা হয় না।

হৃদয়, ভ্রূ-মধ্য, নাসাগ্র প্রভৃতি দেহের বিশিষ্ট বিশিষ্ট স্থানে যথাবিধি ধারণা করিতে পারিলে বিশিষ্ট ফল লাভ হইয়া থাকে। এই সকল ধারণা শুধু 'ধারণা' নামে পরিচিত হইলেও বস্তুতঃ দেহ-ধারণারই প্রকারভেদ মাত্র। কিন্তু এই দেহ ধারণা হইতে পৃথক্

এক প্রকার ধারণা আছে, তাহাকে বিদেহ ধারণা বলা হইয়া থাকে। চিত্ত অথবা মন দেহাবস্থান কালে দেহকে আশ্রয় করিয়া কার্য্য করিয়া থাকে। দেহ, ইন্দ্রিয়, চিত্তাদি অন্তঃকরণ এবং গ্রহীতা পুরুষ পরস্পর জড়িত থাকে। চিত্ত স্বরূপতঃ বিভূ হইলেও সাধারণতঃ ইহার বৃত্তি দেহকে আশ্রয় করিয়া দেহের মধ্যেই প্রকাশিত হয়। যখন যোগের অন্তরঙ্গ সাধনে প্রবৃত্ত হওয়ার সময় আসে তখন চিত্তকে তাহার বহুমুখী বৃত্তি হইতে মুক্ত করিয়া এক মুখে প্রবাহিত করিতে হয়। বাস্তবিক পক্ষে প্রত্যাহার পর্য্যন্ত যে সাধনা তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য চিত্তের বহুমুখী গতি নিরুদ্ধ করিয়া তাহাকে একদিকে চালনা করা। ইহার জন্য নৈতিক সংযম এবং আত্ম-নিয়ন্ত্রণের সহিত দেহ প্রাণ ইন্দ্রিয় প্রভৃতির সহকারিতা আবশ্যক। যম নিয়ম বলিতে যাহা বুঝায় তাহা নৈতিক জীবনের মহান্ আদর্শের পরিচালনা মাত্র। কারণ উহারই উপর আধ্যাত্মিক জীবনের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত। তাহার পর আসন-সাধনের মূল উদ্দেশ্য দেহকে যথাসম্ভব স্থির করা। দেহ স্থির করার চেষ্টাই আসন-সাধন। ইহাতে কতকটা কৃতকার্য্য হইলে প্রাণ-শক্তির স্থিরতার সাধনাতে অগ্রসর হওয়া সম্ভবপর।

দেহ স্থির করার চেষ্টাতে সমর্থ হইলে অর্থাৎ দীর্ঘকাল এক আসনে উপবেশন করিতে পারিলে প্রাণ-শক্তি উহারই প্রভাবে কখনও কখনও আপনি শান্ত হইয়া থাকে। প্রাণের এই শান্তভাব আপনা-আপনি উপস্থিত হইলে বাহির হইতে তাহাকে শান্ত করার উপদেশ দেওয়া চলিতে পারে, তৎপূর্ব্বে নহে। অর্থাৎ আসনে কিয়ৎ পরিমাণে শান্তভাব আসিলে গুরু প্রাণায়ামের ক্রিয়ার উপদেশ শিষ্যকে দিতে পারেন। কারণ, শিষ্যের যাহা ধারণা করিবার সহজ শক্তি না থাকে গুরু তদ্বিষয়ে তাহাকে অনধিকারী মনে করিয়া উপদেশ দেন না। গুরুর উপদেশে ও প্রাণায়াম ক্রিয়ার ফলে স্বেচ্ছাক্রমে প্রাণকে নিয়ন্ত্রিত করিবার সামর্থ্য জন্মে। এই পথে চলিতে চলিতে প্রাণায়ামের দীর্ঘানুষ্ঠানের ফলে কখনও কখনও কাহারও কাহারও ইন্দ্রিয়ের এবং

মনের ক্ষণিক উপরম হইয়া যায়। তাহার ফলে চক্ষু চাহিয়া থাকিলেও অনেক সময় দৃশ্য দর্শন হয় না, শ্রোত্রেন্দ্রিয় প্রবৃত্ত থাকিলেও অনেক সময় শব্দ গ্রহণ না। এইরূপ অন্যান্য ইন্দ্রিয় সম্বন্ধেও বুঝিতে হইবে। ইহার নাম ইন্দ্রিয়ের সাময়িক উপরম। চক্ষু চাহিয়া রহিয়াছে, সম্মুখে দৃশ্য বস্তু রহিয়াছে এবং সহকারী কারণ আলোকও বিদ্যমান, তথাপি যদি দৃশ্য দর্শন না হয়—তাহা হইলে বুঝিতে হইবে একদিকে মনের সহিত ইন্দ্রিয়ের সংযোগ হইতেছে না এবং অপর দিকে ইন্দ্রিয়ের সহিত অর্থের সংযোগও হইতেছে না। ক্ষণকালের জন্য প্রাণ শান্ত হওয়ার ফলে এই উভয় সন্নিকর্ষ সংঘটিত হইতে পারিতেছে না। কারণ, একমাত্র প্রাণই নিজের ক্রিয়া দ্বারা ইন্দ্রিয়ের সহিত মনের এবং বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সংযোজন ঘটাইয়া থাকে। কিছুক্ষণের জন্য প্রাণ শান্ত হইয়া গেলে এই সংযোগ ঘটিতে পারে না। ইহার ফলে ইন্দ্রিয় সত্ত্বেও বিষয় গ্রহণ ঘটে না। ইহারই নাম প্রত্যাহার। ইহা বিনা চেষ্টায় আপনা-আপনিই হইয়া থাকে। যোগ-অভ্যাসীর এতটা অধিকার উৎপন্ন হইলে গুরু তাহাকে প্রত্যাহারের কৌশল শিক্ষা দেন। তখন সাধক স্বেচ্ছানুসারে প্রত্যাহার নিষ্পন্ন করিতে সমর্থ হয়। প্রত্যাহার সিদ্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বহিরঙ্গ যোগ সমাপ্ত হয়। তখন অন্তরঙ্গ যোগ সাধনে অধিকার জন্মে। ইহারই নাম ধারণা।

আমরা যে ধারণার কথা বলিয়াছি তাহার তাৎপর্য্য এই যে, ইন্দ্রিয়ের বহির্গতি উপশম প্রাপ্ত হইলে চিত্তকে একটি নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে গতিশীল করিতে হয়। এই নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যটি ধারণার বিষয়। আপাততঃ ইহা নিজ দেহেরই কোন অংশ বিশেষ বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। এই ধারণা ব্যাপারে চিত্ত ক্রিয়াশীল হয় অর্থাৎ বৃত্তিরূপে পরিণত হয়। এই যে বৃত্তির উদয়ের কথা বলা হইল ইহা চিত্তেরই বৃত্তি এবং এই বৃত্তির উদয় হয় দেহাবচ্ছিন্ন চিত্ত প্রদেশে। এই জন্যই এই দেহস্থ প্রদেশ চিত্তকে বদ্ধ করিয়া থাকে এইরূপ বলা হয়।

কিন্তু এই প্রকার ধারণা হইতে অতিরিক্ত আর এক প্রকার ধারণা আছে। তাহার নাম বিদেহ-ধারণা। বিদেহ ধারণাস্থলে চিত্তের বৃত্তি বাহিরে উৎপন্ন হয়, কিন্তু চিত্ত দেহেই প্রতিষ্ঠিত থাকে। চিত্তের পরম স্বরূপ সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপক, কিন্তু এই প্রকার ব্যাপকত্ব বা বিভুতি চিত্তে থাকিলেও উহা না থাকার সমান, কারণ দেহ হইতে বাহিরে চিত্ত নিজের কোন কার্য্য সাধন করিতে পারে না। চিত্ত ও মন বর্ত্তমান প্রসঙ্গে একার্থবাচক। চিত্ত বিদেহ ধারণার অভ্যাসে প্রবৃত্ত হইলে তাহার কর্ম্মাশয়-প্রযুক্ত বন্ধন ক্রমশঃ শিথিল হইয়া আসে—চিত্ত দেহে প্রতিষ্ঠিত থাকিলেও তাহার বৃত্তি দেহের বাহিরে যে কোন স্থানে উদ্ভূত হইতে পারে। প্রদীপ-আধার কোন বিশিষ্ট স্থানে স্থাপিত হইলেও তাহার কিরণমালা চারিদিকে সঞ্চারিত হইতে পারে। ইহাও কতকটা সেইরূপ। এই বিদেহ বৃত্তিতে শরীরের অপেক্ষা রহিয়াছে, কারণ সাধারণতঃ শ্রেষ্ঠ যোগ-সামর্থ লাভ না করিতে পারিলে দেহ-নিরপেক্ষ চিত্তবৃত্তির উদয় হইতে পারে না। সুতরাং বিদেহ ধারণাও যে দেহসাপেক্ষ তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু চিত্তের বৃত্তি দেহের বাহিরে উৎপন্ন হয়, দেহাবচ্ছিন্ন প্রদেশে নহে, ইহাই পার্থক্য। বিদেহ ধারণা নিরর্থক নহে, কারণ এই বিদেহ ধারণা দ্বারাই দূরবর্ত্তী বস্তুর সহিত চিত্ত সংস্পৃষ্ট হইয়া উহার প্রতিবিম্ব ধারণ করিতে পারে অর্থাৎ ধারণার বিষয়ীভূত বস্তু সম্বন্ধে বৃত্তিরূপে যাবতীয় জ্ঞান চিত্তে উদ্ভুত হইতে পারে। অথচ ঐ বস্তুর নিকট দেহের উপস্থিতি আবশ্যক হয় না। চিত্তের অসন্নিহিত কিছুই নাই। বদ্ধাবস্থাতে চিত্ত দেহ পরিমাণ প্রতীত হইলেও বাস্তবিক ইহা সর্ব্বব্যাপক। এক হিসাবে দেখিতে গেলে ইহা বিশ্বের যাবতীয় রূপেই বৃত্তিভাবে পরিণত হইবার যোগ্যতা-বিশিষ্ট। বিদেহ ধারণার প্রভাবে এই প্রণালীতে চিত্তের পরিণাম আবির্ভূত হয়। দেহের বহির্ভূত যে কোন বস্তু বা বিষয় অবলম্বন করিয়া চিত্তবৃত্তি উৎপন্ন হইলেও চিত্তের প্রতিষ্ঠা থাকে দেহের অভ্যন্তরে, কারণ চিত্তবৃত্তি দেহ-নিরপেক্ষ নহে। অর্থাৎ

বিদেহ-ধারণায় চিত্ত দেহের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু উহার বৃত্তি দেহের বহির্ভূত। সাধারণ সদেহ ধারণায় চিত্ত যেমন দেহের অন্তর্ভুক্ত উহার বৃত্তিও তেমনি দেহের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু মহাবিদেহা নামক এক ধারণা আছে তাহা বিদেহ ধারণা হইতে উৎকৃষ্ট, তাহাতে চিত্তের সত্তাও দেহের বহির্ভূত হয় এবং চিত্তের বৃত্তিও দেহের বহির্ভূত হয়।

এই ধারণাই অকৃত্রিম ধারণা, কারণ ইহা স্বাভাবিক, কিন্তু বিদেহ ধারণা কৃত্রিম, তাই উহা কল্পিত। কিন্তু কল্পিত হইলেও বিদেহ ধারণা হইতেই মহাবিদেহা উদ্ভূত হয়।

মহাবিদেহা যোগীর পূর্ণত্ব লাভের পক্ষে অত্যন্ত সহায়ক, কারণ এই ধারণার প্রভাবে চিত্তের আবরণ ক্ষীণ হইয়া যায়। চিত্তের আবরণ বলিতে সত্ত্বের আবরণই বুঝিতে হইবে। চিত্তরূপী যে সত্ত্ব তাহাতে রজোঃগুণ ও তমোঃগুণের স্পর্শ থাকিলে তাহা আর স্বচ্ছ থাকে না, তখন তাহাতে আবরণ উদ্ভূত হয়। এই আবরণের নাম যোগীদের পরিভাষাতে ক্লেশ, কর্ম্ম ও বিপাক। ঈশ্বরের সত্ত্বে এই আবরণত্রয় নাই বলিয়া তাঁহার সত্ত্বকে প্রকৃষ্ট সত্ত্ব বলা হয়। ইহাতে একধারে মুক্ত ভাব ও ঐশ্বর্য্যের প্রকাশ হয়। যোগী মহাবিদেহা নামক ধারণার অভ্যাসে দক্ষ হইলে তাহার চিত্ত হইতে ক্লেশ অর্থাৎ অবিদ্যাদি, কর্ম অর্থাৎ ধর্ম্মাধর্ম্ম, এবং ত্রিবিধ বিপাক অর্থাৎ জন্ম আয়ু ও ভোগ এইগুলি অপসারিত হয়। এই সকল আবরণ চিত্তকে আবৃত করিয়া রাখে বলিয়া যোগীর চিত্ত ইচ্ছানুসারে বিহার করিতেও পারে না, জ্ঞান লাভ করিতেও পারে না।

মন অথবা চিত্ত চঞ্চল হইলেও এবং অপ্রতিষ্ঠিত হইলেও কর্ম্মাশয়বশতঃ শরীরে বদ্ধ থাকিতে বাধ্য হয়। সমাধি প্রভৃতি সাধন বলে এই বন্ধন অনেকটা শিথিল হয়, কারণ বন্ধনের মূল কারণ কর্ম্ম তখন অনেকটা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।

আর একটি কথা এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখা উচিত। মনুষ্য যেমন মার্গ অবলম্বন করিয়া একস্থান হইতে অপর স্থানে গমন করে তেমনি

তাহার চিত্তও মার্গ অবলম্বন করিয়া সঞ্চরণ করিয়া থাকে। চিত্তের সঞ্চরণের উপযোগী এই সকল মার্গকে নাড়ী বলে। ধারণা প্রভৃতি দ্বারা এই সকল নাড়ীকে চিনিয়া রাখিতে হয়। নাড়ী জ্ঞান না থাকিলে কেবলমাত্র বন্ধনের শৈথিল্য হইলেই—চিত্ত ইচ্ছানুসারে চলা-ফেরা করিতে পারে না। কর্ম্মক্ষয়ের ফলে কেবল এই পর্য্যন্ত লাভ হয় যে, চিত্ত নিজের গতিতে বাধা প্রাপ্ত হয় না। কিন্তু কোন্ প্রয়োজনে কোন্ রাস্তায় যাইতে হইবে তাহা জানা না থাকিলে ইচ্ছানুসারে প্রয়োজনানুরূপ চিত্তের বিহার সম্ভবপর হয় না।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি বিদেহ ধারণাকালে চিত্তের বৃত্তি বাহিরে উল্লসিত হইলেও চিত্ত দেহ ছাড়িয়া বহির্গত হয় না, কিন্তু মহাবিদেহা স্থলে চিত্ত স্বয়ংই নির্গত হয়। চিত্তের সহিত ইন্দ্রিয় সকলের এমন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে যে চিত্ত দেহ হইতে নির্গত হইলে ইন্দ্রিয় সকলও নির্গত হইয়া থাকে। ইন্দ্রিয় সকল স্বভাবতঃই চিত্তের অনুসরণ করে—ইন্দ্রিয়কে আকর্ষণ করিতে হয় না, চিত্ত যেখানেই যাউক ইন্দ্রিয় সকল স্বয়ংই তাহার অনুসরণ করে।

এই পর্য্যন্ত যাহা বলা হইল তাহা দ্বারা পর-শরীরে আবিষ্ট হওয়ার যোগ্যতা অর্জ্জনের কথা বলা হইল। এবার কায়া প্রবেশের প্রণালী এবং ফলাফল বর্ণনা করা যাইতেছে।

আমরা পূর্ব্বেই নাড়ী সংস্থানের কথা উল্লেখ করিয়াছি। সাধারণতঃ ৭২ হাজার নাড়ীর কথা বর্ণনা করা হইয়া থাকে। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে নাড়ী সংখ্যা আরও অধিক। ইহা অনন্ত। এই সকল নাড়ী শুধু যে দেহকে আশ্রয় করিয়া বিদ্যমান রহিয়াছে তাহা নহে, বস্তুতঃ দেহের বাহিরেও সূর্য্যরশ্মিরূপে এইগুলি সমগ্র বিশ্ব ব্যাপিয়া বর্ত্তমান রহিয়াছে। লোক লোকান্তরে সঞ্চরণ করিতে হইলে এই সকল নাড়ীকে আশ্রয় করিয়াই তাহা করিতে হয়। তদ্রূপ কোন বিশিষ্ট দেহে প্রবেশ করিতে হইলেও নাড়ীকে আশ্রয় করিতে হয়। দেহ হইতে নির্গমের জন্যও নাড়ীজ্ঞান দরকার, কোন দেহে প্রবেশ

করিতে হইলেও নাড়ীজ্ঞান দরকার। নাড়ীর সহিত পরিচয় না থাকিলে স্বচ্ছন্দভাবে আকাশ মার্গে বিহার করা সম্ভবপর নহে। এই সকল নাড়ী বায়বীয় এবং ইহাদের সংস্থানও এক প্রকার নহে। ইড়া পিঙ্গলার শাখা প্রশাখারূপে যে সকল নাড়ী বিস্তৃত রহিয়াছে তাহারাই সাধারণতঃ বহন কার্য্যে সহায়ক হয়। উর্দ্ধ স্তরে উঠিতে হইলে সুষুম্নার সাহায্যও নেওয়া যাইতে পারে। এই সকল নাড়ীর বিভিন্ন স্তর আছে। বাহ্য বায়ুমণ্ডলটি সম্পূর্ণভাবে নাড়ী ও জালের দ্বারা আচ্ছন্ন। এক একটি নাড়ী সূর্য্যরশ্মির ন্যায় অতি সূক্ষ্ম—কোনটি প্রাণবহা, কোনটি মনোবহা, কোনটি বিজ্ঞানবহা। তদ্রূপ আনন্দবহা নাড়ীও আছে।

যোগী পর-কায়া প্রবেশের পূর্ব্বে নাড়ী সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান অর্জ্জন করিয়া থাকেন। তাহা না করিলে যথাযোগ্য মার্গ প্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকে না।

সিদ্ধান্ত হিসাবে ইহা খুবই সত্য, কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত সহজ উপায়েও উদ্দেশ্য সফল হইতে পারে। চিত্ত শিথিল-মূল হইলে যে স্থানে লক্ষ্য স্থাপন করা যায় সঙ্গে সঙ্গে সেই স্থানের প্রাপক একটি রশ্মি আকাশস্থ বায়ুমণ্ডলে ফুটিয়া ওঠে। এই রশ্মির এক 'প্রান্ত' যোগীর দেহের সঙ্গে যুক্ত থাকে এবং অপর 'প্রান্ত' লক্ষ্যে নিবদ্ধ থাকে। এই রশ্মিকে আশ্রয় করিয়াই যোগীর চিত্ত অর্থাৎ লিঙ্গ শরীর নির্গত হয় এবং নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপনীত হয়। যোগীর চিত্ত দেহ ত্যাগ করিলেও দৈহিক সংস্কারগুলি সঙ্গে লইয়া বহির্গত হয়। দেহে ফিরিয়া আসিতে হইলে দেহের মূল স্থানের সহিত চিত্ত অথবা লিঙ্গ শরীর একটি মৃণাল তন্তুর ন্যায় সূক্ষ্ম সূত্রের দ্বারা নিজকে যুক্ত রাখে। অকল্পিত—মহাবিদেহা ধারণাতে ইহা আবশ্যক হয়। এইরূপ ব্যবস্থা না থাকিলে নিজ দেহ হইতে একবার বাহির হইলে পুনর্ব্বার ঐ দেহে প্রবিষ্ট হওয়া সম্ভবপর হয় না। এই সম্বন্ধ সংরক্ষিত থাকিলে দেহটি নির্জ্জীব হয় না।

পর-কায়া বলিতে সাধারণতঃ জীবিত পুরুষের কায়াই বুঝিতে হইবে। মৃত কায়া স্থলে সদ্যোমৃত কায়া বুঝিতে হইবে।

মৃত্যুর পর দীর্ঘকাল অতীত হইয়া গেলে দেহ যন্ত্রের বিকার হয় বলিয়া ঐ দেহে প্রবেশ করা অত্যন্ত কঠিন হয়। অতি প্রবল যোগৈশ্বর্য্যসম্পন্ন ব্যক্তি গলিত দেহকেও শোধিত করিয়া তাহাতে প্রবেশ করিতে পারেন, কিন্তু যোগ শক্তির বিকাশ অপেক্ষাকৃত কম হইলে উহা সম্ভবপর হয় না।

আমরা এই স্থলে জীবিত কায়াতে যোগীর প্রবেশের বিষয়ই বর্ণনা করিতেছি। এই প্রবেশ ক্রিয়া নানা প্রয়োজনে আবশ্যক হইয়া থাকে। ইহার স্থিতিকালের তারতম্যও ঐসব প্রয়োজন অনুসারেই নিয়মিত হইয়া থাকে। রোগ আকর্ষণ, কোন প্রকার অভিনব সংস্কার সাধন অথবা কোন প্রকার বিশেষ কার্য্য সম্পাদন—এই কায়া প্রবেশের প্রয়োজক হইয়া থাকে। এক ব্যক্তি রুগ্ন অবস্থায় পতিত থাকিলে যোগী তাহার কায়ায় প্রবিষ্ট হইয়া তাহার রোগ যন্ত্রণার উপশম এবং রোগের অপসারণ করিতে সমর্থ হন। মনে রাখিতে হইবে, পর-কায়া প্রবেশ করিতে সর্ব্বত্রই পূর্ণ মাত্রায় প্রবেশ যেন না বুঝা হয়। যিনি প্রবিষ্ট হইবেন তিনি সম্পূর্ণভাবে প্রবিষ্ট না হইয়া আংশিকভাবেও প্রবিষ্ট হইতে পারেন এবং দীর্ঘকালের জন্য প্রবিষ্ট না হইয়া অল্পকালের জন্যও প্রবিষ্ট হইতে পারেন। আংশিক প্রবেশ স্থলে সমগ্র চিত্তকে নিজ হৃদয় হইতে উন্মূলিত করিয়া বাহির করা আবশ্যক হয় না। তবে নিজ দেহের সহিত কর্ম্মাশয় জন্য সম্বন্ধটি শিথিল করিতেই হয়। আংশিক চিত্ত-নির্গম স্থলেও উহা মহাবিদেহাই—তাই বিদেহা হইতে ভিন্ন। এই ভেদের উপর কার্য্য সিদ্ধির সম্ভাবনীয়তা নির্ভর করিতেছে। অর্থাৎ মহাবিদেহা আংশিকভাবে করিয়াও যে কার্য্য সাধনা করা যায় বিদেহ ধারণা দ্বারা আপ্রাণ চেষ্টাতেও তাহা পারা যায় না। ইহা অত্যন্ত রহস্যময় ব্যাপার।

সাধারণের পক্ষে বোধগম্য না হইলেও এই সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলা আবশ্যক।

যোগী বিদেহ ধারণাদ্বারা ইচ্ছামাত্র দূরবর্ত্তী যে কোন লোককে প্রত্যক্ষ করিতে পারেন এবং এই প্রত্যক্ষ লৌকিক দৃষ্টিবৎ খাঁটি প্রত্যক্ষ তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহাতে নিজের ব্যক্তিত্বের পরিহার হয় না এবং অপরের ব্যক্তিত্বের আরোপও হয় না। দর্পণে যেমন দৃশ্য বস্তু স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায় তদ্রূপ বিদেহ ধারণার ফলে দূরস্থিত সকল বস্তুই অব্যবহিত এবং অতি স্পষ্ট প্রত্যক্ষ গোচর হয়। কিন্তু তথাপি দ্রষ্টা হইতে দৃশ্যের অথবা দৃশ্য হইতে দ্রষ্টার ব্যবধান থাকিয়াই যায়। দ্রষ্টা ও দৃশ্যের অভেদ সম্পাদন হয় না।

প্রশ্ন হইতে পারে, এই অভেদ সম্পাদনের প্রয়োজন কি? উত্তরে বক্তব্য এই, প্রয়োজন বহু থাকিতে পারে। কিন্তু আপাত দৃষ্টান্তরূপে একটি প্রয়োজন নির্দ্দেশ করিতেছি। কোন ব্যক্তি শারীরিক অথবা মানসিক যন্ত্রণাতে নিপীড়িত হইলে বিদেহা দ্বারা তাহা পরোক্ষভাবে বুঝিতে পারিলেও ঠিক তাহা নিজের বলিয়া অনুভব করা যায় না। কারণ ব্যক্তিত্বের ভেদ তখনও থাকিয়া যায়। বিদেহার প্রভাবে যোগী শুধু রোগীকে দর্শন করেন, তাহাকে সর্ব্বতোভাবে স্পর্শ করেন এবং তাহার সহিত তাদাত্ম্য লাভ করেন মহাবিদেহার দ্বারা। তখন যোগী রোগী হইতে পৃথক্ থাকিয়াও যেন আর পৃথক থাকেন না—তৎকালের জন্য রোগীর সহিত সম্পূর্ণভাবে অভিন্নতা লাভ করেন। যোগীর চিত্ত লক্ষীভূত রোগীর শরীরে বিভিন্ন দ্বার অবলম্বন করিয়া প্রবিষ্ট হইতে পারে। যদি রোগীর দুঃখ বা যন্ত্রণার উপশম করিতে হয় তখন যে দ্বার অবলম্বনীয়, যদি তাহাকে দিব্য জ্ঞান দান করিতে হয় তখন সে দ্বার অবলম্বনীয় নহে। গুরুরূপে শিষ্যের কায়ায় প্রবেশের প্রয়োজন ও রহস্য আমরা কালান্তরে আলোচনা করিব। এখন শুধু সাধারণভাবে যোগী কি করিতে পারেন তাহাই আলোচনা করিতেছি। যোগী অর্থাৎ যোগি-চিত্ত পূর্ব্বোক্ত রোগীর কায়াতে প্রবিষ্ট হইলে রোগীর চিত্ত ঐ চিত্তের

স্পর্শমাত্রেই অভিভূত হইয়া যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে রোগীর ইন্দ্রিয় শক্তিও লুপ্ত হইয়া পড়ে। তখন ঐ দেহের সম্পূর্ণ ভার যোগীর চিত্ত গ্রহণ করে। যোগীর ইন্দ্রিয় সকল ঐ সকল রিক্ত ইন্দ্রিয় স্থানে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং রোগীর সমস্ত চিত্ত ও ইন্দ্রিয় ক্রিয়া অবাধিতভাবে চলিতে থাকে অর্থাৎ রোগী পূর্ব্বে যেমন চক্ষু দিয়া দেখিত ও কান দিয়া শুনিত, এখনও সে যেন সেই প্রকার চক্ষু দিয়া দেখে ও কান দিয়া শোনে। পূর্ব্বে যেমন যন্ত্রণা অনুভব করিত এখনও যেন ঠিক তেমনি করে, কোন পার্থক্য বুঝিতে পারে না।

এই অবস্থায় যোগী রোগীর সহিত যুক্ত থাকিয়া রোগীর যাবতীয় অনুভব স্বয়ং গ্রহণ করিতেছেন। রোগী মনে করে ঐ সকল তাহারই নিজের অনুভব, কিন্তু বস্তুতঃ উহা তাহার নহে। ইহার পর যোগীর চিত্ত ও ইন্দ্রিয় রোগীর চিত্ত ও ইন্দ্রিয় হইতে পৃথক্ হইয়া গেলে সঙ্গে সঙ্গে রোগীর নিজের সুপ্ত চিত্ত ও সুপ্ত ইন্দ্রিয়গুলি পুনর্ব্বার জাগিয়া উঠে। এইবার রোগী কি ঘোরতর পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে তাহা স্পষ্ট দেখিতে পায়। যে রোগ ব্যথাতে সে এতক্ষণ কাতর ছিল এখন সেই রোগের ও যন্ত্রণার লেশমাত্র তাহাতে নাই। যোগীর চিত্ত রোগী হইতে নির্গত হইয়া পুনর্ব্বার স্বীয় কায়াতে প্রবেশ করে। তখন রোগীর ব্যথা, বেদনা ও রোগ সংস্কার সে নিজ দেহে স্পষ্ট অনুভব করিতে থাকে এবং ভোগের দ্বারা উহা কাটাইয়া ফেলে। রোগী তখন হইতেই রোগশূন্য হইয়া নিরাময় হইয়া যায়।

মহাবিদেহা ধারণার প্রভাবে অন্যের কায়াতে আবিষ্ট হইয়া তাহার ভোগগুলিকে টানিয়া আনা যায়। বিদেহা ধারণাতে তাহা পারা যায় না। ব্যক্তিত্ব পৃথক্ থাকিলে একজনের ভোগ অপরে গ্রহণ করিতে পারে না। খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মে এই প্রকার পরের দুঃখ নিবারণের দ্বারা প্রকৃতির ঋণশোধকে ভিকেরিয়াস য়্যাটোন্‌মেণ্ট বলে। গুরু শিষ্যের রোগাদি এবং কর্ম্ম-সংস্কার প্রভৃতি এইভাবেই গ্রহণ করিয়া থাকেন এবং মহাপুরুষগণও পরদুঃখ দূর করিতে হইলে এইভাবে দুঃখ আকর্ষণ

করেন। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে এই সকল ভোগ সত্ত্বেও যোগী কখনই ভোগি-পদপাচ্য হয় না। সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র বাচস্পতি মিশ্র একস্থানে বলিয়াছিলেন যে, "স্বাত্মসমবেত সুখ দুঃখের অনুভবই ভোগ। পরাত্ম সমবেত সুখ দুঃখের অনুভবকে ভোগ বলে না। উহা যোগেরই একটি অবস্থা।" যোগী মহাকরুণার বশীভূত হইয়া নিজে অন্যের দুঃখ অনুভব করেন—ইহা তাঁহার নিজের আত্মাতে সমবেত দুঃখের ভোগ নহে। তাই যোগী সুখ দুঃখ ভোগ করিয়াও ভোগিরূপে পরিগণিত হন না।

দীক্ষার প্রসঙ্গেই হউক অথবা অন্য প্রয়োজনেই হউক গুরু শিষ্যের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দিব্যজ্ঞান দান করিয়া থাকেন। শিষ্য নিজের লৌকিক চেষ্টায় এই জ্ঞান প্রাপ্ত হইতে পারে না। এই জ্ঞানদান বীজ বপনের ন্যায় জানিতে হইবে। গুরু শিষ্যের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া শিষ্যের সঙ্গে অভিন্ন হইয়া ঐ জ্ঞান শিষ্য-হৃদয়ে সঞ্চার করিয়া থাকেন। পর-কায়া প্রবেশের দ্বারা যেমন অন্যের অজ্ঞান দুঃখ প্রভৃতি টানিয়া আনা যায় তেমনি নিজের জ্ঞান আনন্দ প্রভৃতি অপরের মধ্যে সঞ্চার করাও যায়।

গুরু যখন শিষ্যে প্রবেশ করেন তখন সাধারণতঃ নিজের মস্তকের পথে নির্গত হইয়া শিষ্যের মস্তকের পথে তাহার অন্তরে প্রবিষ্ট হন, পুনর্ব্বার শিষ্যের হৃদয় হইতে তাহার মস্তকের পথে বহির্গত হইয়া নিজের ব্রহ্মরন্ধ্র পথ আশ্রয়পূর্ব্বক স্বস্থানে ফিরিয়া আসেন। হৃদয় হইতে দ্বাদশান্ত পর্য্যন্ত যে ছত্রিশ আঙ্গুল পরিমাণ প্রাণের সঞ্চারমার্গ আছে ঐ পথে ঊর্দ্ধ রেচন ক্রমে বহির্গত হইয়া শিষ্যের দ্বাদশান্ত হইতে হৃদয়ের পথে পূরক ক্রমে প্রবেশ করিতে হয়। তাহার পর—তাহার হৃদয়ে সমাবিষ্ট হওয়ার সময় কিয়ৎকালের জন্য কুম্ভক বৃত্তি অবলম্বন করিতে হয়। ইহার পর বিপরীত ক্রমে শিষ্য দেহে ঊর্দ্ধ রেচন এবং নিজ দেহে দ্বাদশান্ত হইতে অধঃপূরণ অবলম্বন করিয়া নিজ স্থানে ফিরিয়া আসিতে হয়। অন্য পথে বিশুদ্ধ জ্ঞান সঞ্চারের ক্রিয়া হয় না।

মহাবিদেহা অভ্যাসের ফলে প্রকাশের আবরণ সম্পূর্ণ ক্ষীণ হইয়া গেলে যোগী শ্রেষ্ঠ যোগভূমি লাভ করিয়া থাকেন। মহাবিদেহার অভ্যাস না থাকিলে ধারণার পর ধ্যান ও সমাধির অভ্যাস হইতে ক্রমশঃ প্রজ্ঞা-বৈশারদ্য লাভ হইয়া থাকে।

শুনিতে পাওয়া যায়, কোন কোন মহাত্মা পর-কায়া প্রবেশ প্রক্রিয়া অবলম্বনপূর্ব্বক দীর্ঘকাল সাধ্য কর্ত্তব্য সম্পাদনের জন্য মরদেহে অবস্থান করেন। দেহসিদ্ধি না করিতে পারিলে একই দেহে দীর্ঘকাল থাকা সম্ভবপর হয় না। এইজন্য কোন কোন যোগী অন্যের বিগত-প্রাণ দেহে প্রবিষ্ট হইয়া আপন প্রয়োজন অনুসারে জীবনযাপন করেন। ঐ দেহ জীর্ণ হইলে পুনরায় অভিনব দেহে প্রবিষ্ট হওয়ার জন্য ঐ দেহ ত্যাগ করেন। আজকালও কোন কোন যোগী সম্বন্ধে এরূপ শুনিতে পাওয়া যায়।

প্রায় ৩৫ বৎসর পূর্ব্বে আমি ৺কাশীধামে একজন যোগীর দর্শন-লাভ করিয়াছিলাম, যিনি পর-কায়া প্রবেশে বিশেষ দক্ষ ছিলেন। শুনিয়াছিলাম তাঁহার তৎকালীন দেহ তাঁহার জন্মকালীন দেহ নহে, উহা তৎপরিগৃহীত তৃতীয় অথবা চতুর্থ দেহ। অবশ্য ইহা কিংবদন্তী মাত্র—ইহার যথার্থ নিরূপণের জন্য আমি যোগিবরকে প্রশ্ন করিয়া কিছু জানিতে ইচ্ছা করিয়াছিলাম, কিন্তু সেরূপ অবসর প্রাপ্ত হই নাই।

ভগবান শঙ্করাচার্য্যের বহু পূর্ব্বে একজন প্রসিদ্ধ ভারতীয় সাধক পর-কায়া প্রবেশ করিয়া দীর্ঘকাল অবস্থান করিয়াছিলেন এরূপ প্রসিদ্ধি আছে। ইনি জৈন সম্প্রদায়ের সুপ্রসিদ্ধ তীর্থঙ্কর মহাবীর স্বামীর সমকালীন ছিলেন। ইনি আজীবক সম্প্রদায়ের সুপ্রসিদ্ধ আচার্য্য গোশাল।

প্রাচীন ইতিহাস হইতে জানিতে পারা যায় যে, মহাবীর স্বামী এক সময়ে শ্রাবস্তীনগরে অবস্থানকালে কোন সভাতে ধর্ম্মোপদেশ দানকালে আচার্য্য গোশাল সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার কেবল

জ্ঞান উৎপন্ন হয় নাই। শুধু তাহাই নহে, এই গোশাল পূর্ব্বে কে ছিল তাহাও তিনি সকলের সম্মুখে প্রকাশ করিয়াছিলেন। গোশাল সেই সময়ে ঘটনাক্রমে শ্রাবস্তীনগরে উপস্থিত ছিলেন। তিনি লোকপরম্পরাতে মহাবীর স্বামীর এই মন্তব্য শুনিতে পাইয়া অত্যন্ত দুঃখিত হন এবং ইহার প্রতিবাদ করিবার জন্য মহাবীর স্বামীর সঙ্গে দেখা করিতে আসেন। বহু লোকের সমাগম হইয়াছিল। গোশাল মহাবীরের বর্ণনা স্বীকার না করিয়া তাঁহার নিজের পরিচয় স্বতন্ত্রভাবে দিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, যদিও মহাবীর স্বামী তাঁহাকে তাঁহার পূর্ব্ব শিষ্য মঙ্খলী পুত্র গোশাল বলিয়া প্রচারিত করিয়াছেন তথাপি তিনি স্বয়ং উহা সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করিতেছেন। বস্তুতঃ তিনি মঙ্খলী পুত্র গোশাল নহেন, পক্ষান্তরে তিনি উদায়ী কুণ্ডিমান নামক ধর্ম্ম প্রচারক। তিনি একজন অতি প্রাচীন যোগী। তিনি দীর্ঘকাল হইতে এক শরীর জরাজীর্ণ হইলে যোগবলে দেহান্তরে প্রবিষ্ট হইয়া দীর্ঘজীবন অতিবাহিত করিতেছেন। তিনি সম্প্রতি যে দেহে প্রবিষ্ট হইয়াছেন এইটি মৃত গোশালের দেহ। এইটি তাঁহার সপ্তম পর-কায়া প্রবেশ। দেহটি গোশালের বলিয়া মহাবীর স্বামী তাঁহাকে গোশাল বলিয়াই মনে করিয়াছেন। বস্তুতঃ তিনি গোশাল হইতে ভিন্ন। তিনি আরও বলিয়াছিলেন যে তিনি ঐ শরীরে আরও কয়েক বৎসর থাকিবেন। বলা বাহুল্য, ইহা মহাবীর স্বামী স্বীকার করেন নাই।

এই ঘটনার ঐতিহাসিকতা কতটা আছে তাহা বলা যায় না। তবে অতি প্রাচীনকাল হইতেই কোন কোন যোগী পর পর বিভিন্ন দেহে প্রবিষ্ট হইয়া দীর্ঘকাল জীবন ধারণ করিতেন ইহা সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায়।

যোগবাশিষ্ট রামায়ণে চূড়ালা ও শিখিধ্বজের উপাখ্যানে পর-কায়া প্রবেশের প্রসঙ্গ রহিয়াছে। রাণী চূড়ালা আত্মজ্ঞান লাভের পর যোগসিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া যে প্রণালীতে এই কার্য্য সাধন করিয়াছিলেন

তাহা বর্ণিত হইয়াছে। প্রণালীটি মূলে প্রসিদ্ধ প্রণালী হইতে ভিন্ন নহে, তবে বর্ণনাতে পরিভাষার পার্থক্য অনুসারে কিঞ্চিৎ পৃথক বলিয়া মনে হয়। জীব সাধারণতঃ কুণ্ডলিনী-গৃহে অবস্থান করে। দেহ হইতে বাহির হইয়া অন্যত্র যাইতে হইলে ঐ স্থান হইতে জীবকে রেচক ক্রিয়া দ্বারা উত্থাপন করিয়া বাহির করিতে হয়, তাহার পর অন্য শরীরে যুক্ত করিতে হয়। জীব পূর্ব্ব শরীর ত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গে ঐ শরীর স্পন্দহীন কাষ্ঠবৎ অসাড় হইয়া যায়। যোগবাশিষ্ঠ মতে দেহ হইতে স্থাবর জঙ্গম সকল পদার্থে নিজের রুচি অনুসারে জীবকে প্রবিষ্ট করাইয়া সিদ্ধিশ্রী ভোগ করা যায় এবং তাহার পর পূর্ব্বদেহে ফিরিতে পারা যায় বা পুনরপি দেহান্তরে প্রবেশ করা যায়। পরদেহে উপভোগের পর নিজ অন্তঃকরণ ব্যাপক করিয়া আত্মসংবিত্তিতে পূর্ণ হইয়া স্থিত থাকিতে পারে। চূড়ালা নির্ব্বিকল্প শিখিধ্বজের দেহে প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহাতে চেতনা সঞ্চার করিয়াছিলেন।

এই প্রসঙ্গে বহু কথা বলিবার আছে। আপাততঃ এই স্থানেই এই আলোচনা সমাপ্ত করিলাম।

(২) আসন-উত্থান ও আকাশ-গমন

যাঁহারা শ্রেষ্ঠ যোগী ও ভক্ত সম্প্রদায়ের সহিত পরিচিত তাঁহারা জানেন যে যোগ ক্রিয়ার প্রভাবে অথবা অন্য কোন আধ্যাত্মিক শক্তির সংসর্গ-বশতঃ যোগীর আসন ভূমিতল হইতে শূন্যে উত্থিত হয়। অবশ্য আসনের উত্থান হয় না এমন যোগীও দেখিতে পাওয়া যায়, আবার কোন কোন যোগী সম্বন্ধে এমনও শুনিতে পাওয়া যায় যে, তাঁহাদের আসন শুধু শূন্যে উত্থিত হয় না—তাঁহারা ইচ্ছানুসারে শূন্য মার্গে বিচরণ করিতে পারেন।

আসন উত্থানের প্রকৃত রহস্য কি এবং আসন উত্থানের সঙ্গে আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের কোন সম্বন্ধ আছে কিনা এ বিষয়ে অনেকেরই মনে জানিবার ঔৎসুক্য জন্মে। সাধারণ বিচারশীল লোকের মনে সন্দেহ হয় যে, স্থূল দেহ যখন মাধ্যাকর্ষণ নিয়মের অধীন তখন উক্ত

নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া উহা ঊর্দ্ধে উত্থিত হইবে কি প্রকারে এবং উহা শূন্যমার্গে সঞ্চরণ করিবে কি প্রকারে? ঐ সন্দেহ অমূলক নহে। কিন্তু ইহার সমাধানের পূর্ব্বে মনে রাখিতে হইবে যে আসন-উত্থান ও আকাশ বিহার উভয়ই সত্য। তবে মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম দেহের স্থূলত্ব পরিহারের সঙ্গে সঙ্গে দেহের উপর অনিবার্য্যভাবে প্রযুক্ত হইতে পারে না। এই স্থূলত্ব পরিহার ব্যাপার তমোগুণ ও সত্ত্বগুণের আপেক্ষিক উৎকর্ষের বিনিময় জনিত তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহা যোগের প্রভাবেও হইতে পারে এবং অন্য কারণেও হইতে পারে। কিন্তু আসন উত্থান না হইলেই যে প্রকৃত আধ্যাত্মিক সম্পদ লাভ হয় না তাহাও বলা চলে না, ও আসন উত্থান হইলেই যে আধ্যাত্মিক উন্নতি হইয়াছে তাহাও সব সময় বলা যায় না। আসন উত্থান যে সত্যই ঘটিয়া থাকে তাহা হৃদয়ঙ্গম হইলে তাহার কারণের নির্দ্দেশ এবং প্রক্রিয়া সম্বন্ধে আলোচনা সম্ভবপর।

প্রত্যক্ষ সত্যের অপলাপ হয় না। আসন-উত্থান ব্যাপার সর্ব্বদেশেই একটি সুপরিচিত সত্য। আকাশ গমন প্রভৃতি ইহারই পরিণতি। খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মগ্রন্থে ও উপাসকবর্গের সাধক জীবনের ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায় যে প্রার্থনার সময় অথবা অন্য কোন প্রকারে ভগবৎ চিন্তার সময় কোন কোন সাধকের দেহ প্রভামণ্ডলের দ্বারা বেষ্টিত হয়, এমন কি কখনও কখনও সমস্ত গৃহও উজ্জ্বল আলোকে আলোকিত হয় এবং ভাগ্যবান কোন কোন সাধক ভূমিতল হইতে উত্থিত হইয়া কিয়ৎকাল পর্য্যন্ত শূন্যে অবস্থান করেন। ইহার পর দৃষ্টান্ত বিদ্যমান আছে। তন্মধ্যে দুই চারিটি নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

প্রসিদ্ধ সন্ত সেন্ট আগাষ্টিন্ তাঁহার জীবনস্মৃতি গ্রন্থে সেন্ট মণিকা নামক একজন সাধ্বী মহিলার কথা বলিয়াছেন যে, তিনি প্রার্থনাকালে প্রায় তিন ফুট পর্য্যন্ত শূন্যে উত্থিত হইতেন—মনে হইত যেন তাঁহার শরীরে কোন গুরুত্বই নাই, শরীর বায়ুমণ্ডলে ভাসিতে থাকিত। ইহা খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর কথা।

প্রসিদ্ধ নব প্লাতনিক দার্শনিক জামব্লিকাস প্রার্থনাকালে ভূমি হইতে প্রায় দশ হাত উত্থিত হইতেন। ঐ সময়ে তাঁহার দেহ ও পোষাক-পরিচ্ছদ সুবর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল জ্যোতিতে জ্যোতির্ম্ময় হইয়া ভাসমান হইত।

ঈজীপ্তের সেণ্ট মেরী নামক একটি মহিলার জীবনেও এরূপ অলৌকিক ঘটনা দেখা গিয়াছে। মহিলাটির পূর্ব্ব জীবন তত ভাল ছিল না। কিন্তু কালান্তরে তাঁহার জীবনে ঘোর পরিবর্ত্তন আসে—তিনি অনুতাপানলে দগ্ধ হইয়া বিশুদ্ধ ভাগবত জীবন লাভ করেন। শোনা যায় তিনি পেলেষ্টাইনের মরুভূমিতে একাকী নগ্নভাবে বাস করিতেন এবং শাকসব্জী যখন যাহা পাইতেন তাহা দ্বারাই দেহ রক্ষার চেষ্টা করিতেন। একবার ফাদার জোজিমাস নামক একজন ধর্ম্ম প্রচারক তাঁহাকে হঠাৎ দেখিতে পান—তাঁহার অবস্থা দেখিয়া তিনি তাঁহার নিজের বস্ত্রখণ্ড পরিধানের জন্য তাঁহাকে দান করেন। কিছুক্ষণ পরেই তিনি লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন, মেরী পূর্ব্ব দিকে মুখ করিয়া প্রার্থনা করিতেছেন এবং তাঁহার দেহ ভূমি হইতে প্রায় পাঁচ ফুট ঊর্দ্ধে উত্থিত।

বিসপ সেণ্ট আরের বিষয়ে শুনিতে পাওয়া যায় যে গির্জ্জাঘর বন্ধ হইয়া গেলেও তিনি কলে-কৌশলে উহার দ্বার খুলিতেন। তখন প্রহরী সকল নিদ্রিত থাকিত। তিনি গির্জ্জার অভ্যন্তরে মেজেতে বসিয়া প্রার্থনা করিতেন এবং সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিতেন। অনেক দিনই দেখা যাইত যে তাঁহার দেহ শূন্যে উত্থিত হইয়া রহিয়াছে। ঐ সময়ে সমস্ত গির্জ্জাঘরটি দিব্য আলোকে আলোকিত হইয়া উঠিত। ইহা ষষ্ঠ শতাব্দীর কথা। হাঙ্গেরীর সেণ্ট মারগারেট গুড ফ্রাইডের উৎসবে ভূমি হইতে বহুবার উত্থিত হইয়াছিলেন এরূপ দেখা গিয়াছিল। অন্যান্য উৎসবের সময়েও এরূপ হইত তাহার প্রমাণ আছে।

প্রসিদ্ধ সন্ত সেণ্ট ফ্রানসিস [পাওলা] অনেক সময় রাত্রিবেলা প্রার্থনাকালে শূন্যে উত্থিত হইতেন। কথিত আছে, একবার তিনি

একাদশ লুই'র অনুরোধে তাঁহার নিকট গিয়াছিলেন। নেপল্‌স্ নামক নগর হইয়া তাঁহার যাওয়ার কথা ছিল। তিনি নেপল্‌সে্ পৌঁছিলে পর সমগ্র নগর তাঁহাকে সম্মান প্রদর্শন করে এবং প্রথম ফারডিনাণ্ড তাঁহাকে নিজ প্রাসাদে অভ্যর্থনা করেন। রাত্রিবেলা মহাত্মার অবস্থান-গৃহের দ্বারের ছিদ্র পথে দেখিতে পাওয়া গেল যে, তিনি প্রার্থনা করিতেছেন এবং একটি বিশাল জ্যোতি তাঁহাকে ঘিরিয়া রহিয়াছে। মেজে হইতে তাঁহার শরীর কয়েক ফুট উচ্চে অবস্থিত দেখা গেল। ইহা দেখিয়া রাজা অত্যন্ত বিস্মিত হইয়াছিলেন। ইহা পঞ্চদশ শতাব্দীর ঘটনা। স্পেনের সুপ্রসিদ্ধ মহিলা সন্ত, সেণ্ট টেরেসা, যাঁহাকে ভারতীয় মীরাবাঈর সহিত অনেক সময় তুলনা করা হয়, অনেক সময়েই প্রার্থনাকালে শূন্যে উঠিতেন। এরূপ উত্থিতা হইয়া অনেক সময় শূন্যে থাকিতেন। তাহার পর নিম্নে নামিবার জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিলে তখন দেহ নামিত।

প্রসিদ্ধি আছে, স্থানীয় বিশপ ডন আলভেরেস্‌ডে মোনডোসা একবার তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছিলেন—ইচ্ছা ছিল তাঁহার সঙ্গে ধর্ম্ম বিষয়ে আলোচনা করিবেন। কিন্তু তিনি দেখিয়া বিস্মিত হইলেন যে, টেরেসার দেহ তখন জানালার উপর পর্য্যন্ত উঠিয়া নিরালম্বভাবে শূন্যে স্থিত রহিয়াছে। বিশিষ্ট প্রার্থনার সময় তাঁহার দেহ প্রায়ই জ্যোতিতে ভরিয়া যাইত ও হাল্‌কা হইয়া শূন্যে উত্থিত হইত। ইহা ষোড়শ শতাব্দীর কথা।

এইরূপ অসংখ্য ঘটনা আছে। বর্ত্তমান যুগেও এইরূপ ঘটনার অভাব নাই। আমাদের দেশেও এইরূপ আসন উত্থানের ব্যাপার বিশিষ্ট যোগী অথবা ভক্তের জীবনে প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়। প্রসিদ্ধ মহাত্মা রাম ঠাকুরের কথা সর্ব্বত্র সুপরিচিত। তিনি অতি অল্প বয়সেই সাধনাতে এত উন্নত হইয়াছিলেন যে, আসন উত্থান তখনই তাঁহার জীবনে লক্ষিত হইত। অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে তিনি কোন ভদ্রলোকের বাড়ীতে পাচক ব্রাহ্মণের কার্য্য করিতেন। তখন তাঁহার

মা জীবিত ছিলেন—তাঁহার জীবিকা নির্ব্বাহের জন্যই তাঁহাকে এইরূপ কার্য্যে ব্রতী হইতে হইয়াছিল। তিনি দিনের ও রাত্রের পাক কার্য্য সমাধা করিয়া—বাবুরা সকলে ভোজনান্তে বিশ্রাম করিতে গেলে নিজের প্রকোষ্ঠে আসিয়া আসনবদ্ধভাবে ক্রিয়া করিতেন। ইহা অত্যন্ত গুপ্তভাবে অনুষ্ঠিত হইত। বাড়ীর কেহই উহা জানিত না।

একদিন কোন বিশেষ কারণে অধিক রাত্রির সময় তাঁহাকে ডাকিবার প্রয়োজন উপস্থিত হয়। যে লোকটি তাঁহাকে ডাকিবার জন্য তাঁহার প্রকোষ্ঠে গিয়াছিল সে বাহির হইতেই ভিতরে যে দৃশ্য দেখিতে পাইল তাহা দেখিয়া আর তাহার ঐস্থানে যাইবার সাহস হইল না। সে দেখিতে পাইল যে ঠাকুর মহাশয় মশারির নীচে আসনে উপবিষ্ট আছেন, কিন্তু দেহ শূন্যে উত্থিত এবং উজ্জ্বল আলোকে বেষ্টিত। ইহা দেখিয়া সে গৃহস্বামীকে সমস্ত বিষয় নিবেদন করিলে গৃহস্বামী স্বয়ং ইহা স্বচক্ষে দর্শন করেন। পাচক ব্রাহ্মণ যে শুধু পাচকই নহে একজন মহাপুরুষ তাহা বুঝিয়া তিনি তাহার পরদিন হইতেই তাঁহাকে পাক কার্য্য হইতে অব্যাহতি দান করেন। কিন্তু তাঁহার মাসিক আর্থিক সাহায্য বন্ধ না করিয়া পূর্ব্ববৎই চালাইতে থাকেন। রাম ঠাকুর মহাশয়ের শূন্য মার্গে সঞ্চরণের বৃত্তান্ত তাঁহার ভক্তগণের মধ্যে অল্পাধিক অনেকেই জানেন।

এইরূপ আসন উত্থান, দেহের জ্যোতির্ম্ময়তা ও স্বেচ্ছানুসারে আকাশ গমনের বিবরণ শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংস, শ্রীশ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী, শ্রীশ্রীকাঠিয়া বাবা প্রভৃতি বহু আধুনিক যোগীর জীবনেও প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই সকলই প্রত্যক্ষ দৃষ্ট ঘটনা—ইহাদের তথ্যতা সম্বন্ধে অনেকেই সাক্ষ্য দিতে পারেন। ‘গুরুপরম্পরা চরিত’ নামক গ্রন্থ হইতে অবগত হওয়া যায় যে প্রসিদ্ধ তান্ত্রিক সিদ্ধ মহাত্মা ভাস্কর রায়েরও আসন শূন্যে উত্থিত হইত এবং তখন সমস্ত গৃহ উজ্জ্বল আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিত।

আকাশ গমনের শক্তি খ্রীষ্টের সমকালীন যোগী অ্যাপলোনিয়াস

অব টিয়ানার ছিল। তিনি ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন এবং ইহার বৃত্তান্ত বিস্তারিতরূপে ইঁহার শিষ্য ও ভক্তগণ প্রকাশিত করিয়াছিলেন। ইঁহার খেচরী শক্তি সম্বন্ধে বহু অলৌকিক ঘটনার কথা শুনিতে পাওয়া যায়। সীমন্ ম্যাগাস এক সময়ে প্রাচীন পাশ্চাত্য জগতে অলৌকিক যোগশক্তির আদর্শস্বরূপ ছিলেন। অনেকে তাঁহাকে মায়াবী বলিয়া বর্ণনা করিতেন। অন্যান্য বহু প্রকার যোগ বিভূতির ন্যায় আকাশ গমনের শক্তিও তাঁহাতে ছিল এরূপ প্রমাণ পাওয়া যায়। যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ হইতে জানিতে পারা যায় বীতহব্য, চূড়ালা প্রভৃতি আকাশ গমনে পূর্ণ অধিকারসম্পন্ন ছিলেন। চূড়ালা প্রথমে ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্ত হন, তাহার পর একান্তে যোগাভ্যাস করিয়া অন্যান্য যোগশক্তির ন্যায় আকাশ গমনের শক্তিও অর্জ্জন করেন। চূড়ালা ও শিখিধ্বজের বিস্তারিত বিবরণ যোগবাশিষ্ঠে দ্রষ্টব্য। আচার্য্য শঙ্কর ও গোরক্ষনাথ আকাশ গমনে দক্ষ ছিলেন, ইহা জানিতে পারা যায়। বুদ্ধদেবের আকাশ গমনের কথা বহুস্থানেই পাওয়া যায়। কথিত আছে, একবার তিনি শ্রাবস্তী হইতে ধনিয়ের নিবাস স্থানে আকাশ মার্গে যাইয়া তাহার কুটীরের উপর দণ্ডায়মান হন। ইহা প্রায় সাত শত যোজনের ব্যবধান। দত্তাত্রেয়ের আকাশ গমনের কথাও সুপ্রসিদ্ধ। কথিত আছে তিনি এক অহোরাত্রে ভারতের বিভিন্ন তীর্থে নিজের বিভিন্ন দৈনিক কার্য্য সম্পাদন করিতেন এবং এখনও করেন।

শোনা যায় মিঞা মীর লাহোর হইতে কখনও কখনও হিজাদ যাইতেন, অবশ্য আকাশ মার্গে। সেখানে রাত্রি কাটাইয়া সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে আবার লাহোরে ফিরিয়া আসিতেন। এই কথা দারাশিকো তাঁহার আউলিয়া বিষয়ক গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন।

সেখ আবদুল কাদির জিলানী একদিন ধর্ম্ম ব্যাখ্যা করিতেছিলেন। হঠাৎ ভূমিতল হইতে শূন্যে উঠিয়া গেলেন ও সেখান হইতে শুনিলেন, "হে ইস্‌রাইলবাসী, থাম। ইস্‌লাম ধর্ম্ম শোন।" শূন্যে কতকটা উঠিয়া গিয়া পূর্ব্বস্থানে ফিরিলেন ও পুনর্ব্বার ব্যাখ্যা দিতে লাগিলেন।

কেহ জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, "আমি হঠাৎ দেখিতে পাইলাম খিদর মস্‌জিদের পাশ দিয়া যাইতেছেন। আমি আকাশ পথে যাইয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলাম ও তাঁহাকে আমার উপদেশ শুনিতে আমন্ত্রণ করিলাম।" এই জিলানী আধ ঘণ্টাতে ইরাক হইতে রোমে গিয়াছিলেন। কোন একটি মহাত্মা দেহরক্ষা করিয়াছিলেন—তাঁহার কল্যাণের জন্য অন্তিম প্রার্থনা করিতে তাঁহাকে যাইতে হইয়াছিল।

প্রসিদ্ধি আছে গেব্রিয়েল নামক দেবদূত এক রাতে মহম্মদ সাহেবকে শয্যা হইতে উঠাইয়া সপ্ত স্বর্গের ও নরকের যাবতীয় দৃশ্য দেখাইবার জন্য নিয়া গিয়াছিলেন। কথিত আছে, তিনি নব্বুই সহস্রবার তাঁহাকে ভগবানের দর্শন করান ও পরে যথাস্থানে পৌঁছাইয়া দেন। ইহাতে সময় অতি সামান্যই লাগিয়াছিল। মহম্মদ ফিরিয়া দেখিতে পাইলেন যে তখনও তাঁহার শয্যা গরম রহিয়াছে।

একবার মিশরের সুলতান সুফী মহাত্মাদিগের যোগশক্তির বিষয় শুনিতে পাইয়া রাজ্যের সকল পণ্ডিতবর্গকে এবং সাধকমণ্ডলীকে নিজ প্রাসাদে আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের নিকট তিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন· যে সত্যই সুফীগণ শক্তিসম্পন্ন কিনা। তিনি বলিলেন যে, সপ্ত স্বর্গের অন্তর্গত যে কোন দুইটি স্বর্গের মধ্যে যে ব্যবধান রহিয়াছে তাহা অতিক্রম করিতে হইলে একজনের প্রায় পাঁচ শত বৎসর লাগিবার কথা। প্রতি স্বর্গের বিস্তারও প্রায় ঐ পরিমাণ। অতএব ক্ষণমাত্রে সপ্ত স্বর্গ ভেদ করা কি প্রকারে সম্ভবপর হইতে পারে? সুলতান বলিলেন যে, এই জন্য মহম্মদ সংক্রান্ত পূর্ব্ব বৃত্তান্ত বিশ্বাসযোগ্য নহে। ঐ সময়ে কেহ কিছু বলিলেন না। তাই প্রশ্ন অমীমাংসিত থাকিয়া গেল এবং সভা ভঙ্গ হইল।

ঐ সময় সেখ আহাবুদ্দিন অত্যন্ত শক্তিশালী পুরুষ ছিলেন। কোন বিশেষ কারণে তিনি ঐ সভায় যোগ দিতে পারেন নাই। তিনি সুলতানের পূর্ব্বোক্ত সংশয়ের বিষয় শ্রবণ করিবামাত্রই উহা সমাধানের জন্য ব্যগ্র হইয়া পড়িলেন। তখন তিনি দিনের বেলায়

অত্যন্ত তীব্র গ্রীষ্মের উত্তাপ সহ্য করিয়াও সুলতানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার জন্য রওয়ানা হইলেন। সুলতান তাঁহাকে যথাবিধি অভ্যর্থনা করিলেন। সুলতান মনে করিলেন, ইনি বোধহয় কিছু ভিক্ষার জন্য আসিয়াছেন, তাই তিনি সেখজীকে বলিলেন, "আপনি স্বয়ং এত কষ্ট করিয়া এখানে আসিয়াছেন কেন? একজন পরিচারক লোককে পাঠাইলেই তো হইত।" সেখজী বলিলেন, "অন্য প্রয়োজন আছে।"

যে ঘরে সেখজীর সঙ্গে সুলতানের কথাবার্ত্তা হইতেছিল তাহার চারিদিকে চারিটি জানালা ছিল, সেখজী তাহার একটিকে বন্ধ করিতে বলিলেন। এ-দিকে কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল। তাহার পর একটিকে খুলিতে বলিলেন। সম্মুখে একটি লাল পাহাড় দৃষ্টিগোচর হইতেছিল। সুলতান দেখিতে পাইলেন, ঐ পাহাড়ের তলদেশে অগণিত সংখ্যক অশ্বারোহী আসিতেছে। দেখিয়া মনে হইতেছিল ঐ সকল সৈনিক তাঁহার রাজপ্রাসাদ আক্রমণ করিতে আসিতেছে। উহা দেখিয়া সুলতানের মনে আতঙ্কের সঞ্চার হইল।

সেখজী বলিলেন, "ভয় নাই।" তিনি নিজেই জানালা বন্ধ করিয়া দিলেন। পরে খোলা হইলে সুলতান তাকাইয়া দেখিলেন, একটি লোকও দেখা যাইতেছে না।

অন্য একটি জানালার সম্মুখে ছিল বিশাল কহিরা (কাইরো) নগর। ঐ জানালাটি খোলা হইল। তখন সুলতান দেখিতে পাইলেন যে ঐ নগরটি অগ্নিতে দগ্ধ হইতেছে—অগ্নিশিখা লক্ লক্ করিয়া ঊর্দ্ধদিকে উত্থিত হইতেছে। সুলতান এবারও খুব ভীত হইলেন, সঙ্গে সঙ্গে জানালা বন্ধ করা হইল। আবার জানালা খুলিয়া দেখা গেল, কোথাও কিছু নাই।

এবার তৃতীয় জানালাটি খুলিয়া দেখা গেল সম্মুখে নীলনদী বর্ষার জলপ্লাবনবশতঃ ভীষণ আকার ধারণ করিয়াছে। মনে হইতেছিল রাজপ্রাসাদ যেন মগ্ন হইয়া যাইবে। এবারও সুলতান ভীত হইলেন,

সেখজী তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া জানালা বন্ধ করিয়া দিলেন। পরে জানালা খুলিয়া দেখা গেল, কোথাও কিছু নাই।

চতুর্থ জানালা খুলিয়া দেখা গেল সম্মুখে দূরদিগন্ত বিস্তৃত মরুভূমি। উহা বন্ধ করা হইল। পরে আবার খুলিবার পর দেখা গেল, মরুভূমি কোথাও নাই। তাহার পরিবর্ত্তে সজল সুশীতল রমণীয় উদ্যান—চারিদিকে সুন্দর সুন্দর ফলের বৃক্ষ শোভা পাইতেছে, নানা রঙের ফুলের গাছ সুগন্ধি প্রস্ফুটিত পুষ্পসহ চারিদিকে বিরাজ করিতেছে। তখন সুলতানের মনে হইল যেন তিনি ইরাণের উদ্যান দেখিতেছেন।

সেখজী বলিলেন, "আনন্দ।" জানালা পূর্ব্ববৎ বন্ধ করা হইল। পুনর্ব্বার খুলিয়া দেখা গেল কোথাও কিছু নাই—একমাত্র শুষ্ক মরুভূমি দেখা যাইতেছে। তাহার পর সেখজী বলিলেন, "এক গামলা জল আনিতে বলুন।" জল আনা হইল, তখন সেখজী তাঁহাকে কোমরে গামছা জড়াইয়া ঐ জলে মগ্ন হইয়া মাথা উঠাইতে বলিলেন। সুলতান সেখজীর নির্দ্দেশানুসারে জলে মাথা ডুবাইলেন—ডুবাইয়াই দেখিতে পাইলেন তিনি যেন সমুদ্র তীরবর্ত্তী কোন পর্ব্বতের পাদদেশে রহিয়াছেন। তাঁহার মনে ক্রোধের সঞ্চার হইল। তিনি মনে মনে ভাবিলেন 'আমি যদি কখনও মিশর দেশে ফিরিতে পারি তাহা হইলে সেখজীকে উপযুক্ত দণ্ড দিব।' এই প্রকার নানা কথা তিনি মনে মনে চিন্তা করিলেন।

সুলতান সেখজীর নির্দ্দেশমত স্নান করার পর দেখিলেন যেন তিনি এক পর্ব্বতের পাদদেশে রহিয়াছেন, ইহা আগেই বলিয়াছি।

তাহার পর সুলতান ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া একটি স্থানে গেলেন, সেখানে দেখিতে পাইলেন যে, কয়েকজন লোক কাঠ কাটিতেছে। তিনি যে রাজা তাহা তাঁহার বেশ মনে ছিল। তিনি তাহাদের নিকট নিজের প্রকৃত পরিচয় গোপন রাখিতে ইচ্ছা করিলেন। ঐ সকল লোকের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল,

তিনি বলিলেন যে, তিনি বণিক, যে জাহাজে তিনি সমুদ্র পার হইতেছিলেন তাহা ডুবিয়া যাওয়াতে তিনি এইরূপ বিপন্ন দশায় পড়িয়াছেন। এই কথা শুনিয়া ঐ সকল লোকের মনে দয়া উৎপন্ন হইল, কিন্তু তাহাদের সাহায্য করিবার ক্ষমতা কতটুকু? তথাপি তাহারা সকলেই কিছু না কিছু দিল—কেহ কাপড় দিল, কেহ জুতা দিল ইত্যাদি। ইহার পর ঐ পর্ব্বতের অপরদিকে তাহাদের নিজ বাসস্থান যে নগরে ছিল সেখানে নিয়া গেল। এই নগরে তাঁহাকে পোঁছাইয়া তাহারা নিজ নিজ স্থানে চলিয়া গেল।

সুলতান এই নগরের সব জিনিষ একটি একটি করিয়া দেখিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার মনে ভয়ানক উদ্বেগ ছিল, তাই তিনি ঐ নগরে উপস্থিত হইয়া নানা পথে ঘুরিতে লাগিলেন। ঘুরিতে ঘুরিতে ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। সেখানে একজন কারিকরের বাড়ী দেখিতে পাইলেন ও লোকটিকে বাহির হইতে ডাকিলেন। লোকটি আসিয়া তাঁহাকে দেখিয়াই সর্ব্বপ্রথম তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল। সুলতান পূর্ব্বের ন্যায় নিজের পরিচয় দিলেন। তাহা ছাড়া কাঠুরিয়াদের সঙ্গে যে সব কথাবার্ত্তা হইয়াছিল তাহাও বলিলেন। কারিকর তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া বলিল, "আমি আপনাকে একটি সৎ পরামর্শ দিতেছি, আপনি তদনুসারে কার্য্য করুন। এইখানে নিকটেই মেয়েদের জন্য একটি সাধারণ স্নানাগার আছে। সেইখানে বহু সংখ্যক মহিলা স্নানার্থে আগমন করেন। আপনি সেখানে উপস্থিত থাকিবেন। তখন ঐ সকল মহিলাদের মধ্যে যাহার পতি নাই এমন কোন মহিলা আপনার পত্নী হইবেন।" সুলতান কারিকরের পরামর্শানুসারে স্নানাগারে যাইয়া একটি সুন্দরীকে দেখিতে পাইলেন—তাঁহার মনে আশার সঞ্চার হইল, কিন্তু জানিতে পারিলেন যে সে বিবাহিতা। পরে একটি কদাকার স্ত্রী স্নান করিতে আসিল, সুলতান জানিতে পারিলেন সেও বিবাহিতা। ইহার পর আরও একটি কদর্য্য মেয়ে উপস্থিত হইল। কিন্তু সেও বিবাহিতা ছিল। সর্ব্বশেষে যে

মেয়েটি আসিয়াছিল সেটি প্রথমটি হইতেও সুন্দরী, কিন্তু অবিবাহিতা। সুলতান মনে করিলেন এইটি বোধ হয় তাঁহার স্ত্রী হইবে। কিন্তু বস্তুতঃ মেয়েটি সুলতানকে ঘৃণা করিয়া অন্যত্র চলিয়া গেল।

ইহার পর একটি ক্রীতদাস আসিয়া তাঁহাকে ডাকাতে তাহার আহ্বান অনুসারে সুলতান ঐ স্থান হইতে বাহির হইয়া একটি বিশাল রাজপ্রাসাদে উপস্থিত হইলেন। ঐখানে যাইয়া রাজমহালের দ্বারদেশে দুই ঘণ্টা প্রতীক্ষা করিবার পর দেখিলেন চারিটি রমণী আসিতেছে, তাহাদের সঙ্গে অন্য একটি অপ্রাকৃত সৌন্দর্য্যময়ী রমণী বিদ্যমান ছিলেন। ইহাকে দেখিয়াই সুলতান চিনিতে পারিলেন, এইটি সেই স্নানাগারের অবিবাহিতা চতুর্থ মেয়ে। মেয়েটি সুলতানকে বলিল, "এই রাজপ্রাসাদ আপনারই। আমি তখন বেশভূষায় সজ্জিত ছিলাম না। তাই একটু বিলম্ব হইল। এখানে যাহা দেখিতেছেন সবই আপনার, আমিও আপনার দাসী, আদেশ করুন।" ইহার পর নাপিত ডাকাইয়া সুলতানের ক্ষৌরকর্ম্ম করা হইল ও ভাল ভাল পোষাক-পরিচ্ছদ তাঁহাকে পরান হইল, নানা প্রকার ফল মিষ্টান্ন দ্বারা ভোজনের ব্যবস্থা করা হইল, সঙ্গীত নৃত্যাদি দ্বারা তাঁহার চিত্ত-রঞ্জনের আয়োজন করা হইল। ঐ মেয়েটি স্বয়ং বীণা বাজাইলেন। এই সব ব্যাপারে সুলতান একেবারে মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন।

ইহার পর একটি ইহুদী বস্ত্র বিক্রেতা আসিল—তাহার নিকট হইতে পছন্দ করিয়া বস্ত্র ক্রয় করা হইল। সুলতান পরিলেন, সেই মেয়েটিও পরিল, বেশ আনন্দের সহিত তাঁহারা উভয়ে সময় কাটাইতে লাগিলেন। এইভাবে কয়েক বৎসর জীবিত ছিলেন। ইতিমধ্যে কয়েকটি পুত্রও তাঁহার হইয়াছিল, কিন্তু অবস্থা বিপর্য্যয় ঘটাতে অমিতব্যয়বশতঃ আবার তিনি দরিদ্র হইয়া পড়িলেন।

বহুদিন পর সুলতান আবার সেই পূর্ব্বপরিচিত কারিকরকে স্মরণ করিয়া তাহার সঙ্গে দেখা করিতে গেলেন। সুলতান এখন দরিদ্র-অবস্থাপন্ন। যে সামান্য কিছু পয়সা ছিল তাহাও এখন আর নাই।

ইহার পর তিনি সাধারণ কুলীর বৃত্তি অবলম্বন করিলেন। যাহা হউক একদিন চলিতে চলিতে তিনি সমুদ্রের তীরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে সেখজীর গুপ্ত বিজ্ঞানের প্রভাবে নিজের দুর্দ্দশা দেখিতে পাইলেন। ইচ্ছা ছিল নমাজ পড়িবেন কিন্তু তাহার পূর্ব্বে স্নান করা তো চাই। সমুদ্রে অবগাহন করিলেন। কিন্তু সমুদ্র হইতে উত্থিত হইয়াই তিনি স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন, তিনি নিজ রাজপ্রাসাদেই আছেন। দেখিতে পাইলেন, সেইখানে সেখজী বসিয়া আছেন। সেখজীকে দেখিবামাত্র পূর্ব্ব সংস্কার অনুসারে তাঁহার ক্রোধভাবের উদয় হইল। পরে বুঝিতে পারিলেন ইহা মুহূর্ত্তের ব্যাপার। সকলেই ইহা সমর্থন করিল।

সুলতান বলিলেন, "বহু বৎসর আমি বিদেশে ঘুরিয়া আসিয়াছি। বিবাহ করিয়াছি, কয়েকটি ছেলে ও কয়েকটি মেয়ে আছে। তবে কুলী হওয়া বড় কষ্ট, এখনও তাহা মনে পড়ে।" তিনি সেখজীর কথা বিশ্বাস করিলেন না। তাঁহার প্রাণনাশ করিতে সঙ্কল্প করিলেন। সেখজী বলিলেন, "আচ্ছা, আমি কার্য্য দ্বারা আপনাকে সব দেখাইব।" এই বলিয়া গামলার জলে মাথা ডুবাইলেন। মাথা উঠাইলেই সুলতান তাঁহার শিরশ্ছেদ করিবেন।

ইহার পর তিনি সেইখান হইতে অন্তর্হিত হইয়া মুহূর্ত্তের মধ্যে দামাস্কাস্ সহরে উপনীত হইলেন। যে বিদ্যা দ্বারা অন্তর্ধান হওয়া যায় তাহা তাঁহার আয়ত্ত ছিল। দামাস্কাস্ হইতে সুলতানকে পত্র লিখিলেন, "সুলতান, তুমি মাথা ডুবাইতেই বহু বৎসর কাটিয়া গেল। বিবাহ হইল, কত ছেলে কত মেয়ে জন্মাইল, নানা প্রকার সুখ দুঃখের ঘটনা ঘটিল, ইহা মুহূর্ত্তের ব্যাপার। মহম্মদ সাহেবেরও তাহাই হইয়াছিল, ভগবানের পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়। যিনি শূন্য হইতে শুধু একটি শব্দ দ্বারা বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছেন তাঁহার পক্ষে অসম্ভব কি আছে? এই শব্দটিকে বলে কুন্ অর্থাৎ 'হও'। এই শব্দের সঙ্গে সঙ্গেই সমগ্র বিশ্ব ফুটিয়া উঠিল, ইহাই তাৎপর্য্য।

প্রকৃতির অবয়ব সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ। এই তিনটি গুণের মধ্যে তমো-গুণের ধর্ম্ম গুরুত্ব এবং আবরণ, কিন্তু সত্ত্ব গুণের ধর্ম্ম ঠিক ইহার বিপরীত অর্থাৎ লঘুত্ব এবং প্রকাশ। ক্রিয়াশীল রজোগুণ উভয়ের মধ্যে থাকিয়া সত্ত্বকে তমতে এবং তমকে সত্ত্বে নিয়া যাইতে চেষ্টা করে। তপস্যা, যোগ ক্রিয়া, প্রার্থনা, ধ্যান প্রভৃতি সত্ত্বগুণাশ্রিত রজোগুণের ক্রিয়া। এই ক্রিয়ার প্রভাবে সত্ত্বগুণের আধিক্য হয় বলিয়া তমোগুণ অভিভূত হয়, তাই দেহের গুরুত্ব কমিয়া আসে এবং দেহ ক্রমশঃ প্রকাশময় সত্ত্বগুণে পরিণতি লাভ করে। ইহার ফলে যে আবরণ স্থূল দেহকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে তাহা অপসারিত হয় ও দেহ শুধুই যে হালকা হয় তাহা নহে তেজোময় অবস্থাও লাভ করে। ইহা একটু বেশী পরিমাণে হইলে দেহ নিরাবরণ হয়। দেহের এই লঘুত্ব দেহস্থিত সত্ত্বগুণের উৎকর্ষ লাভ হইতেই হইয়া থাকে। এই উৎকর্ষ লাভ প্রাণায়ামের দ্বারা, জপের দ্বারা, ধ্যানের দ্বারা অথবা অন্য কোন উপায়েও হইতে পারে। যতক্ষণ দেহ সত্ত্বগুণ-প্রধান থাকে ততক্ষণ তেজোময় বা শুদ্ধ জ্যোতির্ম্ময় থাকে এবং তাহার উপর মাধ্যাকর্ষণের ক্রিয়া খুব কমই অনুভূত হয়; ইহারই নাম দেহের লঘুতা। ইহার ফলে দেহ বায়ুসমুদ্রে উর্দ্ধ দিকে উত্থিত হইতে চেষ্টা করে। দেহের লঘুতা অত্যন্ত অধিক হইলে দেহ জ্যোতির্ম্ময় হইয়া এবং গুরুত্ব বর্জ্জিত হইয়া বায়ুমণ্ডলের উর্দ্ধ স্তরে উঠিয়া যায়। এই সময়ে তমোগুণ অত্যন্ত অভিভূত থাকে। ইহারই নাম দেহের উত্থান। কুণ্ডলিনী শক্তি প্রবলভাবে জাগ্রৎ হইলে ইহা স্বভাবতঃই ঘটিয়া থাকে। কুণ্ডলিনী শক্তির সুপ্তি ভঙ্গ হইলে উহার চৈতন্য শক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করে। চৈতন্যশক্তিসমন্বিত দেহই চেতন দেহ। দেহের এই চেতনতা সাময়িক না হইয়া স্থায়ী হইলে দেহের অণু-পরমাণু পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়।

কুম্ভকের ফলেও কাহারও কাহারও আসন ভূতল হইতে কতকটা উত্থিত হয়। আমাদের চারিদিকে যে বায়ুমণ্ডল রহিয়াছে ঐ বায়ু হইতে আমাদের আভ্যন্তরীণ বায়ু হালকা হইলে দেহ স্বভাবতঃই বায়ুমণ্ডলের

ঊর্দ্ধ দিকে উঠিতে চেষ্টা করে। মূলাধারস্থিত কুণ্ডলিনীরূপ চিদগ্নি প্রজ্বলিত হইলে ভিতরের বায়ু ঐ অগ্নির তাপে তপ্ত হইয়া লঘুত্ব প্রাপ্ত হয়। দেহের উপাদান সত্বগুণে রূপান্তরিত হইলে বায়ুর সঙ্গে সঙ্গে দেহও উত্থিত হয়, কিন্তু দেহ উত্থিত হইলেই আকাশ গমন বা আকাশে সঞ্চরণ সিদ্ধ হয় না। তাহার জন্য আরও অধিক প্রয়াস আবশ্যক।

বিষয়টি আরও পরিষ্কার করিয়া বলিতে চেষ্টা করিতেছি। বিশ্ব জগৎকে আশ্রয় করিয়া সৃষ্টি অবস্থায় যেমন দুইটি বিরুদ্ধ শক্তি ক্রিয়া করিয়া থাকে তেমনি আমাদের জীব-দেহকে আশ্রয় করিয়াও নিরন্তর দুইটি বিরুদ্ধ শক্তির ক্রিয়া হইয়া থাকে। এই দুইটি শক্তির মধ্যে পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকে। যখন একটি প্রবল হয় তখন অপরটি ক্রমশঃ অভিভূত হইতে থাকে। ক্রমশঃ এমন এক সময় আসে যখন ঐ প্রবল শক্তিই বিরাজ করে। কিন্তু ইহার পরে ঐ অভিভূত শক্তি আবার ধীরে ধীরে জাগিয়া উঠে। তখন ঐ শক্তিই প্রবল হয়, প্রথম শক্তি ধীরে ধীরে ক্ষীণ হইয়া লুপ্তপ্রায় হয়। পরে একটি সময় আসে যখন দ্বিতীয় শক্তিরই প্রাধান্য থাকে, প্রথম শক্তি নামমাত্র অবশিষ্ট থাকে। এই প্রকার আবর্ত্তন নিরন্তর চলিতেছে। জীব দেহে সর্ব্বত্রই এই খেলা দেখিতে পাওয়া যায়, জড়ের মধ্যেও অনেকাংশে তাহাই। এই আবর্ত্তনের নামই শুদ্ধ ভাষায় কালচক্রের আবর্ত্তন। উঠা-নামা বা ভিতরে আসা বাহিরে যাওয়া ইহার স্বভাব। এই আবর্ত্তনের বাহিরে যাইতে হইলে মধ্য পথকে আশ্রয় করিতে হয়। মধ্য পথ বলিতে বুঝায় সন্ধি, যেখানে উভয়ের সমভাব বিদ্যমান। দিন ও রাত্রির মধ্যে অথবা রাত্রি ও দিনের মধ্যে যেমন সন্ধি আছে তেমনি এই দুইটি বিরুদ্ধ শক্তির মধ্যেও একটা সন্ধিস্থান আছে। যে কোন কৌশলেই হউক এই দুইটি বিরুদ্ধ শক্তিকে সাম্য অবস্থায় আনিতে পারিলে সন্ধির সন্ধান পাওয়া যায়। তখন মধ্যম মার্গ প্রাপ্ত হওয়া যায়, যাহাকে বুদ্ধদেব বলিতেন 'মধ্যম প্রতিপদ' এবং যাহাকে আশ্রয় না করিয়া

কোন যোগীই যোগ সম্পত্তি লাভ করিতে পারে না। এই মধ্যম পথটি পাইলেই ঊর্দ্ধ গতির আরম্ভ হয়। মধ্যম পথকে পাওয়াও যা আর কুণ্ডলিনীর উদ্বোধনও তাহাই। ইহাই মার্গ সত্য। ঊর্দ্ধ গতি ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে পাইতে দেহের ঊর্দ্ধ সীমায় পর্য্যবসিত হয়। ইহাকেই বলে মেরুশিখর। আমাদের যোগ ভাষাতে ইহাই হইল আজ্ঞাচক্র ভেদ, যাহার ফলে সহস্রদলের মহাবিন্দুতে স্থিতি সম্ভবপর হয়। আসন উত্থান প্রভৃতি এই ঊর্দ্ধগতির সমকালীন ব্যাপার। ইহার পর ঐ মেরুশিখরস্থিত তেজ অনন্ত আকাশে চারিদিকে ছড়াইয়া যায়। ইহারই নাম ব্যাপ্তি। আকাশ গমন প্রভৃতি এই ব্যাপ্তিরই পূর্ব্বকালীন আনুষঙ্গিক ব্যাপারমাত্র। খেচরী অবস্থার পূর্ণতা হইলে ব্যাপ্তি স্বভাবতঃই প্রকাশিত হয়। পূর্ব্বে যাহা বলা হইল তাহা অনুধাবন করিলে আসন উত্থান ও আকাশ গমনের সহিত ভগবৎ সম্বন্ধ কি প্রকার তাহা কিছু কিছু বুঝা যাইবে। আসল কথা এই—বিরোধের সমন্বয় ব্যতীত ঊর্দ্ধগতির সূত্রপাত হয় না।

যোগবাশিষ্ঠে আছে যে, আকাশ গমনাদি শক্তি জীবন্মুক্ত দেহের হয় না—আত্মবিৎ ঐ সকল শক্তি চান না। উহা বস্তুস্বভাব। আত্মজ্ঞান বা মুক্তি না হইলেও আকাশ গমনাদি দ্রব্য, মন্ত্র, ক্রিয়া ও কালশক্তি হইতে উদ্ভূত হইতে পারে। দ্রব্যশক্তি, যেমন মণি, ঔষধাদি। গুটিকাসিদ্ধবিদ্ জানেন যে যথাবিধি নির্ম্মিত সংস্কারযুক্ত পারদের গুটিকার প্রভাবে দেহের ঊর্দ্ধগতি হয়, এমন কি খেচরীত্বও হইতে পারে। মন্ত্র অর্থাৎ মন্ত্রশক্তি। মন্ত্রশক্তি দ্বারাও আকাশগতি সম্ভবপর। ক্রিয়া বলিতে এখানে যোগাভ্যাসাদি বুঝিতে হইবে। কাল শক্তির প্রভাবও অচিন্ত্য। তাই বলা হইয়াছে—

অনাত্মবিৎ অমুক্তোপি নভোবিহরণাদিকম্।
দ্রব্যকর্ম্ম ক্রিয়াকাল শক্ত্যা প্রাপ্নোতি রাঘব॥

তত্ত্বজ্ঞ বা অ তত্ত্বজ্ঞ ক্রমানুসারে সাধন করিলে (মন্ত্র, দ্রব্য, ক্রিয়াদি দ্বারা) ঊর্দ্ধগত্যাদি লাভ করিতে পারে। নভোগতি, সিদ্ধি,

কাল—এই সব আত্মজ্ঞ চান না। নিয়তির ক্রমানুসারে এই সব সিদ্ধি হয়—ইহা সত্য। দেবাদির খেচরতাদি বস্তু স্বভাব বা স্বতঃসিদ্ধ।

পাতঞ্জল মতে আকাশ গমন করিতে হইলে দেহ ও আকাশের মধ্যে পরস্পর যে সম্বন্ধ আছে তাহাতে সংযম (ধারণা-ধ্যান-সমাধি) করিয়া তাহাকে আয়ত্ত করিতে হয়। আসনাদিতে বা যেখানেই দেহ থাকুক সেখানে আকাশও আছে, কারণ আকাশ সর্ব্বব্যাপক ও সকল বস্তুর অবকাশদায়ক। আকাশের সঙ্গে দেহের ব্যাপ্তিরূপ যে সংবন্ধ আছে উহাকে একাগ্র চিন্তা দ্বারা নিজের ইচ্ছার অধীন করিতে হয়। তখন সঙ্গে সঙ্গে দেহ হাল্কা হইয়া যায়, মাধ্যাকর্ষণের ক্রিয়া ক্ষীণ হইয়া যায়। এতদ্ব্যতীত তুলা প্রভৃতি পরমাণু পর্য্যন্ত অত্যন্ত লঘু পদার্থে চিত্ত সমাহিত হইলেও দেহ লঘুতা প্রাপ্ত হয়। তখন মাকড়সার তাঁতে সঞ্চরণ করিবার সামর্থ্য জন্মে। তারপর সূর্য্যরশ্মিতে বিহার করিতে পারা যায়। বস্তুতঃ এই সকল রশ্মিই সাধারণতঃ আকাশে গমনাগমনের মার্গস্বরূপ।

বৌদ্ধ আচার্য্যগণ আকাশ গমনের তত্ত্ব সম্বন্ধে বহু আলোচনা করিয়াছেন। বুদ্ধদেবের ছয়টি অভিজ্ঞা ছিল—তন্মধ্যে একটির নাম ঋদ্ধি। বস্তুতঃ প্রথম অভিজ্ঞাই ঋদ্ধি পদবাচ্য। এই অভিজ্ঞাটি যোগী মাত্রেরই হইতে পারিত, তাহার জন্য আর্য্য ও অনার্য্য কোন ভেদ ছিল না। অর্থাৎ বুদ্ধোপদিষ্ট ধর্ম্ম গ্রহণ না করিয়াও ঋদ্ধি প্রাপ্ত হওয়া সম্ভবপর ছিল ইহাই অভিপ্রায়। বাস্তবিক পক্ষে ছয়টি অভিজ্ঞার মধ্যে ঋদ্ধি প্রভৃতি প্রথম পাঁচটি অভিজ্ঞাই বৌদ্ধ মতানুসারে অবৌদ্ধেরও হইতে পারে, কিন্তু ষষ্ঠ অভিজ্ঞা বা আস্রব ক্ষয় জ্ঞান (সাক্ষাৎকার, অভিজ্ঞা) আর্য্য অর্থাৎ বৌদ্ধ ভিন্ন অন্যের হইতে পারে না। বৌদ্ধ যোগিগণের মতে আকাশ গমন নামক ঋদ্ধি তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে পারে অর্থাৎ এই গতি তিন প্রকার—

(ক) একটির নাম বহন গতি। পক্ষী যেমন নিজের শরীর দ্বারা

আকাশে আরোহণ করে এইটিও সেই প্রকার গতি। ইহা শ্রাবক ও প্রত্যেক বুদ্ধের হয়।

(খ) দ্বিতীয় গতির নাম অধিমোক্ষ গতি। এই গতি বস্তুতঃ যোগীর নিজ দেহের গতি নহে, ইহা সঙ্কল্প বলে দূরস্থ বস্তুর নিকটে আগমন মাত্র। যোগীকে বস্তুতঃ লক্ষ্য স্থানে যাইতে হয় না, পক্ষান্তরে লক্ষ্য বস্তুই যোগীর নিকটে উপস্থিত হয়।

(গ) মনোবেগ গতি। ইহা একমাত্র শাস্তা বা বুদ্ধেরই হইতে পারে, অন্যের হয় না। বহন গতিতে নিজের দেহকে বহিয়া নিয়া যাইতে হয়। অধিমোক্ষ গতিতে যাইতে হয় না, বস্তুই কাছে আসে অর্থাৎ বস্তুকে টানিয়া আনা হয়। কথায় বলে, মহম্মদ পর্ব্বতের কাছে যায় না, পর্ব্বতই মহম্মদের কাছে আসে। তৃতীয়টি অতি ক্ষিপ্র, তাই অন্যত্র ইহাকে মনোজবিত্ব বলে। যোগসূত্রকার ভগবান্ পতঞ্জলির মতে মনোজবিত্ব ইন্দ্রিয়জয়জন্য মধুপ্রতীক সিদ্ধির অন্তর্গত। ইহাকে কায়ের 'অনুত্তম গতিলাভ' বলিয়া ভাষ্যকার বর্ণনা করিয়াছেন। সিদ্ধ যোগী যে শক্তিদ্বারা যে কোন ক্ষণে যে কোন দূরবর্ত্তী প্রদেশে স্থূল সত্তা লইয়া প্রকট হইতে পারেন তাহার নাম মনোজবিত্ব। পাশুপত যোগিগণ মহেশ্বরের পরম ঐশ্বর্য্যকে জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি এই দুই ভাগে বিভক্ত করেন। তন্মধ্যে মনোজবিত্ব, কামরূপিত্ব ও বিকরণধর্ম্মিতা ভেদে ক্রিয়াশক্তি তিন প্রকার। সিদ্ধ যোগী অসাত্মক দুঃখান্ত বা মহেশ্বরতা লাভ করিতে পারেন। সুতরাং মনোজবিত্ব তাঁহার আয়ত্ত হয়। ইহা বুদ্ধ ভিন্ন অন্যের হয় না। বৌদ্ধগণ ঋদ্ধি বলিতে সমাধিকে লক্ষ্য করেন—ইহার দুইটি ভেদ আছে অর্থাৎ ইহার ফল আকাশ গমন ও নির্ম্মিত অর্থাৎ ইচ্ছানুসারে কায়াদি রচনা এই উভয়ই হইতে পারে।

তিব্বতে এখনও লামাদের মধ্যে আকাশ গমনের পূর্ব্বাভাসরূপ দেহের লাঘব নিবন্ধন ক্ষিপ্রগতির সাধনা কেহ কেহ জানেন। এই প্রক্রিয়াকে তিব্বতী ভাষাতে লাং-গোম বলে। যে এই ভাবে সঞ্চরণ

করে তাহাকে লাং-গোম-পা বলে। অ্যালেকজান্দ্রা ডেভিড নাল্ তিব্বতে অবস্থানকালে এইরূপ তিনজন সিদ্ধ পুরুষের দর্শন পাইয়াছিলেন ও তাঁহাদের গতিও লক্ষ্য করিয়াছিলেন। ইহার বর্ণনা তিনি নিজের গ্রন্থের (উইথ্ মিষ্টিক্স এণ্ড ম্যাজিসিয়ানস্ ইন্ টিবেট) ষষ্ঠ অধ্যায়ে দিয়াছেন। এই গতি যে আকাশ গমনেরই প্রাথমিক একটি রূপ তাহার কারণ এই যে, এই প্রকার গমনকালে ভূমি স্পর্শ হয় না ও গমনকারীর চিত্ত লক্ষ্যে একাগ্র থাকে। তিনি বলিয়াছেন—"As a result of long years of practice, after he has travelled over a certain distance the feet of the Lang-gom-pa no longer touches the ground he glides on air with an extreme alacrity." অর্থাৎ দীর্ঘকাল অভ্যাসের ফলে, কিছুদূর চলিবার পর, লাং-গোম্-পার চরণ আর ভূমিস্পর্শ করে না এবং সে বায়ুমণ্ডল ভেদ করিয়া বিনা আয়াসে ও তীব্রবেগে অগ্রসর হইতে থাকে।

মহাজ্ঞানের অবতরণ

পৃথিবীর সকল দেশেই প্রাচীনকাল হইতেই জ্ঞানের সর্ব্বাতিশায়ী মহিমা উদ্ঘোষিত হইয়া আসিতেছে। বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, ধর্ম্মনিষ্ঠ সাধক, আত্মতত্ত্বান্বেষী যোগী সকলেই জ্ঞানের অন্বেষণে তৎপর রহিয়াছেন। এই জ্ঞানের মধ্যে স্বগত ভেদ তো আছেই, তাছাড়া প্রতি জ্ঞানের ধারাতেও বহু অবান্তর ভেদ রহিয়াছে। তারপর প্রতি ভেদের মধ্যেও অভিব্যক্তির দিক দিয়া দেখিলে মাত্রাগত ভেদ রহিয়াছে। জ্ঞান বাহ্যবস্তু বিষয়ক হইতে পারে, আভ্যন্তর সংস্থান বিষয়ক হইতে পারে এবং বাহিরের ও ভিতরের অতীত অর্থাৎ বিশ্বাতীত সত্তা বিষয়েও হইতে পারে। জ্ঞানের প্রকারভেদ যাহাই হউক না কেন, প্রতি ক্ষেত্রেই জ্ঞানের মহিমা সর্ব্ববাদি সিদ্ধ।

আমরা জ্ঞানের অবান্তর বৈচিত্র্যের দিকে দৃষ্টি না দিয়া শুধু জ্ঞানের স্বরূপের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া জ্ঞানের আবির্ভাব সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিব।

সাধারণতঃ ঔপদেশিক ও অনৌপদেশিক ভেদে জ্ঞানকে দুই প্রকারে বিভক্ত করা যাইতে পারে। ঔপদেশিক জ্ঞানের মূল গুরু অথবা গুরুকল্প মহাত্মার উপদেশাত্মক শব্দ। সুতরাং ইহা স্পষ্টতঃই শব্দ-জ্ঞানরূপে পরিগণিত হইয়া থাকে। কিন্তু অনৌপদেশিক জ্ঞান সাধারণতঃ পরিচিত শব্দরাশি হইতে উত্থিত হয় না, উহা নিজের বিবেক হইতে উত্থিত হয়। ইহাকে প্রাতিভ জ্ঞান অর্থাৎ ইনটুইসান বলা হইয়া থাকে। সাধারণ দৃষ্টিতে এই অনৌপদেশিক জ্ঞান জ্ঞানের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ঔপদেশিক জ্ঞান পরম্পরাক্রমে শাস্ত্র ও গ্রন্থাদির দ্বারা প্রকাশিত হইয়া থাকে, কিন্তু অনৌপদেশিক জ্ঞান জিজ্ঞাসু হৃদয়ে

স্বতঃস্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হয়। চিত্তশুদ্ধি থাকিলে এই জ্ঞানে ভ্রম প্রমাদাদি থাকিবার সম্ভাবনা নিবৃত্ত হইয়া যায়। জ্ঞানের এই বিশ্লেষণ সকলেরই পরিচিত, কিন্তু এই জ্ঞান যতই মুল্যবান হউক না কেন পরম জ্ঞানরূপে বর্ণিত হইবার যোগ্য নহে। কারণ এই জ্ঞানের প্রভাবে অজ্ঞানের পূর্ণ নিবৃত্তি সম্ভবপর হয় না। কৈবল্য-মুক্তি লাভ, কর্ম্মক্ষয় অথবা সংসার ধর্ম্ম হইতে চির অব্যাহতি, ইহাও জ্ঞানের পূর্ণতার নিদর্শন নহে। কারণ শুষ্ক জ্ঞান জীবকে মায়া রাজ্য হইতে অবশ্যই মুক্তি দিতে পারে, কিন্তু পূর্ণতা দিতে পারে না। দিব্যজ্ঞান ভিন্ন পূর্ণত্ব লাভ, অথবা মানব জীবনের পূর্ণ সার্থকতা, কখনই ঘটিতে পারে না। শুষ্ক জ্ঞান হয় পশুজ্ঞান, নয় পাশজ্ঞান অর্থাৎ পশু বা জীবের প্রযত্ন-জনিত এবং তৎ সম্বন্ধ জ্ঞান বিশেষ। তপস্যা, আরাধনা, বিবিধ কর্ম্ম, ভজন প্রভৃতি হইতে এই জ্ঞানের উদ্ভব হইয়া থাকে। ইহারও সার্থকতা আছে। কিন্তু আত্মার পরম স্বরূপ যে শিবত্ব বা ভগবত্তা তাহা ইহা দ্বারা অভিব্যক্ত হয় না। জাগতিক সকল প্রকার বন্ধনই পাশের অন্তর্গত। সুতরাং জাগতিক পদার্থকে আশ্রয় করিয়া যে জ্ঞানের উদয় হয় তাহা কখনই পাশমুক্ত শিবরূপী আত্মার পরম স্বরূপ উন্মীলিত করিতে পারে না। একমাত্র শিবজ্ঞানই চরম দৃষ্টিতে সম্যক্ জ্ঞানরূপে গণ্য হইতে পারে। শিবজ্ঞান বলিতে ইহাই বুঝায় যে আত্মা স্বয়ংই অনন্ত শক্তিসম্পন্ন নিত্যমুক্ত শিব বা পরমেশ্বরের সহিত অভিন্ন এই জ্ঞান। এই জ্ঞানটি শ্রীভগবানের অনুগ্রহ ব্যতীত জীবের পক্ষে প্রাপ্ত হওয়া অসম্ভব। শাস্ত্রে আছে—"ঈশ্বরানুগ্রহাদেব পুংসামদ্বৈতবাসনা।" কথাটা খুবই সত্য। শ্রীভগবানের মহাকরুণা ব্যতিরেকে এই শিবজ্ঞানের উদয় জীবের পক্ষে প্রাপ্ত হওয়া সম্ভবপর নহে।

এইবার এই শিবজ্ঞানরূপী মহাজ্ঞানের কথাই একটু বিশদভাবে বুঝিতে চেষ্টা করিব।

এই যে জ্ঞান, ইহা বোধরূপ এবং শিবের সহিত অভিন্ন। ইহারই নামান্তর শৈবীশক্তি বা মহাশক্তি। ইহা মহাশক্তিরূপা মহাবিদ্যা

সর্ব্বপ্রকারে পরমেশ্বরের সহিত অভিন্ন হইয়াও জীব ও জগতের কল্যাণের জন্য বহির্মুখে এবং নিম্নাভিমুখে সঞ্চারিত হয়। সৃষ্টির সময়ে এবং সৃষ্টির পরে নিরন্তর জ্ঞানের এই অবতরণ লীলা চলিতে থাকে।

শাস্ত্রীয় পরিভাষাতে এই জ্ঞান পরাবাক্ রূপে প্রসিদ্ধ। এই পরাবাকের দুইটি দিক আছে। একটি পরমেশ্বরের সঙ্গে নিত্যযুক্ত ও অভিন্নস্বরূপ এবং আর একটি ক্রমশঃ বাহিরের দিকে প্রসরণশীল। পরাবাক্ অবস্থা মূলতঃ শ্রীভগবানের স্বরূপ স্থিতিরই অবস্থা। অন্তর্মুখে মহা প্রজ্ঞারূপে এই বাক্ পরম স্বরূপে নিহিত রহিয়াছে, এবং বহির্মুখে মহাকরুণা রূপে ইহা জীব ও জগতের অভিমুখে ধাবিত হইয়াছে। যিনি প্রজ্ঞা তিনিই করুণা, সুতরাং করুণার স্রোতে প্রজ্ঞাই বহিতে থাকে ইহা বলাই বাহুল্য। গঙ্গার উদ্ভব বিষ্ণুপদে হইলেও গঙ্গার অবতরণ হইয়াছিল শিবের শিরোদেশে। এই গঙ্গাই জ্ঞানগঙ্গা এবং যখন তিনি অবতীর্ণ হইয়াছিলেন তখন তিনি করুণার রসধারারূপে নামিয়া আসিয়াছিলেন। জীবের সামর্থ্য নাই এই মহাকরুণা ধারণ করে, তাই জীবের পরমস্বরূপ স্বয়ং শিব এই করুণার ধারাকে ধারণ করিয়াছিলেন। সুতরাং বাহ্য গঙ্গার অবতরণও যাহা জ্ঞানগঙ্গার অবতরণও ঠিক তাহাই। ইহারই নাম পরাবাকের অবতরণ।

যখন মহাজ্ঞান পরাবাকের ভূমি হইতে অবতীর্ণ হয় তখন প্রথমে উহা কিঞ্চিৎ সঙ্কুচিত হইয়া পশ্যন্তী ভূমিতে উপনীত হয়। এইখান হইতে এক হিসাবে বেদ ও তন্ত্রাদি মূলশাস্ত্রের আবির্ভাব ঘটে বলা যায়। ইহার পর ঐ সঙ্কুচিত অবস্থা আরও সঙ্কুচিত হইয়া মধ্যমাভূমিতে নামিয়া আসে। জগতের যাবতীয় শাস্ত্র এই ভূমিতে বর্ত্তমান থাকে এবং গুরুমণ্ডল এই ভূমি হইতেই ঐ সকল দিব্য জ্ঞানের রাশিকে বৈখরীতে নামাইয়া লইয়া আসেন। তখন উহা সকলের বোধগম্য ভাষাতে প্রচারিত হয়। ইহাই জ্ঞানের অবতরণের আপেক্ষিক বিবরণ।

হৃদয়ই মধ্যমা বাকের লীলাক্ষেত্র। এইস্থানে পশ্যন্তীর ন্যায় জ্যোতির প্রাধান্য থাকে না, কিন্তু আলোর একটা অস্ফুট আভাস থাকে। বলা বাহুল্য, ইহাও নামিবার সময় অনুভব করা যায় না, উঠিবার সময় বুঝিতে পারা যায়। এই ভূমিতে শব্দের সহিত অর্থের ভেদাভেদ সম্বন্ধ থাকে। জ্ঞানের সহিতও ঠিক তাহাই, অর্থাৎ এইস্থানে শব্দ থাকিয়াও অর্থরূপে প্রকাশ পায় এবং অর্থ থাকিয়াও শব্দরূপে আত্মপ্রকাশ করে। তদ্রূপ এই ভূমিতে জ্ঞান জ্ঞেয়রূপে ও জ্ঞেয় জ্ঞানরূপে দৃষ্ট হয়। অথচ উভয়ের নিজস্ব রূপ অক্ষুণ্ণ থাকে। শব্দ এখানে নাদরূপে স্ফুরিত হয়। হৃদয় অনাহত চক্র নামে প্রসিদ্ধ বলিয়া আপাততঃ এই নাদকেও অনাহত বলা যাইতে পারে। ইহার পর সৃষ্টিমুখী গতি আরও তীব্র হইলে মন ও বায়ুর বহির্গতি যখন কণ্ঠ পর্য্যন্ত আসিয়া বাগ্‌যন্ত্রকে স্পর্শ করে তখন উচ্চারণ স্থানে বায়ুর আঘাতবশতঃ বর্ণের অভিব্যক্তি হয়। সুতরাং বর্ণ, বর্ণমূলক পদ বাক্যাদি যাবতীয় ভাষা কণ্ঠ হইতে অভিব্যক্ত হয়। ঐ প্রবাহ ওষ্ঠ ভেদ করিয়া বাহ্য বায়ুমণ্ডলে আসিয়া লীন হইয়া যায়। বহির্মুখী সৃষ্টির গতি এইখানেই শেষ হয়।

হৃদয়ে বাকের যে প্রকাশ ঘটে—তাহার নাম মধ্যমা এবং কণ্ঠে যে প্রকাশ ঘটে তাহার নাম বৈখরী। বৈখরী ভূমিতে শব্দ ও অর্থ পৃথক হইয়া যায়, জ্ঞান ও জ্ঞেয় বা অর্থ পৃথক হইয়া যায় এবং শব্দ ও জ্ঞানও পরস্পর পৃথক্ হইয়া যায়।

যখন জ্ঞান পশ্যন্তী ভূমিতে বিদ্যমান থাকে তখন উহাতে 'ইদং' ভাবের স্ফুরণ থাকে না। একমাত্র পূর্ণ 'অহং' ভাবেরই প্রকাশ নিত্য সিদ্ধরূপে বর্ত্তমান থাকে। বাচ্য ও বাচকের কিঞ্চিৎ ভেদ পশ্যন্তী হইতে মধ্যমায় অবতরণের মুখে অভিব্যক্ত হয়। কিন্তু মধ্যমা ভূমিতে অনেকটা অগ্রসর হইয়া গেলে ঐ বাচ্য-বাচকের ভাব বেদ্য ও বেদকভাবে পরিণত হয়। এই উভয় অবস্থানের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। বেদ্য ও বেদক ভাব পদার্থ ও তৎ বিষয়ক জ্ঞান এই উভয়

কোটি অবলম্বন করিয়া উদিত হয়। এই জন্যই ওঁকারের অথবা ইষ্ট মন্ত্রের সাধনা প্রসঙ্গে সমগ্র বিশ্ব ভেদ করিয়া যখন অর্দ্ধ মাত্রায় প্রবেশ করিবার অবসর আসে, তখন সর্ব্বপ্রথম অর্থ পরমার্থে প্রতিষ্ঠিত হইবার মার্গে জ্ঞানভাবে আরূঢ় হইয়া বাচকশব্দভাবে আরোহণ করে। অবশ্য সর্ব্বান্তে তাহাও থাকে না। তদ্রূপ জ্ঞানের অবতরণ সময় উহারই বিপরীত ক্রমে অর্থ প্রথম বাচক শব্দের দ্বারা অনুবিদ্ধ হইয়া প্রকাশিত হয়, পরে উহা জ্ঞানের জ্ঞেয়রূপে আত্মপ্রকাশ করে। ইহাই বিন্দুর অবস্থা। ইহার পর বৈখরী সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে শব্দ ও জ্ঞান উভয় হইতেই পৃথক্ রূপে অর্থ অবস্থিত হয়। বিশ্বের যাবতীয় জ্ঞান, মূলে বৈখরী ভূমিতে অবতীর্ণ হইবার পূর্ব্বে, মধ্যমা ভূমিতে উল্লসিত হয়।

গুরুর অর্থাৎ গুরুরূপী শিবের পঞ্চবক্ত্র তাঁহার স্বাভাবিক পঞ্চশক্তির মূর্ত্তরূপ। এই পাঁচটি শক্তির নাম—চিৎ, আনন্দ, ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়া। এই পঞ্চ ধারা অবলম্বন করিয়া যাবতীয় জ্ঞান প্রকৃতিগত ভেদ অনুসারে গুরুর মুখ রূপে লক্ষিত হয়, অর্থাৎ গুরুর এক একটি মুখ হইতে এক এক প্রকার জ্ঞানের ধারা বিভিন্ন অবান্তর ভেদবিশিষ্ট হইয়া বহির্জ্জগতে প্রকাশিত হয়। এই জন্যই এই জ্ঞানের অর্থাৎ শিবমুখ-নিঃসৃত এই মহাজ্ঞানের প্রকৃত নাম আগম। এই জ্ঞান প্রকটিত হওয়ার সময়, পরমেশ্বর মূলে অভিন্ন ও অদ্বিতীয় হইলেও গুরু শিষ্য ভাবে আত্মপ্রকাশ করেন। বস্তুতঃ তিনি স্বয়ংই গুরু সাজিয়া জ্ঞান প্রকাশ করেন এবং শিষ্য সাজিয়া ঐ প্রকাশিত জ্ঞানকে গ্রহণ করেন। সদাশিব এই স্থলে গুরুভাবের প্রতীক এবং ঈশ্বর শিষ্যভাবের প্রতীক।

তান্ত্রিক পরম্পরার ভেদ অনুসারে পরিভাষা পৃথক্ পৃথক্ হয় বলিয়া এই গুরু-শিষ্য ভাবাপন্ন সদাশিব ও ঈশ্বর কোন কোন স্থলে বিভিন্ন নামেও প্রকাশিত হইয়া থাকেন। সদাশিব হইতে নির্গত জ্ঞান ঈশ্বর পর্য্যন্ত অবতীর্ণ হইয়া সেই স্থান হইতে বাহিরে সঞ্চারিত

হয়। বাস্তবিক পক্ষে সদাশিব ও ঈশ্বর একই অভিন্ন তত্ত্ব সে বিষয় সন্দেহ নাই। এই সকল ধারা বা স্রোত ভিন্ন স্বরূপবিশিষ্ট। ইহাদের পরস্পর মিশ্রণ হইতে বিভিন্ন প্রকার আম্নায় ও স্রোতের উদ্ভব হইয়া থাকে। অভেদ জ্ঞান যে মুখ হইতে নির্গত হয়, ভেদ জ্ঞান অথবা ভেদাভেদ জ্ঞান সে মুখ হইতে ভিন্ন অন্ন মুখ হইতে নির্গত হয়। এই সব জ্ঞানের ধারা নির্গত হইয়া ক্ষেত্রবিশেষে পরস্পর সঙ্কীর্ণতা লাভ করে ও তদনুরূপ জ্ঞানকে অভিব্যক্ত করে।

মহাজ্ঞান কি প্রকারে অবতীর্ণ হয় তাহা আলোচনা করিতে গিয়া আমরা শিবের পঞ্চমুখ নিঃসৃত পঞ্চস্রোতের পরস্পর মিলনের সন্ধান প্রাপ্ত হই। মধ্যমা ভূমিতে এই সকল সাক্ষাৎ প্রাপ্ত ও পরস্পর সংযোগে অভিব্যক্ত জ্ঞানাত্মক আগমরাশিই বিদ্যমান রহিয়াছে। ইহার অতি অল্প অংশই স্থূল জগতে বৈখরী বাকের মধ্য দিয়া প্রকাশিত হইয়াছে। মধ্যমাতে সর্ব্ব শাস্ত্রের শব্দগত ও ভাবগত রূপ নিত্য বিদ্যমান থাকে। প্রলয়ের সময় বিশ্বরূপ অর্থের ন্যায় বিশ্বশাস্ত্রও কারণ সলিলে ডুবিয়া যায়। তখন অভিনব সৃষ্টি সম্পাদন করিবার জন্য ঐ নিমগ্ন শব্দ রাশিকে পুনর্ব্বার উদ্ধার করিতে হয়। ইহারই নাম মন্ত্রোদ্ধার বা বেদোদ্ধার। এই উদ্ধার কার্য্য গুরুরূপী ভগবান স্বয়ং করেন। 'প্রলয় পয়োধিজলে ধৃতবানসি বেদম্'—এই যে বেদ উদ্ধারের কথা শুনিতে পাওয়া যায় উহা বস্তুতঃ কারণ-লীন শব্দ রাশিকে পুনর্ব্বার কার্য্যরূপে অভিব্যক্ত করা মাত্র। কারণ শব্দ অভিব্যক্ত না হইলে, বাচ্য অর্থের অভিব্যক্তি হইতে পারে না, কারণ শব্দের সৃষ্টি পূর্ব্বে সিদ্ধ হইয়া পরে অর্থ সৃষ্টির সূত্রপাত হইয়া থাকে। সদ্‌গুরু শিষ্যকে দীক্ষা দিবার সময়ও ঠিক উহারই অনুরূপ কার্য্য করিয়া থাকেন। কারণ তাঁহাকেও কারণ-সলিল হইতে মন্ত্র উদ্ধার করিয়া শিষ্যকে দান করিতে হয়। পুস্তক হইতে কোন মন্ত্রের উদ্ধার হয় না এবং হইতেও পারে না। পুস্তকে শুধু সত্য ঘটনার বিবরণমাত্র পাওয়া যায়।

জগতে শাস্ত্ররূপে যুগে যুগে যত জ্ঞানের আবির্ভাব হইয়াছে সেই সকল সময়ের পরিপাকে আবার তিরোহিত হইয়া গিয়াছে। জ্ঞানের তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে অর্থাত্মক প্রপঞ্চেরও প্রলয় ঘটিয়াছে। কিন্তু ইহা বৈখরী বাকের দিক হইতে জানিতে হইবে। বৈখরী বাক্ হইতে মধ্যমা বাকের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ঐ ভূমিতে অর্থাৎ হৃদয়রূপী বিরাট্ আকাশে সকল জ্ঞানই নিত্যস্বরূপে বিধৃত রহিয়াছে। বাস্তবিকপক্ষে কোন জ্ঞানেরই লোপ হয় নাই এবং হইতেও পারে না। শক্তিশালী যোগী ঐ সকল জ্ঞানকে ফুটাইয়া কার্য্যে প্রয়োগ করিতে পারেন।

তন্ত্রশাস্ত্রে এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে যে জ্ঞানের অবতরণের মুখে কোন কোন জ্ঞান ধরাতলে অবতীর্ণ হইবার পূর্ব্বেই কোন প্রবল শক্তির দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া অবতরণের পথে বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছে। ঐ সকল জ্ঞান স্থূল জগতে আসিবার পূর্ব্বেই লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। স্থূল ভূমির কোন পুরুষ স্থূল সত্তাতে উহাকে অন্বেষণ করিয়া বাহির করিতে পারে না, কিন্তু বাস্তবিক উহা নষ্ট হয় নাই। উহা এখনও ভাবজগতে মধ্যমা ভূমিতে বিদ্যমান রহিয়াছে।

তান্ত্রিক জ্ঞানের অবতরণের যে কথা বলা হইল, ঠিক ঐ প্রকার ক্রম অবলম্বন করিয়াই বৈদিক জ্ঞান এবং অন্যান্য যাবতীয় জ্ঞান মূলস্থান হইতে অবতীর্ণ হইয়া জগতে প্রচারিত হইয়াছে। সূক্ষ্মবাক্ সাধারণ লোকের ত দূরের কথা সাধারণ জ্ঞানী এবং যোগীরও অগম্য, কিন্তু যে সকল ঋষি ধর্ম্মের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা ঐসকল জ্ঞান অপরোক্ষ ভাবে প্রাপ্ত হইয়া, উহার সহিত কিছু বিকল্প মিশ্রিত করিয়া বিশ্ব কল্যাণের জন্য সবিকল্প জ্ঞানরূপে জগতে প্রকট করিয়াছেন।

এই সবিকল্প জ্ঞানের মধ্য হইতে শব্দের অংশ যোগবলে অপসারিত করিতে পারিলে বিশুদ্ধ নির্বিকল্প জ্ঞানের অভিব্যক্তি সম্পন্ন হয়।

এই বিকল্পসহকৃত স্থূলজ্ঞান ও তদুপদিষ্ট শাস্ত্র 'বিল্ম' নামে প্রসিদ্ধ।

ইহা বৈখরীরূপে সর্ব্বত্র পরিচিত। এই দৃষ্টিতে দেখিলে তন্ত্রের অবতরণের ন্যায় বেদেরও অবতরণ ঘটিয়া থাকে। তন্ত্র যদি শিবের পঞ্চমুখ হইতে নিঃসৃত হইয়া থাকে, তাহা হইলে বেদ ব্রহ্মার চতুর্মুখ হইতে ঠিক ঐ একই প্রণালী অবলম্বন করিয়া নিঃসৃত হয়।

শাস্ত্র অনুসন্ধান করিলে জানিতে পারা যায় যে, ভক্তি-জ্ঞানও ঠিক এই প্রণালীতেই পাঞ্চরাত্র শাস্ত্ররূপে ভগবান্ নারায়নের মুখ-কমল হইতে বিনির্গত হইয়া থাকে।

খৃষ্টীয় ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের অন্তর্গত কোন কোন গুপ্ত সম্প্রদায় পূর্ব্বানুরূপ জ্ঞানের আবির্ভাবের কথা বলিয়া থাকেন। অন্যান্য ধর্ম্ম সাহিত্যেও অনুরূপ জ্ঞানাবতরণের কথা বর্ণিত হইয়াছে। সুতরাং চিদাকাশরূপ বিষ্ণুপদ হইতে উদ্ভূতা জ্ঞানগঙ্গা জগতে স্থূলরূপে অবতীর্ণ হইবার পূর্ব্বে ব্যোমকেশের ব্যোমরূপী শিরোদেশে অবতীর্ণ হয়। সর্ব্ব সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত এ বিষয়ে প্রায় একই প্রকার।

দেহ ও কর্ম্ম

শ্রীশ্রীগুরুদেব বলিতেন, "শরীরং কেবলং কর্ম্ম শোকমোহাদি-বর্জ্জিতম্।" কর্ম্ম হইতে শরীর হয় ইহা যেন সত্য, তদ্রূপ কর্ম্মের জন্যই শরীর ইহাও তেমনি সত্য। শরীর ব্যতীত কর্ম্মও হয় না, ভোগও হয় না। প্রারব্ধ কর্ম্মের ফল ভোগ করিবার জন্য শরীর গ্রহণ করিতে হয় এবং যতদিন শরীর দ্বারা ঐ ভোগ সমাপ্ত না হয় ততদিন শরীর-ধারণ আবশ্যক হয়। ভোগ-সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে শরীর-পাত ঘটিয়া থাকে। জাতি, আয়ু ও ভোগ এই তিনটি প্রারব্ধের ফল। দেহ-সম্বন্ধই জাতি বা জন্ম এবং এই সম্বন্ধ-বিচ্ছেদই মৃত্যু। উভয়ের অন্তরালবর্ত্তী সময়টি উক্ত সম্বন্ধের স্থিতিকাল। উহাকেই প্রচলিত ভাষাতে আয়ু বলা হয়। সুখ ও দুঃখ, যাহা নিজের নিয়ত-বিপাক প্রাক্তন কর্ম্মবশতঃ আপতিত হয় তাহা, বিনা বিচারে ভোগ করিয়া যাইতে হয়। তবেই উহা কাটিতে পারে। নতুবা ভোগকালেও অভিনব কর্ম্মবীজ সঞ্চিত হইবার সম্ভাবনা থাকে।

যে দেহদ্বারা কর্ম্ম করা হয় তাহা কর্ম্মদেহ, যে দেহদ্বারা কর্ম্মফল সুখ-দুঃখ ভোগ করা হয় তাহা ভোগদেহ, এবং যে দেহে একই সঙ্গে কর্ম্মও হয় ভোগও হয় তাহা মিশ্রদেহ। সাধারণতঃ কামধাতুর দেবাদির, তির্য্যগাদির, প্রেতযোনির, অসুরাদি ও নরকবাসী জীবের দেহ ভোগদেহ। মানুষের দেহ কর্ম্মদেহ ও ভোগদেহ উভয়ই। কর্ম্ম করিয়া অর্থাৎ পুরুষকার প্রয়োগ করিয়া জীবনের পথে অগ্রসর হইবার যোগ্যতা একমাত্র মানুষেরই আছে—অন্য প্রাণীর সে সামর্থ্য নাই। তাই মানুষের এত গৌরব। তত্ত্ববিদ্গণ সেইজন্য নরদেহের এত বেশী

মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য মনুষ্যত্ব, মুমুক্ষুত্ব ও মহাপুরুষ-সংশ্রয়—এই তিনটিকে জীবনের দুর্লভ সম্পৎ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। ভক্ত রামপ্রসাদও—

"মনরে, তুমি কৃষিকাজ জান না,—
এমন মানব জমিন রইল পতিত,
আবাদ করলে ফলত সোনা,"

বলিয়া তাঁহার অমর সঙ্গীতে মনুষ্য-দেহেরই উৎকর্ষ খ্যাপন করিয়াছেন। এই যে 'কৃষিকাজের' কথা বলা হইয়াছে ইহারই নাম কর্ম্ম—মানব দেহকে আশ্রয় করিয়া মনের দ্বারা ইহা সম্পন্ন করিতে হয়, তাই মানব দেহের এত মহত্ত্ব। প্রকৃতির নিয়মে ৮৪ লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিয়া জীব সর্ব্বশেষে মনুষ্য-দেহই প্রাপ্ত হয়। তখন সে কর্ম্মের অধিকারী হয় ও অধ্যাত্ম-যাত্রার পথে অগ্রসর হইবার সুযোগ লাভ করে। তাই হংস গীতাতে আছে—"গুহ্যং ব্রহ্ম তদিদং বো ব্রবীমি, ন মানুষ্যাৎ শ্রেষ্ঠতরং হি কিঞ্চিৎ"। অবিবেকের বশে ভোগ-বাসনা দ্বারা চালিত মানুষ অসংযত জীবন যাপন করিয়া দীর্ঘকাল কৃত কর্ম্মের ফলভোগের জন্য অনুরূপ ভোগদেহ প্রাপ্ত হয় এবং এইভাবে অধঃ, ঊর্দ্ধ ও মধ্যলোক ভ্রমণ করিতে করিতে কদাচিৎ ভোগকালের অবসান মুখে ভাগ্যবশতঃ বিবেকের উদয়ে বিশুদ্ধ কর্ম্ম করিতে সমর্থ হয়। যোগরূপ কর্ম্মই বিশুদ্ধ কর্ম্ম জানিতে হইবে। শুক্ল, কৃষ্ণ ও মিশ্র এই তিন প্রকার কর্ম্ম হইতে তদনুরূপ বিভিন্ন প্রকার গতিলাভ হয়। শুক্ল কর্ম্মই পুণ্য—যাহার ফলে দেবলোকে দেবদেহ ধারণ করিয়া বাসনানুসারে আনন্দভোগের অধিকার জন্মে। তদ্রূপ কৃষ্ণ কর্ম্ম বা পাপের ফলে অধোলোকে গতি হয় ও দুঃখভোগ হয়। মিশ্র কর্ম্মে মধ্যলোকে মনুষ্য-দেহ লাভ হয়। কিন্তু যতক্ষণ অশুক্ল ও অকৃষ্ণ কর্ম্ম অনুষ্ঠিত না হয় ততক্ষণ মানব-দেহের সার্থকতা সম্পন্ন হয় না। পুণ্য বা পাপের জন্য নরদেহ গ্রহণ করা হয় নাই—পুণ্য-পাপের অতীত শুদ্ধ আত্মকর্ম্মের জন্যই এ দেহ ধারণ করা হইয়াছে। যতদিন তাহা না

হইবে ততদিন লোক লোকান্তরে ভ্রমণ করিলেও স্থূল মানবদেহের প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে না।

মনুষ্যদেহই কর্ম্মানুযায়িনী গতির সূত্র। এইখান হইতে ঊর্দ্ধেও যাওয়া যায়, অধঃতেও যাওয়া যায়, বিশ্বের সর্ব্বত্র যাওয়ার পথ পাওয়া যায়। আবার ভাগ্য থাকিলে এইখান হইতেই কর্ম্ম-প্রভাবে এমন পথ পাওয়া যায় যাহা আশ্রয় করিলে আত্মজ্ঞানের বিকাশ হইয়া পূর্ণত্বে প্রতিষ্ঠা লাভ করা যায়।

"যোনেঃ শরীরম্"—যোনি হইতে শরীর উদ্ভূত হয়। নরযোনি শ্রেষ্ঠ যোনি—নরদেহ শ্রেষ্ঠ দেহ। এই দেহ একটি ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড স্বরূপ। যাহা কিছু বাহ্য জগতে আছে তাহা সবই মানুষের দেহে আছে। অতি গভীর পাতাল-রাজ্যের নিম্নস্থ গাঢ়তম অন্ধকার হইতে ঊর্দ্ধতম মহাব্যোমের পরিস্ফুট চিদালোক পর্য্যন্ত এইদেহে বিরাজ করিতেছে—কিছুরই অভাব নাই। পৃথিবীর দেহ মাটীর দেহ, তাহা সত্য, তথাপি ইহাতে প্রকৃতির সকল তত্ত্বই নিগূঢ়ভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে। আত্মার বা পুরুষের ভোগ সেবার জন্য এবং কর্ম্মের জন্য যাহা আবশ্যক সবই দেহে খুঁজিয়া পাওয়া যায়। দেহকে ক্ষেত্র বলা হয়—কারণ মন ও প্রাণের দ্বারা ইহাকে যথাবিধি কর্ষণ করিয়া ইহাতে গুরুদত্ত বীজ বপন করিতে পারিলে ইহা হইতে কল্পবৃক্ষের উৎপত্তি হয় যাহা যথাসময়ে অমৃত ফল প্রসব করে।

চেতন ও অচেতন উভয় সত্তার সংঘর্ষে দেহ উৎপন্ন হয়। লিঙ্গ ও যোনির পরস্পর সন্নিকর্ষ হইতে ইহা জাত হয়। লিঙ্গ অলিঙ্গের চিহ্ন মাত্র। মহালিঙ্গ ও মহাযোনি মূলতঃ এক হইলেও ব্যক্তভাবে লিঙ্গে ও যোনিতে তারতম্য আছে এবং এই তারতম্যমূলক ক্রমিক উৎকর্ষসম্পন্ন ৮৪ লক্ষ স্তর ও তদনুরূপ ৮৪ লক্ষ দেহ বিদ্যমান আছে। বিশুদ্ধ অহংভাবের বিকাশের জন্য প্রকৃতির বিশাল বিজ্ঞানশালাতে এই বিবর্ত্তনের কার্য্য অনুষ্ঠিত হইতেছে। মূল অব্যক্ত সত্তা হইতে শক্তির স্পন্দনে অন্নময় সত্তার আবির্ভাব হয়। অন্নময় সত্তা হইতে

প্রাণময় সত্তার বিকাশ ও প্রাণময় সত্তা হইতে মনোময় সত্তার অভিব্যক্তি এই বিবর্ত্তনের অন্তর্গত। সঙ্গে সঙ্গে দেহেরও ক্রমবিকাশ জানিতে হইবে।

মানবদেহের বিকাশের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত প্রাকৃতিক প্রেরণা হইতেই আপনা আপনি বিকাশ কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। "God made man after His own image" যে বলা হয় তাহার তাৎপর্য্য এই যে মনুষ্যদেহই ভগবৎ স্বরূপের প্রতীক বা আভাস। মনুষ্যত্বের পূর্ণতা হইতেই পূর্ণ ভগবত্তার অভিব্যক্তি হয়। নররূপী আধার ভিন্ন অন্য কোন আধারে অর্থাৎ পশু আদির আধারে দিব্যশক্তির আবির্ভাব সম্ভবপর নহে। অবতারাদির ব্যাপার অন্যরূপ। ভক্ত রামপ্রসাদ যাহাকে কৃষিকার্য্য বলিয়াছেন তাহা একমাত্র নরদেহেই সম্ভবপর হয়, কারণ এই দেহেই অহংভাবের প্রথম স্ফূর্ত্তি হয় এবং এই দেহেই অহংভাবের পূর্ণতা সিদ্ধ হয়। সমস্ত জড় ও জীব জগতের সমষ্টি-সত্তা ঘনীভূত হইয়া মানবদেহ রচিত হয়। মনের ও অহং-ভাবের উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে বাক্‌শক্তি বৈখরীরূপে এই দেহেই প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। বলা বাহুল্য, ইহাই প্রজ্ঞার বীজ। বর্ণাত্মক শব্দের ক্রিয়া এবং বর্ণাত্মক শব্দের বিলয়ন ব্যাপার উভয়ই এই দেহেই হইয়া থাকে। নাদ ও জ্যোতি যে বিন্দু হইতে ফোটে তাহার প্রথম সূচনা মানবদেহেই পাওয়া যায়। কুণ্ডলিনীর স্থিতি এই দেহেই আছে। সুষুম্না নাড়ী ও ষট্‌চক্রের অবস্থান মানবেতর যোনিতে যথাবৎ পাওয়া যায় না। ব্রহ্মচর্য্যের অভ্যাস অন্য দেহে সম্ভবপর নয়। জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি পশু প্রভৃতিতেও হইয়া থাকে, কিন্তু তুরীয় ও তুরীয়াতীত একমাত্র মানবেই সম্ভবে। এইজন্য কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তিরূপ যোগের অভ্যাসও শুধু এই মানবদেহেই হইতে পারে।

প্রকৃত দিব্যদেহ যাহা তাহা মানবদেহেরই বিকাশ মাত্র। মানবদেহই পূর্ণতা প্রাপ্ত হইলে ভগবদ্‌দেহরূপে পরিণত হইয়া থাকে। এই পরিণতি-সাধনে যে উপায় অনুসৃত হয় তাহারই নাম কর্ম্ম।

দেহ চৈতন্য ও জড় সত্তা মিলিতভাবে বিদ্যমান। মানবেতর দেহেও যেমন, মানবদেহেও ঠিক তেমনি। কিন্তু নিম্নদেহে অহং-ভাবের অবয়বরূপ রশ্মিপুঞ্জ ক্রমবিকাশের নিয়মে পরিস্ফুট হয় না। এই সকল রশ্মি দেহস্থ কমলের দলে দলে আপন স্বরূপ প্রকটিত করে। এই সকল বিকীর্ণ রশ্মিকে পৃথক পৃথক ফুটাইয়া একত্র করিতে পারিলেই জ্ঞানজ্যোতির বিকাশ হয় ও দিব্যনেত্র উন্মীলিত হয়। ষট্চক্রভেদের ইহাই তাৎপর্য্য। আভাস অহং ক্রমশঃ বিশুদ্ধ অহংএ পূর্ণতা লাভ করে। মানবজীবনের সফলতা তাই আত্মসাক্ষাৎকার প্রাপ্তি বলিয়া জানিতে হইবে।

রশ্মিসকল মানবদেহে তেজঃ ও কায়াগ্নিরূপে জাগ্রত হয়। পূর্ণভাবে জাগিলে ইহারাই সম্মিলিতভাবে ঋষিগণের বর্ণিত ব্রহ্মবর্চ্চসরূপে উপলব্ধ হয়। বিজ্ঞানবিৎ যোগিগণ ইহাকে তাড়িত শক্তি বা বিদ্যুৎ নামে অভিহিত করেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে মানবদেহে সকল তত্ত্বই বিদ্যমান আছে। আপাততঃ ৩৬ তত্ত্ব না ধরিয়া প্রচলিত ২৪, ২৫ বা ২৬ তত্ত্বই ধরা যাউক। তবে ইহাদের মধ্যে পার্থিব দেহ পৃথিবী তত্ত্বের প্রাধান্য আছে। বলা বাহুল্য, পঞ্চভূতই স্থূল দেহের উপাদানরূপে বিদ্যমান থাকিলেও পার্থিব দেহে পৃথিবীরই প্রাধান্য। পৃথিবীর অংশ অন্যান্য ভূত বা তত্ত্বের অংশের সহিত মিলিতভাবে বিদ্যমান আছে। এই মিলনের বা সংঘাতের মূলে আছে সংস্কারোপহিত শক্তিরূপী চৈতন্যের সংহনন শক্তি। চিৎ ও অচিতের মিলনেই সৃষ্টি—ইহা মনে রাখিতে হইবে। যোগী বা কর্ম্মী যখন আত্মকর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় তখন তাহার ক্রিয়মাণ কর্ম্মের প্রভাবে এই সংঘাতটি ভাঙ্গিয়া যায়—অবশ্য ক্রমশঃ। ফলে চৈতন্যাংশ মুক্ত হয় ও জড়াংশ পৃথক্ হয়। এই পৃথক্করণটি বিবেকের ক্রিয়া।

দুগ্ধ বা দধি মন্থন করিলে যেমন মাখন উত্থিত হয়, যেমন গম ভাঙ্গিলে তাহা হইতে আটা বাহির হয়, তিল ও সর্ষপ ঘানিতে পিষিলে যেমন তৈল বাহির হয়, তদ্রূপ কর্ম্মরূপ মন্থন-ক্রিয়ার প্রভাবে পার্থিব

দেহ হইতে দেহস্থ চিদুজ্জ্বল সত্ত্বাংশ তাড়িত শক্তি রূপে পৃথক্ হয়। ক্রমশঃ জলীয় ও অন্যান্য ভৌতিক অংশ হইতেও সত্ত্বাংশ পৃথক্ হইয়া যায়। স্থূলদেহের সমস্ত সত্ত্বাংশ যতক্ষণ পৃথক না হয় ততক্ষণ মন্থন-ক্রিয়ার প্রয়োজন থাকে। তাহার পরে আর ঐ ক্রিয়া আবশ্যক হয় না। তিলে যে পরিমাণ তৈল নিহিত থাকে তাহার সবটুকু বাহির হইলে আর পেষণের প্রয়োজন থাকে না, কারণ অবশিষ্টাংশ তৈলহীন অসার পিণ্ড মাত্র। তদ্রূপ স্থূলদেহে যে পরিমাণ চৈতন্য শক্তি আবদ্ধ ছিল তাহার সমস্তটা মুক্ত হইলে স্থূল দেহের ক্রিয়ার অবসান স্বভাবতঃই হইয়া থাকে। ইহাই প্রকৃতির নিয়ম। অনন্তকাল বিবেক-ক্রিয়া চলে না। বিবেকমূলক জ্ঞানের উদ্ভব হওয়াই কর্ম্মের উদ্দেশ্য।

ঐ উদ্ভূত তেজঃ বা শক্তি স্থূল দেহের অন্তঃস্থ অপঞ্চীকৃত ভূত ও অন্যান্য তত্ত্বের অভ্যন্তরে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া তাহাদিগকে বিগলিত করে ও স্থায়ী আকারে পরিণত করে। সূক্ষ্মতত্ত্ব সকল সূক্ষ্ম দেহের অবয়ব—কিন্তু ঐ সকল তত্ত্ব হইতে স্থায়ী আকার গঠন এতদিন হয় নাই। তাই প্রকৃত সূক্ষ্মদেহ সাধকের ততদিন প্রাপ্তি ঘটে না যতদিন তাহার স্থূল দেহের কর্ম্মের অবসান না হয়। ঐ সকল তত্ত্ব উপাদান হিসাবে প্রতি মানবেই আছে এবং নিজ নিজ কার্য্য করিতেছে, কিন্তু স্থায়ী দেহ রূপে কার্য্য করে না। দেহরূপে উহারা যখন পরিণত হয় তখন স্থূল শরীরে অভিমানী পুরুষ স্থূলে অভিমান-রহিত হইয়া ঐ সূক্ষ্ম শরীরে অভিমানী হয় ও আপন ইচ্ছানুসারে স্থূল পিণ্ড ত্যাগ করিয়া বাহির হইতে পারে ও ফিরিতে পারে। যোগী ভিন্ন সাধারণ মানুষ ইহা পারে না। তাহার একমাত্র কারণ, স্থায়ী রচনারূপে সূক্ষ্ম শরীর তাহার নাই ও তাহাতে তাহার অভিমানও ক্রিয়াশীল নহে। প্রকৃতির নিয়মে ও প্রেরণাতে স্বপ্নাদি অবস্থাতে সকলেরই সূক্ষ্ম শরীরের গতি ও সঞ্চরণ দৃষ্ট হয়, ইহা সত্য। কিন্তু তাহা বাসনাদিবশতঃ প্রকৃতির প্রভাবে হয়, স্বেচ্ছাতে হয় না। পূর্ব্বে যাহা বলা হইল তাহা সম্পন্ন হইলে স্বেচ্ছাতে যেমন স্থূল জগতে স্থূলদেহ

লইয়া ব্যবহার করা যায়, তদ্রূপ নিজের ইচ্ছা অনুসারে সূক্ষ্ম জগতেও সূক্ষ্মদেহ লইয়া বিচরণ করা যায়।

আনাত্মাতে আত্মবোধরূপ অভিমান যখন স্থূল শরীর অবলম্বন করিয়া কার্য্য করে তখন এই অভিমান হইতেই স্থূল দেহের কর্ম্ম প্রসূত হয়। কিন্তু যখন পূর্ব্বলিখিত নিয়মে একদিকে স্থূল দেহের কর্ম্ম সমাপ্ত হইবে ও অপরদিকে স্থায়ী সূক্ষ্ম দেহ সূক্ষ্ম সত্তার উপাদানে অভিব্যক্ত হইবে তখন ঐ অভিমান স্বভাবতঃ স্থূলদেহ ত্যাগ করিয়া সূক্ষ্ম দেহকে আশ্রয় করিবে। তখন সূক্ষ্ম দেহকেই 'আমি' বলিয়া মনে হইবে ও স্থূলদেহে 'আমি'-বোধ আভাস মাত্র হইয়া যাইবে। কারণ স্থূলদেহ চৈতন্যের অপগমের ফলে তখন শববৎ হইবে। অভিমানশীল সূক্ষ্মদেহ তখন এই শববৎ স্থূল দেহকে নিজের অধীন করিয়া আসনে পরিণত করিবে। ইহাই প্রকৃত শবাসন—পূর্ণ যোগীর যোগ-ক্রিয়ার পরিপুষ্টির জন্য এই আসনই উপযোগী হয়। তখন স্থূল-নিরপেক্ষ অথচ শবাসনীকৃত স্থূলে অধিষ্ঠিত সূক্ষ্ম দেহে কর্ম্ম আরম্ভ হয়।

যদি প্রারব্ধ ভোগ পূর্ব্বেই সমাপ্ত হইয়া যায় ও স্থূল দেহের কর্ম্ম-সমাপ্তির পূর্ব্বেই স্থূল দেহের অন্ত ঘটে তাহা হইলে অবশিষ্ট কর্ম্ম-করিবার জন্য মৃত্যুর পর আবার স্থূলদেহ গ্রহণ করিতে হয়। বলা বাহুল্য, আত্মকর্ম্মই এখানে কর্ম্ম শব্দের লক্ষ্য। আত্মকর্ম্ম না হইয়া অন্য কর্ম্ম হইলে সুখ দুঃখ ভোগের জন্য পুনঃ পুনঃ জন্মান্তরের আশঙ্কা থাকে। পক্ষান্তরে যদি কাহারও স্থূল কর্ম্মের শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রারব্ধও সমাপ্ত হয় ও তাহার ফলে স্থূলদেহ ত্যাগ হয়, তাহা হইলে উহাকে শবাসনরূপে পরিণত করিবার ও তাহাকে অধিষ্ঠান করিয়া সূক্ষ্মদেহে কর্ম্ম করিবার সুযোগ এ জীবনে ঘটে না।

স্থূল কর্ম্ম প্রভাবে যেমন স্থূল ভৌতিক সত্তা হইতে চৈতন্যের নিষ্কর্ষ হয় ও সেই চৈতন্য-শক্তিরূপী অগ্নির তাপে সূক্ষ্ম সত্তা বিগলিত হইয়া আকার ধারণ করে ও স্থায়ীরূপে পরিণতি লাভ করে, তদ্রূপ

সূক্ষ্মদেহে অভিমান উদয়ের পরে সূক্ষ্মদেহে অনুষ্ঠিত কর্ম্মের প্রভাবে সূক্ষ্ম সত্তাতে নিহিত অবিবিক্ত চৈতন্য-শক্তির বিবেচনা হয় ও সেই চৈতন্যশক্তি পূর্ব্বোক্ত পদ্ধতিতে উত্থিত হইয়া কারণ সত্তাকে বিগলিত করে, যাহার ফলে কারণ সত্তা প্রকৃত কারণদেহরূপে পরিণত হয়। যতদিন সূক্ষ্ম সত্তা হইতে তন্নিহিত সমগ্র চৈতন্য বা তেজঃ সমাহৃত না হয় ততদিন সূক্ষ্ম দেহের কর্ম্মের অবসান হয় না। মৃত্যুর পূর্ব্বে যদি সূক্ষ্ম দেহের দ্বারা অনুষ্ঠেয় আত্মকর্ম্ম পরিসমাপ্ত হয় তাহা হইলে সূক্ষ্ম দেহটিও পূর্ব্ববৎ স্থূলের ন্যায় শবরূপে পরিণত হয় ও অভিমান সূক্ষ্মকে ত্যাগ করিয়া কারণদেহকে আশ্রয় করে। 'আমি'টি তখন কারণদেহকে আশ্রয় করিয়া স্থূল ও সূক্ষ্ম এই দুইটি শবাসনের উপর অধিষ্ঠিত হয় ও কারণদেহের কর্ম্ম পূর্ণ করিতে প্রবৃত্ত হয়। সূক্ষ্মদেহের কর্ম্ম এক আসনের কর্ম্ম, কিন্তু কারণদেহের কর্ম্ম দুই আসনের কর্ম্ম।

কিন্তু যদি সূক্ষ্মের কর্ম্ম পূর্ণ হওয়ার পূর্ব্বেই মৃত্যু ঘটে তাহা হইলে কারণ দেহের অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম অনারব্ধ থাকিয়া যায়। স্থূল দেহের কর্ম্ম পূর্ণ না হইয়া দেহপাত হইলেও তদ্রূপ সূক্ষ্মের কর্ম্ম অনারব্ধ থাকে। স্থূলাভিমান থাকিতে থাকিতে স্থূলকর্ম্ম বন্ধ হইলে আবার স্থূলকে গ্রহণ করিবার জন্য মাতৃগর্ভে প্রবেশ করিতে হয়। কিন্তু স্থূলাভিমান নিবৃত্ত হওয়ার পর বা সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু ঘটিলে সাধারণতঃ মাতৃগর্ভে আসিবার প্রয়োজন হয় না। তখন সূক্ষ্মদেহ শবাসনে উপবিষ্ট হইয়াছে। তাই ঐ মৃত্যু প্রকৃত মৃত্যু নহে। সূক্ষ্মাভিমানী শবীভূত স্থূলে উপবিষ্ট যোগী তথাকথিত মৃত্যুর পরেও আসন ত্যাগ করে না—সূক্ষ্ম শরীরে থাকিয়া সে কার্য্য করিতেই থাকে। তাহার কর্ম্মে বাধা হয় না। তবে জীবিত অবস্থাতে থাকিয়া কর্ম্ম করিতে পারিলে কর্ম্ম সমাপ্ত হয় অল্প সময়ে—কারণ ঐ কর্ম্ম কালের কর্ম্ম। উহা ক্ষিপ্র গতিতে অগ্রসর হয়। কিন্তু স্থূল কর্ম্ম সমাপ্ত না করিয়া মৃত্যু ঘটিলে শবাসন লাভ হয় না বলিয়া পুনরায় মাতৃগর্ভে আসিয়া জন্মগ্রহণ করিতে বাধ্য হইতে হয়। অন্য কোন উপায় নাই। অন্ততঃ

একটি শবাসন লাভ করিতে পারিলেও যোগী আসনে বসিতে পারে বলিয়া গর্ভযন্ত্রণা ও কালরাজ্যে প্রবেশের উপদ্রব হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারে। মৃত্যুর ভিতর দিয়াই অমরত্বের মার্গ রহিয়াছে জানিতে হইবে। পশুর মৃত্যুতে অমরত্ব আসে না—পশু "মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি," পুনঃ পুনঃ জঠর-যন্ত্রণা ভোগ তাহার পক্ষে অনিবার্য্য। কিন্তু স্থূলদেহের আবশ্যকীয় কর্ম্ম পূর্ণ করিতে পারিলে ও স্থূলদেহকে শবরূপে আসন করিয়া নিজে তাহাতে অধিষ্ঠিত হইতে পারিলে জন্ম-মৃত্যু বর্জ্জিত হইয়া যায়। কিন্তু কর্ম্মের পূর্ণতা হয় নাই বলিয়া কর্ম্ম বর্জ্জিত হয় না, মহাজ্ঞানও আসে না। আপেক্ষিক খণ্ড জ্ঞান অবশ্য আসে।

প্রশ্ন হইতে পারে—যোগী তখন কোথায় ও কি ভাবে থাকিয়া কর্মের ক্রমিক বিকাশ সম্পন্ন করেন? এই প্রশ্নের বিস্তারিত আলোচনা এখানে সম্ভব নহে। তবে এই স্থানে ইহাই বলিয়া রাখি যে আত্মকর্ম্মের গতিরোধ হয় না ও একবার শবাসন প্রাপ্ত হইলে জন্ম-মৃত্যুর অতীত, কালের অতীত, নির্ম্মল ভূমিতে যোগী আত্মকর্ম্ম পূর্ণ করিতে থাকেন। তবে ঐ কর্ম্ম পূর্ণ করিতে সময় অধিক লাগে। কালের রাজ্যে বিকাশ যত দ্রুত হয় অমর দেহে তত দ্রুত হইবার সম্ভাবনা নাই।

যাহা হউক, আমাদের লক্ষ্য বর্ত্তমান জীবনে কর্ম্ম সমাপ্ত করা ও অভিনব অনন্ত কর্ম্মের ধারাতে প্রবেশ করা। প্রকৃতি হইতে পুরুষকে পৃথক্ করিয়া প্রকৃতি-জন্য কারণদেহ পর্য্যন্ত আয়ত্ত করিতে না পারিলে এই মহালক্ষ্যে উপনীত হইবার আশা নাই। অভিমান কারণদেহকে আশ্রয় করিয়া কারণদেহে কর্ম্মের সূচনা করে। সূক্ষ্মের কর্ম্ম শেষ হওয়ার পর ও সূক্ষ্মদেহ শবাসন হইয়া কারণে অধিষ্ঠিত হওয়ার পর যোগী কারণদেহকেই আশ্রয় করিয়া 'আমি' বলিয়া নিজেকে অনুভব করেন। আত্মকর্ম্ম চলিতেই থাকে এবং কারণ সত্তা বা মূল প্রকৃতিতে নিহিত গুপ্ত চৈতন্য বিবিক্ত হইতে থাকে।

যখন প্রকৃতি-রূপা কারণ সত্তা হইতে চিৎশক্তি বিবিক্ত হয় তখন যোগীকে একটি অনির্ব্বচনীয় স্থিতির সম্মুখীন হইতে হয়। এই অবস্থাতেই জীবাত্মা বা পুরুষের স্বরূপ-জ্ঞান জাগে। পুরুষ যে চতুর্বিংশতি তত্ত্বময়ী প্রকৃতি হইতে বিবিক্ত তাহা তখন স্বচক্ষে দর্শন হয়। এই সময় যদি পরমেশ্বরের মহাকৃপা লাভ না ঘটে তাহা হইলে পুরুষ এই স্বরূপ-জ্ঞানে প্রকাশমান নিজ সত্তাতে স্থিত হয় ও কৈবল্য লাভ করে। মায়াতেও প্রায় এই জাতিয় অবস্থারই উদয় হয়। তুই আসনের ক্রিয়ার ফলে এই পর্য্যন্ত সিদ্ধি ঘটে।

কিন্তু ইহাকে আমি মহাসিদ্ধি বলি না—যদিও ইহাও কম নহে। প্রকৃতি হইতে পৃথক্ হইলেই তো চলিবে না—প্রকৃতিকেও, ঠিক প্রকৃতিকে নহে কিন্তু কারণ দেহকেও, আসন করিতে হইবে। তাহা না করিতে পারিলে প্রকৃতি-মুক্ত পুরুষের কৈবল্যই প্রাপ্তি।

কারণদেহকে আসন করিতে হইলে অভিমানকে বিসর্জ্জন না করিয়া জাগাইয়া রাখিতে হয়। এক হিসাবে দেখিতে গেলে অভিমানের পূর্ণাহুতির সময় আসিয়াছে—স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ—তিন দেহ রচিত হইয়াছে, তিন দেহেই অভিমান সমভাবে কার্য্য করিয়াছে, ফলে তিন দেহেরই কর্ম্ম সমাপ্ত হইয়াছে। তাই প্রকৃতির কর্ম্ম সমাপ্ত হইয়াছে এবং চতুর্বিংশতি তত্ত্বের সহিত সঙ্কীর্ণভাবে অবস্থিত বদ্ধ চিৎসত্তা মুক্ত হইয়া স্বয়ং পুরুষরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে—সুতরাং কর্ম্মের ফলে জ্ঞান বা আত্মজ্ঞান উদিত হইয়াছে। এখন কৈবল্য স্বতঃপ্রাপ্ত—আর তাহাতে অভিমানের স্থান নাই, প্রয়োজনও নাই। কারণ, করণীয় কর্মও আর অবশিষ্ট নাই। তাই ইহাই অভিমানের পূর্ণাহুতির সময়।

কিন্তু মহাযোগী এখানেও শেষ দেখেন না। পূর্ণাহুতি অভিমানের হয় বটে, কিন্তু অগ্নি নির্বাণ হয় না। অথবা নির্বাণের মধ্যেও অনির্ব্বাণ অগ্নি জাগাইয়া রাখা হয়—তদ্রূপ অভিমান সমাপ্ত হইলেও একটি বিশুদ্ধ অভিমানরূপে তাহাকে রাখা হয়। কারণ, মহাকর্ম তো বাকী আছে।

অপ্রাকৃত বিশুদ্ধ সত্ত্বরূপী নির্ম্মল সত্তাতে ঐ অভিমানের যোগ হয়। বলা বাহুল্য, পুরুষ এখন পরমপুরুষ বা মহাপুরুষপদে অভিষিক্ত। প্রকৃতির কর্ম্ম শেষ করিয়া তিনটি শবাসনের উপরে আসীন হইয়া যোগী বিশুদ্ধ সত্ত্বময় আধারে স্থিত হইয়াছেন। ঐ আধারটি তখন মহাকারণদেহরূপী জানিতে হইবে। এই যোগীর বিশুদ্ধ অভিমান বা আমিত্ব। এই আসনে আসীন হইয়াই যোগী বিশ্বকর্ম্মের মহাক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হন।

তখন তাঁহার ব্যক্তিগত প্রয়োজন থাকে না—সমস্ত জীব জগতের প্রয়োজনই তখন তাঁহার প্রয়োজন। ভগবান্ ব্যাসদেব যোগসূত্রের ভাষ্যে ঈশ্বর সম্বন্ধে বলিয়াছেন—"তস্য আত্মানুগ্রহাভাবেঽপি ভূতানুগ্রহ এব প্রয়োজনম্"। তাঁহার একমাত্র প্রয়োজন ভূতানুগ্রহ—জীবের কল্যাণ সাধন,—অন্য কোন প্রয়োজন তাঁহার নাই। যোগীও তখন বিশুদ্ধসত্ত্বময় আধারে স্থিত হইয়া ভূতানুগ্রহ বা জীবসেবাতে নিরত হন। ইহাই পরার্থ কর্ম্ম। গীতাতে ভগবান্ বলিয়াছেন—"উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্য্যাং কর্ম্ম চেদহম্"—ইহা সেই জাতীয় কর্ম্ম।

এইখানে একটি গভীর রহস্যের কথা বলা আবশ্যক। মনুষ্য জীবিত অবস্থায় যদি এই ভূমি পর্য্যন্ত উত্থিত হইতে পারে, অর্থাৎ তিন আসনের কর্ম্ম সম্পন্ন করিতে পারে অথবা প্রকৃতির চতুর্বিংশতি তত্ত্ব হইতে চৈতন্য সত্তাকে পৃথক্ করিয়া প্রকৃতিকে ও মায়াকে স্বায়ত্ত করিয়া বিশুদ্ধ অভিমান সহকারে মহামায়ার মুক্তক্ষেত্রে আধিকারিক পুরুষরূপে আত্মপ্রকাশ করিতে সমর্থ হয় তাহা হইলে সঙ্গে সঙ্গে তাহার প্রভাব বিশ্বসংসার অনুভব করিয়া ধন্য হয়। তাহার প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত দেহ তখন এক হয়—উহাই মহাসিদ্ধ দেহ নামে পরিচিত হয়।

প্রকৃতির বিজ্ঞানশালাতে এই বিরাট্ অনুষ্ঠানের আয়োজন চলিতেছে। বাহ্য জগৎ তাহার কোনও সন্ধান রাখে না, রাখিতে পারেও না।

আমরা যাহাকে মৃত্যু বলিয়া থাকি তাহা অনেক নীচের ব্যাপার। কিন্তু নীচের হইলেও তাহা অপরিহার্য্য। স্থূলদেহ হইতে মানবের সূক্ষ্ম সত্তা পৃথক্ হইলেই আমরা তাহাকে মৃত্যু বলিয়া বর্ণনা করি। কিন্তু যদি স্থূলের কর্ম্ম অর্থাৎ স্থূলযোগ্য আত্মকর্ম্ম সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বে এই ঘটনা ঘটে তাহা হইলে জীবকে অবশিষ্ট আত্মকর্ম্ম করিবার জন্য পুনরায় স্থূলদেহ গ্রহণ করিতে হয় বা জন্ম নিতে হয়। যতদিন আত্মকর্ম্ম পূর্ণ না হইবে ততদিন এইরূপই চলিবে। কারণ স্থূল মানবদেহ ধারণ ব্যতীত আত্মকর্ম্ম করার উপায় নাই। অজ্ঞানজ কর্ম্মের ফলে যদি শুদ্ধ বা মলিন ভোগদেহের প্রাপ্তি ঘটে তবে উহা কালক্ষেপ জানিতে হইবে। কারণ মানবদেহে হইতে একবার চ্যুত হওয়াও অত্যন্ত দুর্ভাগ্য—যে হেতু উহা ক্রম-বিকাশের পথে মহা অন্তরায়। মানবদেহে শুধু প্রারব্ধ ভোগ না হইয়া যদি অজ্ঞানবশে নবীন কর্ম্ম উদ্ভূত হয় তাহা হইলেও উহা সঞ্চিত কর্ম্মের ভাণ্ডারে সঞ্চিত হয় এবং উহা নিয়ত-বিপাক হইলে ও ভাবী প্রারব্ধের রচনাতে অঙ্গীভূত হইলে বিপচ্যমান হইয়া অনুরূপ সুখ-দুঃখরূপ ভোগ দানের জন্য ব্যাপৃত হয়। ইহা কর্ম্ম-জগতের দৈনন্দিন ব্যাপার। ইহার আলোচনা এই স্থলে অপ্রাসঙ্গিক।

যদি স্থূলের আত্মকর্ম্ম পূর্ণ হয়, কিন্তু তৎক্ষণেই প্রারব্ধ ভোগও পূর্ণ হয় বলিয়া মৃত্যু ঘটে এবং এ অবস্থাতে স্থূল দেহকে শবাসন করিবার অবসর না পাওয়া যায় তাহা হইলে খাঁটি সূক্ষ্ম শরীর রচিত হইয়াছে (স্থূলের আত্মকর্ম্ম দ্বারা) বলিয়া মানুষ ভৌতিক সত্তার ঊর্দ্ধে কৈবল্য লাভ করে। তাহাকে আর ভৌতিক জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না। কিন্তু তখন এই অসুবিধা থাকে যে আসন প্রাপ্তির অভাবে পরলোকে নিরালম্ব অবস্থা হয় বলিয়া নিষ্ক্রিয় ভাব থাকে—সূক্ষ্মদেহোপযোগী আত্মকর্ম্মের সূত্রপাত হয় না। কৈবল্য হইলেও ইহা ঠিক কৈবল্য নহে, কারণ লিঙ্গ বা সূক্ষ্ম দেহ বিদ্যমান থাকে—শুধু কর্ম্ম করিতে পারে না মাত্র। সে স্থূল জগতে আসে না—তাই সে

এক হিসাবে মৃত্যু-বর্জ্জিত। কিন্তু তাহারও ভাবী মৃত্যু আছে। কারণ সূক্ষ্মদেহ যখন আছে তখন তাহার কর্ম্মও কখন না কখন করিতেই হইবে এবং পরে তাহারও বর্জ্জন হইবে (যদি দ্বিতীয় শবাসন করিতে না পারা যায়)। সূক্ষ্ম দেহের মৃত্যুও মৃত্যু বটে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে স্থূলের আত্মকর্ম্ম সমাপ্ত ও প্রারব্ধভোগ সমাপ্ত হওয়ার পর অভিমান সূক্ষ্মে যোজিত হইয়া স্থূলকে শবরূপী আসনে পরিণত করিতে পারিলে ঐ পূর্ব্বোক্ত নিরালম্ব অবস্থার নিষ্ক্রিয়ত্ব ঘটে না। কারণ তখন আসন লাভ হইয়াছে ও কর্ম্ম আরব্ধ হইয়াছে। ইহারই জন্য অমল ভূমির দ্বার মুক্ত হয়—সেখানে কর্ম্মের ক্রমোন্নতি ঘটে। তবে তাহা দীর্ঘকালের ব্যাপার। কারণ কালের প্রভাবের বাহিরে অমর জগতে কর্ম্ম ক্ষিপ্র গতিতে অগ্রসর হয় না।

স্থূল শরীর সাধারণতঃ প্রারব্ধ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। প্রারব্ধ অতি জটিল তত্ত্ব—বারান্তরে সে সম্বন্ধে আলোচনা করিতে অবসর নিবার ইচ্ছা আছে। কর্ম, অনুগ্রহ, সংস্কার (প্রাক্তন) প্রভৃতি বহু বিভিন্ন শক্তির একত্র সংঘটনে প্রারব্ধ রচিত হয় এবং ইচ্ছার উৎকটতা হইতে উহার সৃষ্টি হয়। তাই এক দৃষ্টিতে আয়ু নিয়ত বলিয়া অকাল মৃত্যু নাই—ইহা সত্য। আবার আয়ুর বৃদ্ধি-হ্রাস উভয়ই সম্ভবপর—ইহাও সত্য। এই বৃদ্ধি-হ্রাস শক্তির সংযমের বা অপচয়ের ফলে হইতে পারে—অথবা বাহির হইতে শক্তির অনুপ্রবেশাদি কারণ হইতেও হইতে পারে।

যে কোন কারণেই হউক এই দেহটি বজায় থাকিতে থাকিতেই যোগী নিজের সমস্ত আত্মকর্ম সমাপ্ত করিতে ইচ্ছা করেন। এই দেহে থাকিতেই যদি ভৌতিক দেহকে শব করিয়া নিজে সূক্ষ্ম শরীরে—তাহা আভাসময় ভাবদেহই হোক বা জ্ঞানদেহই হোক—অভিমান করিয়া সূক্ষ্মের আত্মকর্ম করা যায় তাহা হইলে এই দেহে থাকিয়াও অমল ভূমিতে অবস্থান করা যায়। তবে নিম্নস্তরে।

জ্ঞানগঞ্জের তত্ত্ব আলোচনা-প্রসঙ্গে বিস্তারিতভাবে নিজের

অনুভব ও বোধ অনুসারে অমল ভূমির রহস্যের সম্মুখীন হইতে চেষ্টা করিব। গুপ্ত রহস্যের উদ্‌ঘাটন ব্যক্ত জগতে অসম্ভব। তবে অধিকারিগণের কৃপা হইলে কাহারও কাহারও ভিতরে মহালোকের ক্রিয়াতে কিছু কিছু প্রকাশের খেলাও ঘটিতে পারে।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে মাতৃ-গর্ভ হইতে সঞ্জাত স্থূল দেহই কর্ম্মদেহ। মনুষ্য যতক্ষণ পর্য্যন্ত এই দেহ ধারণ করিয়া থাকে ততক্ষণেই সে কর্ম্ম করিতে সমর্থ হয়। এই দেহ না থাকিলে কর্ম্ম করা যায় না। কর্ম্মফল ভোগ মাত্র ভোগদেহে হইয়া থাকে। কর্ম্ম কি এবং তাহার ফল কি প্রকার, ইহার আলোচনা আংশিকরূপে আমরা পূর্ব্বে করিয়াছি। অনাত্ম-কর্ম্মকে এই প্রসঙ্গে কর্ম্মরূপে গণনা করা হয় নাই। অনাত্ম-কর্ম্ম অজ্ঞান অবস্থায় হইয়া থাকে এবং উহার সংস্কারনিবন্ধন যে সুখ দুঃখরূপ ফল উদ্ভূত হয় তাহা ভোগ করিবার জন্য ঊর্দ্ধলোক, অধোলোক অথবা মনুষ্যলোকের মধ্যে কোন স্থানে তদনুরূপ দেহ গ্রহণ করিতে হয়। ভোগদেহ স্বর্গীয় হইতে পারে, নারকীয় হইতে পারে এবং পশু-পক্ষী প্রভৃতি অবচেতন জীবেরও হইতে পারে। তাহা ছাড়া, মনুষ্যের কর্ম্মদেহেও ভোগানুভূতি হয় বলিয়া আংশিকরূপে মনুষ্যদেহও হইতে পারে। কিন্তু কর্ম্মদেহ মনুষ্যদেহ ভিন্ন অন্য কোন দেহ হইতে পারে না। ইহা হইল অনাত্ম-কর্ম্মের কথা। তদ্রূপ আত্মকর্ম্মের উপযোগী দেহও একমাত্র মনুষ্যদেহই, তাহাতে সন্দেহ নাই।

আত্মকর্ম্মের দ্বারা আত্মিক স্থিতির উৎকর্ষ-সাধন ঘটিয়া থাকে। তীব্রতা অনুসারে কর্ম্মকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। আত্মকর্ম্ম ততক্ষণ পর্য্যন্ত সম্পন্ন হইতে পারে না যতক্ষণ পর্য্যন্ত দেহে চৈতন্য শক্তির উন্মেষ না হয়। প্রতি মনুষ্যদেহে এই শক্তি কুলকুণ্ডলিনী নামে নিহিত রহিয়াছে। যতক্ষণ এই শক্তির উন্মেষ হইয়া শিবত্বের অভিব্যক্তি না ঘটে ততক্ষণ পর্য্যন্ত মানুষ মনুষ্যাকারসম্পন্ন হইয়াও প্রকৃতিতে পশু ভিন্ন অপর কিছু নহে। পশুত্ব-নিবৃত্তির

একমাত্র উপায় কুণ্ডলিনীর উদ্বোধন এবং শিব-ভাবের বিকাশ। কিন্তু এই উদ্বোধন সকলের সমান মাত্রাতে হয় না। অনেকের এই উদ্বোধন হয়ই না—তাহাদের বিষয় বর্ত্তমান প্রসঙ্গে আলোচ্য নহে। কিন্তু যাহাদের কুণ্ডলিনী উদ্বুদ্ধ হয় তাহাদেরও সকলের জাগরণের মাত্রা সমান নহে বলিয়া সকলকে এক শ্রেণীতে নিবেশ করা চলে না। সদ্‌গুরু সাক্ষাৎ ভগবৎশক্তিসম্পন্ন হইলেও শিষ্যের আধারের বলবত্তার উপর তাঁহার সঞ্চারিত শক্তির ফল-প্রকাশ নির্ভর করে। যে আধারে যে পরিমাণ শক্তির ধারণা সম্ভবপর সদ্‌গুরু সেই আধারে তাহার অধিক শক্তির সঞ্চার করেন না এবং তদ্ অপেক্ষা ন্যূন শক্তিরও সঞ্চার করেন না।

আধার দুর্ব্বল হইলে কুণ্ডলিনীর উন্মেষ কিঞ্চিন্মাত্রাতেই হইয়া থাকে। তাহার পর সাধক স্বয়ং নিজকর্ম্মের দ্বারা ঐ উন্মেষের অগ্রগতি সম্পাদন করে। এই প্রকারে ধীরে ধীরে সাধকের অন্তরে এবং বাহিরে উদ্বুদ্ধ চৈতন্যশক্তির বিকাশ ঘটিয়া থাকে। চৈতন্যশক্তির বিকাশের ফলে অনাত্মাতে আত্মভাব তো কাটিয়া যায়ই, বিশেষতঃ আত্মাতে আত্মাভিমানের পূর্ণ অভিব্যক্তির পথও খুলিয়া যায়। প্রকৃতি ও মায়া হইতে আত্মস্বরূপের বিবেকজ্ঞান উদিত হইলেই কর্ম্ম সংস্কার নষ্ট হইয়া যায় এবং জন্ম-মৃত্যুর ঊর্দ্ধে নিত্য স্থিতির উপলব্ধি হয়। কিন্তু পশুভাবের বীজ তখনও থাকিয়া যায়। পশুভাব নিবৃত্ত না হইলে ভগবৎ-স্বরূপে স্থিতি দুর্ঘট। সাধকের আত্মা পরমাত্মা হইতে অভিন্ন অথবা পরমাত্মার সনাতন অংশভূত এবং স্বরূপতঃ নিত্য দিব্য-ভাবাপন্ন—উহা পশু অবস্থার নিম্নস্তরে এই সকল প্রাকৃতিক সূক্ষ্ম সংস্কাররাশির আবেষ্টনে আচ্ছন্ন হইয়া বদ্ধের ন্যায় বিদ্যমান থাকে। দিব্যজ্ঞানের উদয় এবং ক্রমিক বিকাশ হইলে ঐ সকল সংস্কারের নিবৃত্তি তো হয়ই, উপরন্তু মৌলিক পশুবীজও কাটিয়া যায়।

সাধক কর্ম্মদ্বারা গুরু হইতে প্রাপ্ত জ্ঞানাগ্নির স্ফুলিঙ্গকে নিজ সত্তায় সম্পূর্ণভাবে বিস্তারিত করে এবং এই বিস্তারের মাত্রা অনুসারে

অজ্ঞানজ কর্ম্ম-সংস্কারগুলি নষ্ট হইতে থাকে। দেহ কর্ম্মসম্ভূত বলিয়া দেহে অবস্থিতি কাল পর্য্যন্ত অজ্ঞান ও কর্ম্মসংস্কার সম্পূর্ণ নিবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে সাধারণতঃ দেহপাত অবশ্যম্ভাবী। এইজন্য সাধকের পূর্ণ সিদ্ধি দেহে অবস্থানকালে হইতে পারে না—লেশমাত্র অবিদ্যা অথবা অজ্ঞান দেহাবস্থায় থাকিবেই থাকিবে। পূর্ণ নির্ব্বিকল্পক স্থিতি প্রাপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেহ-সম্বন্ধ ছিন্ন হইয়া যায় এবং আত্মা সর্ব্ব সংস্কার বর্জ্জিত হইয়া চিদাকাশে নিজ স্বরূপে বিরাজ করে। ইহাকে কৈবল্য অথবা বিদেহ কৈবল্য নামে কেহ কেহ বর্ণনা করিয়া থাকেন। যে সকল সাধক এই দেহে থাকিয়া দেহের কর্ম্ম সম্পূর্ণ শেষ করিতে পারে না তাহাদের গতি বর্ত্তমান প্রবন্ধে প্রদত্ত বিবরণ অনুসারে বুঝিয়া লইতে হইবে।

এই যে সাধনার ক্রম বলা হইল ইহা কিন্তু ইষ্ট সাধনারই ক্রম। কারণ সাধকের ইষ্টদেবতা কুণ্ডলিনী শক্তি ভিন্ন অপর কেহ নহে। সাধক যে নাম অথবা যে রূপই গ্রহণ করুক না কেন একমাত্র কুণ্ডলিনীই তাহার ইষ্ট। সিদ্ধাবস্থায় সাধ্য ও সাধকের মধ্যে কোন ভেদ থাকে না, সাধকের আত্মা তখন ইষ্ট স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং মায়ার আভাস ও সংস্কারের নির্ম্মোক হইতে চিরদিনের জন্য মুক্ত হইয়া যায়। নিজের ব্যক্তিত্ব নষ্ট হয় না বটে, কিন্তু ব্যক্তিত্বের উপযোগ হয় না, কারণ ব্যাপক মহাসত্তার মধ্যে নিজের ব্যক্তিগত সত্তা তখন মগ্ন। ইহা নিরাকার নিষ্ক্রিয় চিদাত্মস্বরূপে অবস্থান।

কিন্তু যে আধার অপেক্ষাকৃত সবল গুরুদত্ত অনুগ্রহ-শক্তির সঞ্চারের ফলে তাহার অগ্রগতি অন্য প্রকারে হয়। বর্ত্তমান প্রসঙ্গে আমরা এই জাতীয় আধার-বিশিষ্ট উপাসককে 'যোগী' বলিয়া বর্ণনা করিব। যোগীর আধার সাধকের আধার অপেক্ষা অধিক প্রবল বলিয়াই তাহার দেহে কুণ্ডলিনী শক্তির বিকাশ প্রারম্ভ হইতেই অধিক পরিমাণে হইয়া থাকে।

সাধকের সাধনা যেখানে সমাপ্ত হয় যোগীর সাধনা বস্তুতঃ সেইখান

হইতেই আরম্ভ হয়। এইজন্য সাধকের কর্ম্ম ও যোগীর কর্ম্ম প্রথম হইতেই পৃথক্ হইয়া থাকে। শুধু তাহাই নহে, ঐ কর্ম্মের ফলও পৃথক্। সাধকের কর্ম্মের ফলে বিকল্পসমূহ অর্থাৎ বাসনা কামনাদি সংস্কার ও তাহাদের মূল বীজ নির্ম্মল হইয়া চিদালোকে পরিণত হয়। তাহাদের বিরুদ্ধ ভাব কাটিয়া যায় এবং তাহাদের সত্তা চিৎ-সত্তার সঙ্গে একাকার হইয়া যায়। অতএব সিদ্ধাবস্থাতে দেহ মন প্রভৃতির সম্বন্ধ-শূন্য নির্ব্বিকল্প চিন্ময়-আত্ম-স্বরূপে স্থিতি সম্ভব হয়। কিন্তু যোগীর কর্ম্মের ফল অন্য প্রকার। শুধু বিরুদ্ধ শক্তির বিরুদ্ধতা পরিহারই যোগীর কাম্য নহে, কিন্তু বিরুদ্ধ শক্তি যাহাতে বিরোধ পরিহার করিয়া অর্থাৎ নির্ম্মল হইয়া আত্মার স্বরূপ-শক্তিতে পরিণত হয় তাহাই যোগীর কর্ম্মের লক্ষ্য। অরি অরি-ভাব ত্যাগ করিয়া উদাসীন অথবা তটস্থ হইলেই সাধকের আত্মা নিজেকে মুক্ত বোধ করে। কিন্তু যোগী ইচ্ছা করে যে অরি অরি-ভাব ত্যাগ করিয়া যেন তটস্থ হইয়া না থাকে, কিন্তু তাহার মিত্ররূপে পরিণত হয়। শক্তি পরিহার করা ও শক্তিহীন অবস্থায় স্থিতি গ্রহণ করা যোগীর উদ্দেশ্য নহে। প্রাকৃত গুণ থাকিবে না ইহা সত্য, কিন্তু অপ্রাকৃত গুণের বিকাশ তো হওয়া চাই—ইহাই যোগীর উদ্দেশ্য। যোগী প্রবল শক্তিশালী বলিয়া তাহার ক্রিয়ার ফলে বহিরঙ্গ শক্তি বহিরঙ্গ তো থাকেই না, বরং অন্তরঙ্গ শক্তির রূপ ধারণ করিয়া যোগীর আত্মাকে বলশালী করে। সাধকের আদর্শ বিদেহ-কৈবল্য—ঐ অবস্থায় কোন প্রকার বিকল্প থাকে না, কারণ দেহ ও মনের সংযোগ ভিন্ন বিকল্পের উদয় হইতে পারে না। কিন্তু যোগীর আদর্শ সাকার পিণ্ড-সিদ্ধি। যোগী বিকল্পকে শুদ্ধ করিয়া শুদ্ধ বিকল্পরূপে উহার স্থায়িত্ব আকাঙ্ক্ষা করে। এই শুদ্ধ বিকল্প পূর্ব্বোক্ত নির্ব্বিকল্প স্থিতির অবিরুদ্ধ। সাধকের লক্ষ্য সিদ্ধ অবস্থাতে কাম বর্জ্জন করিয়া নিষ্কাম চিৎস্বরূপে অবস্থান, কিন্তু যোগীর লক্ষ্য মলিন কামকে শোধিত করিয়া বিশুদ্ধ কাম রূপে অর্থাৎ ভগবৎ-প্রেমরূপে পরিণত করা। এই ভগবৎ-প্রেম মনুষ্যের জীবনের মুখ্য আদর্শ।

এইজন্য যোগী মুক্ত অবস্থাতেও আকার বর্জিত হয় না অর্থাৎ যোগীর কায়া কখনই পরিত্যক্ত হয় না—এই নিত্য কায়া লাভ করিয়া যোগী অখণ্ড কর্ম্মের পথে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে থাকে।

কেহ কেহ প্রশ্ন করিতে পারেন—যোগীর নিত্য কায়া লাভ বলিতে কি বুঝিতে হইবে ? উহা কি মৃত্যুঞ্জয় অবস্থার প্রাপ্তি অথবা কোন দিব্যাবস্থা বিশেষ ? এই প্রশ্নের সমাধান করিবার পূর্ব্বে কর্ম্ম-প্রভাবে কায়া রচনা রহস্য সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি। আমরা পূর্ব্বে কোন একটি বিশিষ্ট দিক্ হইতে এই কায়া সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছি। এখন আরও বিস্তারিতভাবে ইহার আলোচনা করা হইতেছে।

মানুষ মাতৃগর্ভ হইতে নির্গত হইয়া কালরাত্রির রাজ্যে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে থাকে। কালের রাজ্যে জীবনের গতি মৃত্যুর দিকে, ইহা বুঝাইয়া বলিবার আবশ্যকতা নাই। জীবনের আদি হইতে জীবনের অবসান পর্য্যন্ত যে ধারা তাহারই মধ্যে কালের খণ্ড শক্তিগুলি ক্রমশঃ আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে। যেমন এক এক আনা সঞ্চিত হইয়া ক্রমশঃ ষোল আনায় একটি মুদ্রা রূপে পরিণত হয়, তদ্রূপ কালের এক একটি শক্তি ক্রমশঃ উপচিত হইয়া সর্ব্বশক্তির উপচয়ে দেহপাত ঘটাইয়া থাকে। বস্তুতঃ বায়ু যেমন মূলতঃ সাত প্রকারের হইলেও সপ্তীকরণ প্রক্রিয়ার ফলে ঊনপঞ্চাশটি পৃথক্ পৃথক্ বায়ুর রূপ পরিগ্রহ করে, তদ্রূপ একটি পরিচ্ছিন্ন কালশক্তি পূর্ব্বোক্ত প্রক্রিয়ার অনুরূপ প্রণালীতে ঊনপঞ্চাশৎ অণুশক্তিরূপে পরিণত হয়। মাতৃকা-চক্রের রহস্য আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে এই ঊনপঞ্চাশৎ শক্তিই বিষম সংযোগে মাতৃকা-শক্তিরূপে জীব-হৃদয়ে বিকল্পের রচনা করিয়া থাকে। এই ঊনপঞ্চাশটি শক্তি শুদ্ধ জীবাত্মাকে অশুদ্ধবৎ প্রতীত করাইয়া অনন্ত প্রকার বিক্ষেপের আশ্রয়রূপে প্রদর্শিত করে। বস্তুতঃ এই বিকল্পের শোধন না হইলে আত্মার স্বরূপ-স্থিতি সম্ভবপর নহে। যোগীর মহালক্ষ্য তো দূরের কথা, সাধকের জীবনের আদর্শও

আত্মাকে এই সকল মাতৃকারাশির আক্রমণ হইতে অব্যাহতি দান করা এবং তাহাকে তাহার নিজ স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করা। আত্মকর্ম্মের প্রকৃত উদ্দেশ্য ইহাই। বর্ত্তমান জগতে বা সমাজে সাধারণতঃ যে কর্ম্ম প্রচলিত আছে তাহাতে এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। কারণ ঐ কর্ম্ম মূলতঃ কর্ত্তৃত্বাভিমানমূলক বলিয়া পুণ্য পাপরূপে জীবকে উৰ্দ্ধ অথবা অধোগতিতে প্রেরণ করে—তাহাকে তাহার নিজ স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে সাহায্য করে না। ঐ কর্ম্মের ফল সুখ-দুঃখ ভোগ, আত্মজ্ঞানের উন্মেষ নহে। কুণ্ডলিনী শক্তি কিঞ্চিন্মাত্রাতেও জাগিয়া না উঠিলে অতি নিম্নস্তরের আত্মকর্ম্মও সম্ভব হয় না।

পূর্ব্ববর্ণিত উনপঞ্চাশটি মাতৃকাশক্তির যোগ বিয়োগে নানা প্রকার ভাবের উদয় হয়। এই শক্তিগুলি অপ্রবুদ্ধ অথবা মলিন থাকিলে ভাবও মলিন হয়। এই মলিন ভাবের শোধন ব্যতীত ভাবাতীত আত্মস্বরূপের বোধ কি প্রকারে হইবে? সাধারণ মনুষ্য আত্মকর্ম্ম করিতে পারে না বলিয়া তাহাদের এই শক্তিগুলি অমার্জ্জিতই থাকিয়া যায়। সুতরাং দেহাবস্থাতে তো দূরের কথা, দেহান্তেও তাহাদের স্বরূপ-স্থিতির পথে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। তাহাদের পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ। কিন্তু যাহারা সাধকরূপে নিজ কর্ম্মের প্রভাবে এই মাতৃকাশক্তিগুলির অর্থাৎ অণু সকলের সংস্কার করিতে সমর্থ হয় তাহারা পূর্ণ শোধনের পর শুদ্ধ আত্মস্বরূপে স্থিতি লাভ করিতে পারে তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু সবগুলি শক্তিরই শোধন আবশ্যক। শক্তির কিঞ্চিন্মাত্রও অশোধিত থাকিলে স্বরূপ-স্থিতি হইতে পারে না। কিন্তু ইহাও সত্য যে এই শক্তি অশুদ্ধ হইলেও ইহার সহযোগ ব্যতীত আত্মার পক্ষে দেহে অবস্থান করা সম্ভবপর নহে। সুতরাং দেহাবস্থায় থাকিতে শক্তির পূর্ণ শোধন অসম্ভব। পক্ষান্তরে শক্তির পূর্ণ শুদ্ধি সম্পন্ন হইলে বিদেহ-কৈবল্য অবশ্যম্ভাবী। সাধক সিদ্ধাবস্থাতে অণুহীন বিকল্পহীন মাতৃকাসংস্পর্শহীন, দেহহীন ও মনহীন স্থিতিলাভ করে। কিন্তু যোগী প্রবলতর নিজ কর্ম্ম প্রভাবে

এই সকল মাতৃকা-শক্তিকে অন্তরঙ্গ স্বরূপ-শক্তিরূপে, মাতৃরূপে পরিণত করে। যখন এই স্বরূপ-শক্তিরূপে পরিণাম পূর্ণ হয় তখনই যোগীর সিদ্ধ অবস্থা আসিয়াছে বুঝিতে হইবে। ইহা কিন্তু বিদেহ অবস্থা নহে। শক্তি শোধিত হইয়া নির্ম্মল রূপে যোগীর স্বরূপকে পুষ্টিদান করে। সাধকের কাজ অশুদ্ধ সত্তাকে নিজ হইতে বিযুক্ত করা অর্থাৎ পৃথক্ করা, কিন্তু যোগীর কাজ অশুদ্ধ সত্তাকে অশুদ্ধি হইতে মুক্ত করিয়া তাহাকে নির্ম্মল নিজ শক্তিরূপে পরিণত করা ও নিজের সঙ্গে যুক্ত করা। যে যোগী যত বেশী পরিমাণে এই যোজনা কার্য্যে অগ্রসর হন তিনি তত শ্রেষ্ঠ যোগী বলিয়া পরিগণিত হন। প্রকৃত সিদ্ধ যোগী তিনিই যিনি ঊনপঞ্চাশটি মাতৃকা-শক্তির মধ্যে সবগুলিকেই আত্মশক্তিরূপে পরিণত করিতে সমর্থ হয়। এই প্রকার সিদ্ধ যোগী নিত্য কায়-সম্পদ্ লাভ করিয়া থাকেন এবং সেইজন্য নিজেকে বিশুদ্ধ অহং বলিয়া বোধ করিবার যোগ্যতা অর্জ্জন করেন। ইহাই যোগীর আত্মস্বরূপে স্থিতিরূপ সিদ্ধি। ইহা কিন্তু সাধকের বিদেহ কৈবল্য রূপ অবস্থার অনুরূপ অবস্থা নহে, কারণ এই অবস্থায় দেহ থাকে এবং ঐ দেহ কালজয়ী নিত্য দেহ।

নিত্য দেহ লাভ করিয়াও ভৌতিক দেহের দিক্ হইতে এই প্রকার সিদ্ধ যোগীকেও মৃত্যুর মধ্য দিয়া অতিক্রম করিতে হয়। এইজন্য যোগ-সাধনার ক্রমোৎকর্ষের দিক্ হইতে বিচার করিলে জানিতে পারা যায় যে ইহারও একটি পরাবস্থা আছে, অর্থাৎ এমন একটি অবস্থা আছে যে অবস্থায় যোগীকে শুধু পূর্ব্বোক্ত আত্মস্বরূপ ও নিত্যদেহ লাভ করিয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে হয় না, কিন্তু এই জরা-ব্যাধির আধার বিকারময় ভৌতিক দেহকেও কালের কবল হইতে উদ্ধার করিতে সে সমর্থ হয়।

পূর্ব্বে যে শবাসনের কর্ম্মের কথা বলা হইয়াছে তাহা যোগীরই কর্ম্ম, সাধকের কর্ম্ম নহে। সাধক অণু অথবা বিকল্প শুদ্ধ করিয়া বিকল্পহীন চিদাকাশে স্থিতিলাভ করে, তাহার কায়-রচনা হয় না।

লৌকিক কায়া পরিত্যক্ত হইয়া যায় অথচ অলৌকিক কায়ার উদয় হয় না এবং হইবার সম্ভাবনাও থাকে না। কিন্তু যোগী সম্পূর্ণ স্ব-কায়া রচনা করিতে সমর্থ হইলেই সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকে। যদিও এই স্ব-কায়া ভৌতিক কায়ার রূপান্তর নহে, তথাপি ইহা ভৌতিক কায়ার ন্যায়ই সুস্পষ্ট-স্বরূপ এবং ইহাকে আশ্রয় করিয়া যোগীর আত্মজ্ঞানের বিকাশ হয়, এবং শুদ্ধ আমিত্ববোধ উৎপন্ন হইয়া স্থায়িত্ব লাভ করে। লৌকিক কায়ার সহিত বিচ্ছেদ তাহার পক্ষেও অবশ্যম্ভাবী, কারণ লৌকিক কায়ার অবস্থান্তর না হওয়া পর্য্যন্ত তাহাকে গুপ্ত ভাবেই থাকিতে হয়। কিন্তু স্ব-কায়ালাভ হইলেও লৌকিক কায়া হইতে কালের প্রভাবে চ্যুত হইতে হয়। শক্তিশালী হইলেও, এমন কি সর্ব্বজ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তি অধিগত হইলেও, ইহার অন্যথাচরণ সম্ভবপর হয় না। কিন্তু যোগে উৎকর্ষ লাভ করিলে এই লৌকিক দেহেরও রূপান্তর সাধন করিয়া ইহাকে আত্মার চিরসাথী করিয়া লওয়া যায়। ইহা অতি দুরূহ কর্ম্ম এবং সাধন-বিজ্ঞানের অগোচর, কিন্তু অসম্ভব নহে। কারণ জগতে এমন অনেক যোগী আবির্ভূত হইয়াছেন, যাঁহারা নিজ নিজ কায়াকে সিদ্ধ করিয়া কাল-স্পর্শের অতীত করিয়া ফেলিয়াছেন। ভারতীয় চৌরাশি সিদ্ধের কথা এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে। এই সিদ্ধি পূর্ব্বোক্ত অলৌকিক কায়ালাভের তুলনায় উচ্চতর সিদ্ধি। কারণ অলৌকিক কায়ালাভ করিলে শুদ্ধ অহং-জ্ঞানের কখনও লোপ হয় না বলিয়া এক হিসাবে মৃত্যু আর ঘটে না, কিন্তু ভৌতিক দেহ হইতে বিচ্ছেদরূপ যে মৃত্যু তাহা হইতে অব্যাহতি লাভ করা যায় না। কিন্তু চৌরাশি সিদ্ধগণের যে কায়া-সম্পত্তি লাভের কথা বলা হইল তাহাতে ভৌতিক দেহেরও অস্তিত্ব লুপ্ত হয় না, এবং সেইজন্যই উক্ত দেহাশ্রিত আত্মবোধ জাগ্রৎ থাকে। ভৌতিক দেহ জড় বলিয়া হেয়, কিন্তু এই দেহ যখন চৈতন্য-সংযোগে উজ্জ্বল চিদাকার লাভ করে তখন ইহা স্থায়িত্ব প্রাপ্ত হয়।

বর্ত্তমানে যে অবস্থার কথা বলা হইল তাহার উদয় হইলে জড়

দেহসত্তা চিন্ময় আত্মসত্তার সহিত যুক্ত হইয়া যায় এবং আত্মসত্তা হইতে ইহার পৃথক্ অস্তিত্ব থাকে না অথবা এই সত্তা হইতে আত্ম-সত্তারও পৃথক্‌ভাব থাকে না। অতি পরিমিতসংখ্যক যোগী এই গৌরবময় স্থিতিলাভ করিয়া থাকেন। কিন্তু ইহাতেও ন্যূনতা আছে। আত্মা, দেহ, মন প্রভৃতি বিগলিত হইয়া এক অখণ্ড চিদানন্দময় সত্তার প্রতিষ্ঠা হয়। এই সত্তা স্থূলদেহকে আশ্রয় করিয়া বাহ্য জগতে আত্মপ্রকাশ করে। বস্তুতঃ এই অবস্থায় স্থূলদেহ, ইন্দ্রিয়, মন ও আত্মা নিজ নিজ পৃথক্ অস্তিত্ব বিসর্জ্জন দিয়া একই অবিভক্ত সত্তারূপে প্রকাশিত হয়, তাহাকে অবলম্বন করিয়া আত্ম-বোধের উদয় হইয়া থাকে। কিন্তু এই অবস্থাতেও প্রকৃত পূর্ণতার উদয় হয় না।

সাধক ও যোগীর গতি সমান নহে, কারণ উভয়ের কর্ম্ম সমান নহে। উভয়ের লক্ষ্য ও সামর্থ্যও ভিন্ন। সাধক চায় কৈবল্য, যোগী চায় পূর্ণ রূপান্তর। বস্তুতঃ রূপান্তর পূর্ণভাবে সিদ্ধ না হইলে বুঝিতে হইবে সম্যক্ জ্ঞানের উদয় হয় নাই এবং যথার্থ স্বরূপ-প্রতিষ্ঠাও অধিগত হয় নাই।

জীবের বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে প্রধানতঃ তিনটি পর্য্যায় আছে—প্রথম আত্মা, যাহাকে আশ্রয় করিয়া পরিচ্ছিন্ন অহংভাব সাংসারিক জীবনের কেন্দ্রস্বরূপ রহিয়াছে ; দ্বিতীয় করণবর্গ, যাহাতে অন্তঃকরণ ও বাহ্যেন্দ্রিয়সমূহ অন্তর্গত ভাবে বিদ্যমান আছে ; এবং তৃতীয় স্থূলদেহ। জাগ্রৎ অবস্থাতে আমাদের অভিমান এই স্থূলদেহকে আশ্রয় করিয়া কার্য্য করে। স্বপ্নে করণবর্গকে আশ্রয় করে, সংস্কার সমষ্টি ও প্রাণময় কোষ এই স্তরে নিহিত। সুষুপ্তিতে ঐ অভিমান লীনবৎ হইয়া কেন্দ্রে বিদ্যমান থাকে। সাধক সাধন বলে নিজের বোধকে ক্রমশঃ স্থূল হইতে সূক্ষ্মে ও সূক্ষ্ম হইতে কারণে উপসংহৃত করে। তাহার পর কারণ হইতেও যখন ঐ বোধশক্তি নিষ্ক্রান্ত হয় তখন উহা প্রকৃতি হইতে মুক্ত হইয়া নিজ স্বরূপে অর্থাৎ চিৎস্বরূপে অবস্থিত হয়।

বিবেক হয় প্রথমে কারণভাবাপন্ন অচিৎ হইতে এবং প্রতিষ্ঠা হয় অন্তে নিজ স্বরূপভূত চিৎ সত্তাতে। ইহাই কৈবল্য। ইহাই সাধকের সাধন। প্রচলিত বহু যোগমার্গেরও ইহাই লক্ষ্য। কিন্তু এখানে যাহাকে যোগসংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে তাহার উদ্দেশ্য শুধু অচিৎ হইতে মুক্তিমাত্র নহে। উহা অতি গভীর। পূর্ণ দৃষ্টিতে এক অখণ্ড সত্তাই স্বয়ং প্রকাশরূপে নিজের আলোকে আলোকিত হইয়া ভাসিতে থাকে, উহাই চৈতন্যময় আনন্দময় আত্মসত্তা। ঐ মহাসত্তাতে বস্তুতঃ অচিতের কোন স্থান নাই। পূর্ব্বে অর্থাৎ অপ্রবুদ্ধ দশাতে যাহা অচিৎ বলিয়া ধারণা হইত তাহা যে বস্তুতঃ অচিৎ নহে তাহা জ্ঞানের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বুঝিতে পারা যায়। 'অচিৎ' তখন চিন্ময় হইয়া আত্মপ্রকাশ করে। ইহারই নাম রূপান্তর। শুধু জ্ঞানের দ্বারা ইহা হয় না—বিশিষ্ট জ্ঞান বা বিজ্ঞান দ্বারা এই প্রকার রূপান্তর সিদ্ধ হয়।

বিবেকের ও আত্ম-প্রতিষ্ঠার পর চিৎস্বরূপ শক্তিরূপে সাধকের অন্তর্ভুক্ত আত্মিক স্তর, করণস্তর ও ভৌতিক স্তরকে স্পর্শ করিয়া ক্রমশঃ উহাদিগকে নিজবলে চিন্ময়রূপে পরিণত করে।

বিবেক বা বিয়োগের পর যোগের ক্রিয়া এই ভাবেই আরব্ধ হয়। ভগবদনুগ্রহের পূর্ণ প্রকাশ ব্যাপারে প্রথমে জড়ত্ব-মোচন হয়, পাশ-ক্ষয় হয়, অচিৎসত্তা হইতে নিষ্ক্রমণ সম্পন্ন হয়। ইহা ব্যতিরেকের পথ। তাহার পর পূর্ণ ভগবত্তার সহিত যোজনা হয়। ইহা অন্বয়ের পথ। প্রথমে বিয়োগ, তারপর যোগ। যোগ-প্রক্রিয়াতে প্রাক্তন জড়সত্তা জড়ত্ব পরিহার করিয়া চিন্ময়রূপ ধারণ করে। তখন শুধু জীবই বিশুদ্ধ চিৎস্বরূপে স্থিতি গ্রহণ করে তাহা নহে, করণ সমষ্টিও লুপ্ত না হইয়া চিন্মরীচিপুঞ্জরূপে বা চিন্ময় রশ্মিমালারূপে পরিণত হয় ও ভৌতিক উপাদানজাত দেহও শুদ্ধ হইয়া চিদালোকে আলোকিত হয় ও চিন্ময় আকার ধারণ করে। তখন সর্ব্বত্র চিৎ-এর অব্যাহত ব্যাপ্তি হয়। ইহারই নাম ভাগবতী সত্তাতে জাগরণ বা পূর্ণ যোগ-প্রতিষ্ঠা।

কর্ম্ম দ্বারা অর্থাৎ কর্ম্মজাত জ্ঞানের প্রভাবে কর্ম্ম কাটে। শুধু তাহাই নহে। জ্ঞানোত্তর অলৌকিক কর্ম্মের দ্বারা অর্থাৎ যোগরূপ কর্ম্মের দ্বারা কিংবা বিজ্ঞানের দ্বারা নবীন সৃষ্টির উদ্গম হয়, নবীন রচনা রচিত হয়। ইহাই চিন্ময় সৃষ্টি। প্রাকৃত শুদ্ধ মন প্রভৃতির চিন্ময়তা সম্পাদন ও অপ্রাকৃত ভাব প্রাপ্তি ইহারই নামান্তর। শুধু মায়িক কর্ম্ম কাটিলে যে কৈবল্য হয় তাহা অশুদ্ধ বিজ্ঞান-কৈবল্য। তাহাতে পশুত্ব নিবৃত্ত হয় না—তবে জন্ম-মৃত্যুর আবর্ত্তন নিরুদ্ধ হয়। তাহার পর আধিকারিক কর্ম্ম বা ঐশ্বরিক কর্ম্মও যখন কাটিয়া যায় তখন মহামায়ার বিরাট চক্রেরও ভেদ হইয়া যায়। অচিৎ-সম্বন্ধ থাকে না, পশুত্বও থাকে না। তাই মায়া ও কর্ম্ম-পাশ কাটাইয়া মহামায়ার পাশও ছিন্ন করিতে হয়—জীবভাব ও শক্তির ভাব উভয় হইতেই সমভাবে নিষ্কৃতি লাভ করিতে হয়, অশুদ্ধ ও শুদ্ধ উভয় প্রকার কারণ হইতে নিজেকে উদ্ধার করিতে হয়। তখন যে পরম দশার উদয় হয় তাহার নাম বিশুদ্ধ বিজ্ঞান কৈবল্য। ইহা নির্ম্মল আত্মস্বরূপ। কিন্তু আত্মার স্বরূপ-শক্তির বিকাশ না থাকাতে ইহাও প্রকৃত ভগবত্তা নহে। এই স্থিতিতেও পরমেশ্বরের সহিত ঐক্য লাভ ঘটে না।

তন্ত্রমতে এইটি মহাশবের অবস্থা। মহাশক্তির উদ্বোধন হইলে অর্থাৎ পরিপূর্ণ অভিষেক সম্পন্ন হইলে এই মহাশব শিবরূপে জাগিয়া উঠে। ভগবত্তার পূর্ণ অভ্যুদয় তখনই সম্ভব হয়।

কিন্তু মহাশবের অবস্থায় যাইতে না পারিলে পরাশক্তির পূর্ণ আত্মপ্রকাশ আশা করা যায় না। আত্মব্যাপ্তি বিদ্যাব্যাপ্তি ও শিব-ব্যাপ্তিরূপ মহাব্যাপ্তি তাহার পরে আপনা হইতেই ঘটিয়া থাকে। মহাশবের অবস্থা লাভ উৎকট যোগক্রিয়া ব্যতিরেকে সিদ্ধ হয় না। এই ক্রিয়াতে গুরুশক্তিরই প্রাধান্য। ইহার বিস্তারিত বিবরণ ক্রমশঃ দেওয়া যাইতেছে।

দেহ ও কর্ম্ম সম্বন্ধে পূর্ব্বের তুইটি প্রস্তাবে সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করা হইয়াছে। এই সম্বন্ধে আরও বহু কথা আলোচনা করা আবশ্যক। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে জ্ঞানগঞ্জের তত্ত্ব সম্বন্ধে যথাজ্ঞান কিঞ্চিৎ আলোক প্রক্ষেপ করিতে চেষ্টা করিব। কারণ দেহ ও কর্ম্ম-তত্ত্বের সহিত জ্ঞানগঞ্জের অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে। জ্ঞানগঞ্জের রহস্য উদ্‌ঘাটন করিতে না পারিলে এই বিষয়ের প্রকৃত সিদ্ধান্ত প্রাপ্ত হইবার উপায় নাই।

সিদ্ধভূমি অনেক আছে—শাস্ত্র পাঠে তাহাদের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং কোন কোন শক্তিশালী মহাত্মা নিজের জীবনে ঐ সম্বন্ধে কিছু কিছু প্রত্যক্ষ অনুভবও প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। কথিত আছে যে, জ্ঞানগঞ্জ আমাদের এই পরিচিত পৃথিবীর একটি গুপ্ত স্থান বিশেষ—কিন্তু উহা এমন গুপ্ত যে, বিশিষ্ট শক্তির বিকাশ না হইলে এবং ঐ স্থানের অধিষ্ঠাতার অনুজ্ঞা না হইলে এই মর্ত্ত্য জীবের দৃষ্টিগোচর হয় না। সিদ্ধভূমি মাত্রেরই ইহাই বৈশিষ্ট্য। সিদ্ধভূমি স্বয়ংপ্রকাশ হইলেও যে সকল জীব ঐ স্থান হইতে কোন প্রকার শক্তির আনুকূল্য প্রাপ্ত না হয় তাহাদের পক্ষে উহার তুর্ভেদ্য রহস্য ভেদ করা অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বিভিন্ন সিদ্ধভূমির স্বরূপ, পরিস্থিতি ও ক্রিয়া বিভিন্ন প্রকার। বিভিন্ন প্রয়োজন সাধনের জন্য বিভিন্ন ভূমি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে সিদ্ধভূমি, দিব্যভূমি প্রভৃতি অলৌকিক জীব-নিবাস-স্থান সকলকে এক বর্গেরই অন্তর্গত বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইল। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে উহাদের পরস্পর ভেদ ও প্রত্যেকটির নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান আছে। গোলোক ধাম, নিত্য বৃন্দাবন, কৈলাস, নিত্য সাকেত প্রভৃতি স্থানের মহত্ত্ব বিভিন্ন প্রকার। এই জাতীয় বিশিষ্ট স্থান মায়িক জগতে বিভিন্ন স্তরে বহু আছে, মায়ার উর্দ্ধেও আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে

পারে, কেদারেশ্বর, জল্পেশ্বর, মহাকাল এবং শ্রীশৈল—এই সকল ভুবন তেজঃ তত্ত্বে বিদ্যমান আছে। উহারই অংশ অবলম্বন করিয়া যোগিগণ পৃথিবীতে অর্থাৎ ভারতবর্ষে ঐ সকল নাম দিয়া তীর্থ স্থাপন করিয়াছেন। তদ্রূপ অট্টহাস, কনখল, কুরুক্ষেত্র ও গয়া—এইগুলি বায়ু তত্ত্বের ভুবন। অবিমুক্ত, গোকর্ণ, স্থাণু—আকাশ তত্ত্বের ভুবন। এইরূপ সর্ব্বত্রই বুঝিতে হইবে। মলিন মায়ার ঊর্দ্ধে বিশুদ্ধ মায়া-রাজ্যেও অনেক ভুবন আছে, যাহাদের প্রতিরূপক পৃথিবীতে স্থাপিত হইয়াছে। বৌদ্ধ শাস্ত্র অনুসারে অনাস্রব ধাতুতেও বিভিন্ন বুদ্ধ-ক্ষেত্র ও দিব্য ধাম বর্ত্তমান রহিয়াছে। পৃথিবীতে ঊর্দ্ধলোকের প্রায় সমস্ত স্থানই আংশিকভাবে অবতীর্ণ ও প্রকট রহিয়াছে—এই সকল অংশকে অবলম্বন করিয়া অল্প আয়াসেই মূল স্থানকে প্রকাশ করা যায়। এই জন্য আমাদের এই সুপরিচিত বৃন্দাবন হইতেও নিত্য বৃন্দাবনের সন্ধান প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং এই জাগতিক দৃষ্টি গোচর কাশী হইতেও সুবর্ণময় শঙ্করের ত্রিশূলে প্রতিষ্ঠিত নিত্য কাশীর দর্শন লাভ করা যায়। সর্ব্বত্রই অচ্ছিন্ন যোগসূত্র রহিয়াছে।

জ্ঞানগঞ্জের আলোচনাকালে স্মরণ রাখা উচিত যে, এই স্থান সাধারণ ভৌগোলিক স্থানের ন্যায় নহে। ইহা যদিও গুপ্ত ভাবে ভূ-পৃষ্ঠে বিদ্যমান আছে তথাপি ইহার প্রকৃত স্বরূপ বহুদূরে। প্রকৃত যোগী ভিন্ন এই স্থানের সন্ধান কেহ পাইতে পারে না, ইহাতে প্রবেশ-লোভ করা তো দূরের কথা। তবে অধিকারিগণের অনুগ্রহ হইলে এই জগতের সাধারণ মানুষও সেখানে যাইতে সমর্থ হয়। ভৌম জ্ঞানগঞ্জ কৈলাসের পরে এবং ঊর্দ্ধে অবস্থিত। কিন্তু তাহা হইলেও উহা সাধারণ পর্য্যটকের গতিবিধির অতীত। জ্ঞানগঞ্জ, রাজরাজেশ্বরী মঠ, এবং পরম গুরুদেবের শ্রীমন্দির স্তর-বিন্যাসের দৃষ্টিতে বিভিন্ন স্তরে অবস্থিত। জ্ঞানগঞ্জই সকলের নিম্ন স্তর, রাজরাজেশ্বরী মঠ মধ্য স্তর এবং পরম গুরু মহাতপার স্থান সর্ব্বোচ্চ। এই স্থানটি যোগি-

নির্ম্মিত। ইহা সৃষ্টির আদিতে লোকস্রষ্টার সৃষ্টিরূপে প্রকট হয় নাই। ধ্রুবলোক যেমন সাধক-বিশেষের তপস্যার ফলে কাল বিশেষে প্রকট হইয়াছে, গোলোক যেমন শ্রীকৃষ্ণের ভূ-পৃষ্ঠে অবতরণের সঙ্গে সংস্পৃষ্ট উচ্চতম নিত্য ধাম, সুখাবতী যেমন অনাস্রব ধাতুতে অমিতাভ বুদ্ধের বিশুদ্ধ শক্তির প্রভাবে প্রতিষ্ঠিত, জ্ঞানগঞ্জও তেমনি যোগি-বিশেষের তীব্রতম যোগসাধনার প্রভাবে বিশ্বকল্যাণের মহালক্ষ্য পূর্ণ করিবার উদ্দেশ্যে রচিত হইয়াছে। বস্তুতঃ নিত্য হইয়াও উহা নিমিত্তযোগে প্রকট হইয়াছে।

ব্রাহ্মী সৃষ্টির সহিত উহার অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। এই সম্বন্ধটি কি তাহার আলোচনাই দেহ ও কর্ম্মের তত্ত্ব-আলোচনা। এইবার সেই কথাই সংক্ষেপে কিছু বলিতে ইচ্ছা করি।

কর্ম্মের অসংখ্য প্রকার ভেদ আছে, তাহা এখানে আলোচ্য নহে। আমরা এখানে শুধু সাধক ও যোগীর কর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা করিব। যাহারা সাধক নয়, যোগীও নয়, তাহাদের কর্ম্মের আলোচনা বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। জন্ম-মৃত্যুর অতীত হওয়া সাধকের একমাত্র লক্ষ্য। প্রাচীন বৌদ্ধ সম্প্রদায়ে শ্রাবকদের যে স্থান আমাদের আলোচনার ক্ষেত্রে সাধকদিগের স্থানও কতকটা তাহারই অনুরূপ। সাধক জ্ঞান প্রাপ্ত হয় এবং সেই জ্ঞানের অনলে অশুদ্ধ বাসনা দগ্ধ করিয়া মায়িক উৎপত্তির মূল-বীজ দগ্ধ করিতে সমর্থ হয়। ফলে সে জন্ম-মরণের অতীত কৈবল্য-স্থিতির মতন স্থিতি প্রাপ্ত হয়। এই অবস্থা প্রাপ্ত হইলে তাহার পতন হয় না ইহা ঠিক, কিন্তু সে আর ঊর্দ্ধেও উঠিতে পারে না এবং পূর্ণ ভগবত্তার পথে অগ্রসর হইতে পারে না। সাধকের লক্ষ্যও যেমন ক্ষুদ্র, তাহার আধারও তেমনি ক্ষুদ্র। সে গুরুর তীব্র শক্তি ধারণ করিতে পারে না, তাই গুরু তাহাকে তাহার সামর্থ্যের অনুরূপ জ্ঞানই প্রদান করেন।

এই যে জ্ঞান প্রদানের কথা বলা হইল ইহার সহিত কুণ্ডলিনী

শক্তির প্রবোধনের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে। সদ্‌গুরু সাধককে শক্তি-পাত কালে ঠিক সেই পরিমাণ শক্তি সঞ্চার করেন যাহাতে তাহার কুণ্ডলিনী শক্তি উদ্‌বুদ্ধ হইয়া উর্দ্ধগতি অবলম্বনপূর্ব্বক অগ্রসর হইতে সমর্থ হয়। যে সকল অশুদ্ধ বাসনা সাধকের অন্তর্নিহিত জ্ঞান-শক্তিকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে সেইগুলি গুরু-কৃপাতে কুণ্ডলিনী-জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে দগ্ধ হইয়া যায়। ইহার ফলে সাধকের অন্তরাত্মা শুদ্ধ হইয়া গুরুদত্ত চিন্ময়ী শক্তি-স্বরূপ ইষ্টের আকার ধারণ করে। ইহা ক্রমশঃ ঘটিয়া থাকে। এই জন্য সাধকের দীক্ষার পর তাহার যথাবিধি নিজ কর্ম্ম-প্রভাবে প্রবুদ্ধ কুণ্ডলিনী শক্তি বর্দ্ধিত হইয়া ক্রমশঃ চৈতন্যরূপে আত্মবিস্তার করে এবং ধীরে ধীরে সমস্ত দেহ ইন্দ্রিয় মন প্রভৃতিকে চিন্ময়ত্ব দান করে। অশুদ্ধ বাসনা দূর করাই চিৎশক্তির কার্য্য। এই কার্য্য সম্পন্ন হইতে হইতে ক্রমশঃ নিজের সঙ্গে অভিন্নভাবে ইষ্ট-স্বরূপ অভিব্যক্ত হইতে থাকে, কিন্তু উহা সাধকের দর্শনগোচর হয় না। কারণ অশুদ্ধ বাসনার কিঞ্চিৎ অবশেষ বিদ্যমান থাকা পর্য্যন্ত শুদ্ধ বস্তুর সাক্ষাৎকার সম্ভবপর নহে। পক্ষান্তরে ইহাও সত্য যে অশুদ্ধ সত্তা কিঞ্চিৎ পরিমাণে না থাকিলে দেহ ইন্দ্রিয় প্রভৃতির আত্মসত্তা রক্ষা করা অসম্ভব। এই শোধন-কার্য্য সম্পূর্ণ হইলে মলিন বাসনা ক্ষীণ হইয়া যায়। পরে উহা একেবারেই থাকে না। তখনই নির্ব্বিকল্প জ্ঞানের উদয় হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে দেহপাত হয়। নির্ব্বিকল্প জ্ঞানের উদয় মানে এই যে সাধক তখন বাসনামুক্ত হইয়া নিজকে ইষ্টের সহিত অভিন্নরূপে দর্শন করে। ইহাই এক হিসাবে তাহার ইষ্ট-দর্শন এবং অন্য দিক্ দিয়া দেখিলে ইহাই তাহার আত্মদর্শন।

গুরু-কৃপাকে সহায় করিয়া সাধক নিজ শক্তির প্রভাবে সম্যক্ জ্ঞান লাভ করে এবং সিদ্ধাবস্থায় চিদাকাশে স্থিতি প্রাপ্ত হয়। তখন সে বাসনা-মুক্ত চৈতন্যময় আত্মা মাত্র—তাহাতে কোন শক্তির বিকাশ থাকে না এবং তাহার কোন প্রয়োজনও নাই। কিন্তু যে সাধক এই

প্রকার দেহাবস্থায় থাকিতে থাকিতে সাধন-কর্ম্ম সম্পূর্ণ করিতে না পারে তাহার পক্ষে এই প্রকার মরণান্তে চিদাকাশে স্থিতি ঘটে না। সেই সাধক অপূর্ণ নিজের কর্ম্মকে পূর্ণ করিবার অবসর আর পায় না, কারণ সাধকের তো আসন নাই। বর্ত্তমান দেহ ত্যাগের পর আসন-প্রাপ্তির অভাবে সাধক নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়ে। তাহার অগ্রগতি একেবারে রুদ্ধ হয়। এই দেহে থাকিতে থাকিতে যাহার যতটা বিকাশ হইয়াছিল সে সেইখানেই নিশ্চল ভাবে অবস্থিত থাকে। প্রকৃতির স্রোতে তাহাকে অর্থাৎ তাহার তত্ত্বকে চিদাকাশের দিকে টানিয়া লইয়া যায় ইহা সত্য, কিন্তু সাধক নিজে উহা বুঝিতে পারে না।

যোগীর আধ্যাত্মিক গতি ঠিক এই প্রকার নহে। জন্ম-কাল হইতেই যোগীর আধার অধিকতর শুদ্ধ। এইজন্য সদ্‌গুরু তাহাকে যোগ-দীক্ষা প্রদান করেন। ইহার ফলে সঞ্চারিত শক্তির মাত্রা তীব্র হয় এবং অগ্রগতির পদ্ধতিও ভিন্ন হয়। আধার পরিপক্ক না হইলে তীব্রশক্তি ধারণ করা যায় না এবং তীব্রশক্তির ক্রিয়া ভিন্ন পূর্ণ অদ্বৈত তত্ত্বে প্রতিষ্ঠা লাভও হয় না। যোগীর উপলব্ধ শক্তি শুধু যে পরিমাণে তীব্র তাহা নহে, তাহার প্রকৃতিও ভিন্ন। এই শক্তির প্রভাবে শুধু যে মলিন বাসনাদি সংস্কার দগ্ধ হয় তাহা নহে, উহা শোধিত হইয়া যোগীর সহায়করূপে তাহার নিত্য সাথী হয়। সাধকের ক্ষেত্রে ভগবদনুগ্রহে প্রতিকূল শক্তি প্রতিকূল ভাব পরিত্যাগ করিয়া তটস্থ রূপ ধারণ করে, কিন্তু যোগীর ক্ষেত্রে শুধু যে শক্তির প্রতিকূলতা নিবৃত্ত হয় তাহা নহে, উহা অনুকূল শক্তিরূপে পরিণত হয়। এই অনুকূল শক্তি তখন যোগীর আত্মশক্তিরূপে প্রকাশ পায়। সাধক সাধনার পরিসমাপ্তিতে নিরাকার চিৎস্বরূপে স্থিতি লাভ করে, কিন্তু যোগী যোগক্রিয়ার মহিমায় বিশুদ্ধ সাকার রূপে বিরাজ করে। যোগী কখনই নিরাকার অথবা কায়াহীন থাকে না। সাধকের কুণ্ডলিনী জাগরণ হইতে যোগীর কুণ্ডলিনী জাগরণও অনেকাংশে পৃথক্। সাধক

গুরুদত্ত শক্তি মূলধনরূপে গ্রহণ করিয়া উহাকে নিজ কর্ম্মদ্বারা সংবর্দ্ধিত করে—তাহার ফলে উক্ত শক্তিরূপ চিদগ্নি দ্বারা তাহার মলিন বাসনাদি ক্রমশঃ দগ্ধ হইয়া যায় এবং চরমাবস্থায় বাসনাদির পূর্ণ নিবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গেই সাধন-কর্ম্ম পরিসমাপ্ত হয় এবং সাধক ইষ্ট-স্বরূপে নিজেকে প্রাপ্ত হয়। ইহাই তাহার সিদ্ধি—ইহা বিদেহ অবস্থা। বাসনা-নিবৃত্তির আনুষঙ্গিক ফল দেহপাত। পক্ষান্তরে যোগীকে কর্ম্মদ্বারা চিৎশক্তি হইতে চিন্ময় আকার গঠন করিতে হয় না। যোগী উচ্চ অধিকারসম্পন্ন বলিয়া দীক্ষাকালেই গুরুদত্ত চিদাকার প্রাপ্ত হয়। যোগীর কর্ত্তব্য চিৎশক্তিদ্বারা আকার রচনা নহে, কিন্তু কর্ম্মবলে গুরুদত্ত চিদাকারের সহিত সংঘর্ষ করিয়া মলিন বাসনাকে শোধনপূর্ব্বক উহাকে অনুকূল শক্তিরূপে পরিণত করা। সর্ব্বশক্তি-সম্পন্ন এই চিন্ময় আকারকে যোগী নিজের সহিত অভিন্নরূপে বোধ করে, কিন্তু যোগী ইহাকেও অতিক্রম করিয়া উত্থিত হয়। অর্থাৎ যোগী এই চিন্ময় আকার প্রাপ্ত হইয়া উদ্‌বৃত্ত রূপে ইহার সাক্ষী ও নিয়ামক হয়। এই আকার বস্তুতঃ মহাশক্তি বিশ্বজননীরই আকার-বিশেষ। যোগী নিজ স্বরূপে এই আকার প্রাপ্ত হইয়া ক্রমশঃ ইহার পূর্ণত্ব সাধনে তৎপর থাকে। এই পূর্ণতার প্রাপ্তিগত মাত্রার উপরেই তাহার বিশ্বকল্যাণ-সাধনের মাত্রা নির্ভর করে।

সাধক সঙ্কুচিত, কিন্তু যোগী উদার। নিজের ব্যক্তিগত দুঃখ-নিবৃত্তিই সাধকের লক্ষ্য, কিন্তু যোগীর লক্ষ্য শুধু নিজের দুঃখ-নিবৃত্তি নহে। কারণ যোগী পরার্থসেবক বলিয়া নিজের দুঃখ-নিবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে অন্যের দুঃখ-নিবৃত্তির উপায়ও অবলম্বন করেন। তাই যোগী ভিন্ন অন্য কেহ যথার্থ গুরু হইতে পারে না।

সাধক ও যোগীর স্বরূপ ও ক্রিয়া ভেদ সংক্ষেপে বলা হইল। কিন্তু সকল যোগীই এক প্রকার নহে। যোগীর সামান্য লক্ষণ প্রত্যেক যোগাতেই বিদ্যমান থাকে ইহা সত্য, কিন্তু লক্ষ্যগত তারতম্যও অবশ্য থাকে। এই দৃষ্টি অনুসারে যোগীকে খণ্ড ও

অখণ্ড দুই ভাগে বিভাগ করা যায় এবং খণ্ড যোগীকেও খণ্ড ও মহাখণ্ড এই দুই ভাগে বিভাগ করা চলে। এই বিভাগের ফলে খণ্ড, মহাখণ্ড ও অখণ্ড এই তিন প্রকার যোগীর তত্ত্ব আমাদের আলোচনার বিষয়। খণ্ড যোগী এমন একটি উচ্চ আদর্শকে লক্ষ্য করিয়া যোগ-মার্গে অগ্রসর হয় যাহা চিদাকাশের উর্দ্ধে প্রতিষ্ঠিত। যে চিদাকাশ সাধকের কর্ম্ম-সমাপ্তি-স্থান বলিয়া পরম লক্ষ্য তাহাকে ভেদ করিতে না পারিলে এই যোগীর লক্ষ্য-স্থানে উপনীত হওয়া যায় না। ইহা অতি উচ্চাবস্থা এবং জাগতিক দৃষ্টি অনুসারে পরমেশ্বরের এই ভূমিতেই প্রতিষ্ঠিত। খণ্ড যোগের লক্ষ্য কর্ম্ম-প্রভাবে এই ভূমি প্রাপ্ত হওয়া। আমরা মহাখণ্ড ও অখণ্ড যোগের কথা পরে আলোচনা করিব। আপাততঃ খণ্ড যোগের রহস্য সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বর্ণনা করিতেছি।

খণ্ড যোগের লক্ষ্য যে যোগভূমি তাহা যোগ-দীক্ষা প্রাপ্ত না হইলে প্রাপ্ত হইতে পারা যায় না। কারণ দীক্ষার পর কর্ম্মের অভিব্যক্তি আবশ্যক। দীক্ষা দ্বারা ঐ ভূমি প্রাপ্ত হইবার অধিকার-বীজ হৃদয়ে নিহিত হয়, কিন্তু ঐ বীজকে অঙ্কুরিত করিয়া, বৃক্ষরূপে পরিণত করিয়া, পুষ্প-ফলরূপে প্রকাশিত করা যোগ-কর্ম্মের অধীন। যোগী কর্ম্মহীন অথবা কর্ম্মে উদাসীন হইলে গুরু প্রদর্শিত লক্ষ্য প্রাপ্ত হইতে পারে না। দীক্ষা-কালে গুরু কৃপা অথবা অনুগ্রহ-শক্তি সঞ্চার করিয়া থাকেন। ঐ শক্তিকে পূরণ করিতে হয় নিজের পুরুষকার অথবা কর্ম্মের দ্বারা। এই কর্ম্ম কৃপা দ্বারা পরিচালিত তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু কর্ম্ম কর্ম্মই, কৃপা কৃপাই। কর্ম্মের প্রয়োজন কৃপা দ্বারা সিদ্ধ হয় না। যদি কোন খণ্ড যোগী গুরু অর্থাৎ সদ্গুরু কর্ত্তৃক দীক্ষিত হইয়া তাঁহার কৃপা-শক্তি প্রাপ্ত হয় অথচ নিজে অনুরূপ কর্ম্ম না করে তাহা হইলে তাহাকে নিতান্তই দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে। কারণ গুরু যে মহালক্ষ্য তাহার সম্মুখে ধরিয়া দিয়াছেন তাহাকে আয়ত্ত করিবার পূর্ণ অধিকার গুরু হইতে প্রাপ্ত হইয়াও সে কর্ম্মগত

অলসতাবশতঃ লক্ষ্য প্রাপ্ত হইতে পারে না। জীবনের কাল পরিমিত। এই পরিমিত সময়ের মধ্যে কর্ম্ম সমাধা করা আবশ্যক। কারণ দেহত্যাগের পর বিদেহ অবস্থায় কর্ম্ম-দেহের সহিত যোগ না থাকার দরুণ কর্ম্ম করিবার অবসর পাওয়া যাইবে না এবং যোগ-পথের অগ্রগতিও স্তম্ভিত হইয়া পড়িবে। এই রক্ত মাংসের দেহ থাকিতে থাকিতে কর্ম্ম সমাপ্ত হওয়া আবশ্যক। নতুবা লক্ষ্য-প্রাপ্তির আশা এক প্রকার সুদূর পরাহত। মরদেহে কর্ম্ম করিতে পারিলে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই কর্ম্ম সমাপ্ত হইয়া যায়। কর্ম্ম সমাপ্ত না করিয়া স্রোতে ভাসিয়া লক্ষ্য ভূমিতে যাইয়া পৌঁছিলেও তাহার বিশেষ মূল্য নাই। কারণ তখন কমলের বিন্দুতে স্থান লাভ হয় না, দলে আপন যোগ্যতানুসারে স্থান প্রাপ্তি হয়। কিন্তু সাধারণতঃ দলে বসিবার অধিকার হওয়াও কঠিন। দলের বাহিরে জ্যোতির মধ্যে ডুবিয়া থাকিতে হয়।

কিন্তু যোগী গুরু শিষ্যকে যোগ দীক্ষা দিবার পর তাহাকে আশ্রয়স্বরূপ আসন দান করিয়া থাকেন। এই আসন দান একটি রহস্যময় ব্যাপার। আসন দিলেই বুঝিতে হইবে তাহাকে নিরন্তর কর্ম্ম করিবার অবসর দেওয়া হইল। কিন্তু আসন বিস্তার করা হয় ভূমির উপর। তাই গুরুকে আসন দানের সঙ্গে সঙ্গে আসন বিছাইবার জন্য ভূমিও দান করিতে হয়। কিন্তু এই ভূমি কোথায়? যোগী শিষ্য যখন আসন প্রাপ্ত হইয়াছে তখন বুঝিতে হইবে যে দেহত্যাগের পরেও তাহার আত্মিক সত্তা নিরালম্ব অবস্থায় উড্ডীন-ভাবে বিদ্যমান থাকিবে না। উহা ভূমিতে বসিবার অবসর প্রাপ্ত হইবে। এই ভূমিতে নিজ নিজ আসনে উপবিষ্ট হইয়া তাহাকে কর্ম্ম করিতে হইবে। এই কর্ম্ম অতি দীর্ঘকাল-সাধ্য, কারণ ইহা মর-দেহের কর্ম্ম নহে। কিন্তু মরদেহ না হইলেও ইহাও কর্ম্ম-দেহ যদিও এই কর্ম্ম-দেহে ক্ষিপ্রবেগে কর্ম্ম সিদ্ধ হয় না। যোগী শিষ্য মৃত্যুর পর অবশিষ্ট কর্ম্ম সম্পাদন করিবার জন্য যে বিশুদ্ধ ব্যাপক

ভূ-খণ্ড প্রাপ্ত হয় তাহাকে গুরুধাম বলা হইয়া থাকে। ঐ স্থানে প্রতি যোগী আপনাপন আসনে আসীন হইয়া কর্ম্মে নিরত রহিয়াছে। সুদীর্ঘকালে ঐ কর্ম্মের প্রভাবে যোগীর যোগ-চক্ষু উন্মিলিত হয়। বস্তুতঃ তখনই যোগীর প্রকৃত যোগ-পথ খুলিয়া যায়। ঐ পথে চলিবার সময় গুরুধামের কায়াও আর থাকে না। তখন দৃষ্টিময় দিব্য স্বরূপে মধ্য রেখা অবলম্বনপূর্ব্বক ক্রমশঃ চলিতে চলিতে চিদাকাশ ভেদ করিয়া লক্ষ্যস্থানে উপনীত হয়। লক্ষ্যস্থান বলিতে এখানে কমলের কোন না কোন একটি দল বুঝিতে হইবে—কর্ণিকা নহে। কমলের কর্ণিকাতে যাইবার অধিকার একমাত্র তাহারই আছে যে মরদেহে থাকিয়া সমস্ত কর্ম্ম সমাপ্ত করিতে সমর্থ হয়। সর্ব্বত্রই মরদেহের কর্ম্মের পূর্ণ প্রভাব না থাকিলে কমলের কর্ণিকাতে বসিবার যোগ্যতা লাভ হয় না। কর্ণিকাতে বসা মানেই অঙ্গিরূপে বা অঙ্গরূপে চক্রের অধিষ্ঠাতা হওয়া অর্থাৎ সমগ্র রাজ্যের অধিকারী হওয়া কিম্বা রাজার ন্যায় সিংহাসনে উপবেশন করা। দলে বসা মানে সাধারণ প্রজার ন্যায় বিন্দুর অধীনতা স্বীকারপূর্ব্বক প্রজারূপে নিজের স্থান প্রাপ্ত হওয়া। উভয়ে অনেক পার্থক্য আছে।

সুতরাং পূর্ব্বোক্ত বিবরণ হইতে বুঝিতে পারা যাইবে যে, প্রকৃত প্রকৃত যোগ-দীক্ষা প্রাপ্ত হইলে মৃত্যুর পরে গুরুস্থানে গতি হয় এবং সেখানে পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট নিজ-স্থান প্রাপ্ত হওয়া যায়। সিদ্ধভূমি অধিকাংশ স্থলে এই গুরুস্থানের অন্তর্গত। অবশ্য ইহার বাহিরেও যে সিদ্ধভূমি না আছে তাহা নহে। গুরুধাম হইতে যে গতি লাভ হয়, যাহা খণ্ড যোগীকে লক্ষ্য পর্য্যন্ত সঞ্চালন করিয়া লইয়া যায়, তাহাতে দেহভেদ সিদ্ধ হয় না এবং প্রকৃত মধ্য রেখাও প্রাপ্ত হওয়া যায় না। কথাটি অত্যন্ত দুরূহ, কিন্তু বুঝিতে না পারিলে বক্তব্যের অভিপ্রায় পরিস্ফুট হইবে না। স্বয়ং বিশ্বজননী কোন না কোন রূপ ধরিয়া উন্মীলিত-যোগচক্ষু যোগীর নিকট আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকেন। তাঁহার প্রকৃত স্বরূপ সাধক তো প্রাপ্ত হয়ই না, খণ্ড যোগীও প্রাপ্ত

হইতে পারে না। খণ্ড যোগী আভাসমাত্র লাভ করে। তবে এই আভাসেরও তারতম্য আছে। যোগ-চক্ষু উন্মীলনের পরেই বিশ্ব-জননীর যে রূপ ও রাজ্য প্রকাশিত হয় তাহা সর্ব্ব নিম্নস্তরের। ঐ রাজ্যে সাধকও আসিতে পারে এবং আসিয়াও থাকে, কিন্তু সে মায়ের স্বরূপ-দর্শন পায় না। দুর্ব্বল খণ্ড যোগী স্বরূপ-দর্শন পায় বটে, কিন্তু সেইখানেই বিশ্রাম লাভ করে। তাহার অগ্রগতি সেইখানেই রুদ্ধ হইয়া যায়। তাহার পরে যে রাজ্যটি আছে সেটিও বিশ্বজননীরই রাজ্য। সেখানেও কমলের দলে বিশ্বজননীরই আসন, কিন্তু ঐটি মধ্যম খণ্ড যোগীর আদর্শ। তিনি উহার দর্শন পান এবং ঐখানেই থাকিয়া যান। সাধকের উহাই চরম লক্ষ্য, কিন্তু সাধকের স্থিতি এবং যোগীর স্থিতি একই স্থানে বিভিন্ন হইয়া থাকে। খণ্ড যোগীর মধ্যে যিনি উত্তম তাঁহার আদর্শ চিদাকাশের উর্দ্ধে, যাহার কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। মর-দেহে কর্ম্মের সমাপ্তি না হইলে কেন্দ্রে যাইয়া মাতৃ-অঙ্কে উপবেশন করা যায় না।

বিশ্বজননীর এই যে তিনটি রূপের কথা বলিলাম এই তিনটিই তাঁহার স্বরূপের ছায়া, অনুছায়া এবং প্রতিচ্ছায়া—কোনটিই প্রকৃত স্বরূপ নহে। কিন্তু যে খণ্ড যোগী অথচ পূর্ণ কর্ম্মী সে ছায়াটি প্রাপ্ত হয়, অবশ্য মরদেহে কর্ম্ম সমাপ্ত হইলে। কারণ রক্তহীন দেহে কর্ম্মের সেই পরিমাণ সংবেগ উৎপন্ন হয় না যাহাতে মধ্য বিন্দুতে প্রবিষ্ট হওয়া সম্ভবপর হয়। যোগীর এই যোগভূমিতে ঐশ্বর্য্য অতুলনীয় ভাবেই প্রকাশিত হয়, কিন্তু মহাজ্ঞান আসে না। কারণ খণ্ডযোগের চরম উৎকর্ষের অবস্থাতেও মহাজ্ঞান উদিত হয় না।

মহাজ্ঞান সেই রাস্তায় প্রকাশিত হয় যাহা নিজ কায়া ভেদ করার পর উন্মুক্ত শুদ্ধ দৃষ্টির সম্মুখে আত্মপ্রকাশ করে। এই পথের যাত্রী অত্যন্ত দুর্লভ, কারণ যে সকল যাত্রী খণ্ডযোগের পথে চলে তাহারা ঠিক ঠিক এই পথ চেনে না এবং এই পথের সন্ধান না পাওয়া পর্য্যন্ত বিশ্বজননীর স্বরূপ দর্শনের আশা অলীক কল্পনামাত্র। প্রত্যেক

পথেই আদি বিন্দু হইতে অন্তিম বিন্দুটি দৃষ্টিতে ভাসিয়া উঠে! খণ্ড-যোগীর দৃষ্টির সম্মুখে অন্তিম বিন্দুরূপে চিদাকাশের ঊর্দ্ধস্থ মহাভূমি লক্ষিত হয়, তাহার পরে অথবা বাহিরে আর যে কিছু আছে বা থাকিতে পারে তাহা ধারণাতে আসে না। কিন্তু মহাখণ্ড-যোগীর দৃষ্টিতে যে পথটি ভাসে তাহা পূর্ব্বোক্ত পথ হইতে ভিন্ন। কারণ এই পথের অন্তিম কোটিতে বিশ্বজননীর প্রকৃত স্বরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। এই দৃশ্য খণ্ডযোগীর পরম্ আদর্শেরও ঊর্দ্ধস্থিত, ও তাহার দৃষ্টির অগম্য। তাহার লক্ষ্য বিশ্বজননীর স্বরূপ হইলেও বস্তুতঃ উহা এই মহাস্বরূপেরই প্রথম ছায়া মাত্র। ইহার যেটি ছায়া বা অনুছায়া তাহাই সাধকের সিদ্ধ অবস্থার লক্ষ্য। দ্বিতীয় ছায়ার যেটি প্রতিচ্ছায়া সেইটি নিম্নস্তরের খণ্ডযোগীর লক্ষ্য। তাহা হইতে যে রশ্মি নির্গত হইয়াছে তাহাই অখণ্ডভাবে প্রসারিত হইয়া সমগ্র সাধককুলের ধ্যেয়রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে।

আধ্যাত্ম মার্গে কৃপা ও কর্ম্মের পরস্পর সম্বন্ধ বিশেষরূপে অনুধাবনের যোগ্য। সাধকের জীবনে কৃপার স্থান প্রধান এবং কর্ম্মের স্থান গৌণ। বস্তুতঃ সাধকের প্রকৃত কর্ম্ম এক প্রকার নাই বলিলেও চলে। যাহা কর্ম্মরূপে প্রতীত হয় তাহা কর্ম্মের আভাস-মাত্র। পক্ষান্তরে যোগীর যোগ-পথে কর্ম্মই প্রধান—অবশ্য কৃপা সর্ব্বত্রই আছে, কিন্তু কৃপা অপেক্ষা কর্ম্মেরই মহিমা অধিক। ইহার মধ্যেও খণ্ড ও মহাখণ্ডযোগে কর্ম্মের প্রাধান্য ও উৎকর্ষ থাকিলেও আপেক্ষিক দৃষ্টিতে কৃপাই প্রধান। কিন্তু অখণ্ডযোগে কৃপা গৌণ, এমন কি স্থূলতঃ লুপ্তপ্রায়, কিন্তু কর্ম্মই আপন প্রাধান্য লইয়া খণ্ড কৃপাকে অভিভূত রাখিয়া আত্মপ্রকাশ করে। কর্ম্ম এই ভাবে স্বপ্রতিষ্ঠিত হইলে পূর্ণ পুরুষকার প্রকটিত হয় এবং মহাকৃপা আত্মপ্রকাশ করে। মহাকৃপা ও পরম পুরুষকার অভিন্নরূপে একই ক্ষণে ফুটিয়া উঠে।

খণ্ড যোগী যেমন দীক্ষা-কালে আসন প্রাপ্ত হয় তদ্রূপ মহাখণ্ড-

যোগীও আসন প্রাপ্ত হয়। তবে ইহা উচ্চতর আসন। খণ্ড যোগী স্বকর্ম্ম অসমাপ্ত রাখিয়া দেহত্যাগ করিলে দেহান্তে একটি ভুবন প্রাপ্ত হয় যেখানে স্থিত হইয়া নিজ নিজ আসনে কর্ম্ম করিবার অধিকার জন্মে এবং কর্ম্ম-সমাপ্তির পর নেত্র উন্মীলিত হইলে দিব্য দৃষ্টি উন্মীলিত হইয়া যায় ও উহাকে অবলম্বন করিয়া চিদাকাশের উর্দ্ধস্থ ভূমি পর্য্যন্ত অগ্রসর হওয়া সম্ভবপর হয়। মহাখণ্ড যোগী উচ্চতর লোক হইতে সমাগত। তিনি উর্দ্ধতর ভূমির সন্ধান পান এবং তাহার অনুসরণ করিয়া চলিতে চলিতে যথা সময়ে উক্ত ভূমিতে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। খণ্ড যোগীর লক্ষ্য হইতে মহাখণ্ড যোগীর লক্ষ্য বিশাল। খণ্ড যোগীর চরম লক্ষ্যের পর হইতে মহাখণ্ড যোগীর চরম লক্ষ্য পর্য্যন্ত যে মার্গ দৃষ্ট হয় তাহা এক প্রকার অভিনব আবিষ্কার। আপাতদৃষ্টিতে ইহাকে বিশ্বের কেন্দ্র বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। অখণ্ড যোগে এই বিশ্বের সহিত বিশ্বাতীত মহাসত্তার যোগ প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু সে প্রসঙ্গ এই স্থানে উত্থাপিত করা সঙ্গত নহে।

মহাখণ্ড যোগ-দীক্ষার পর পরম প্রকৃতির স্নেহময় উৎসঙ্গে উপবেশন করিবার অধিকার জন্মে। অবশ্য ইহা কর্ম্ম-সাপেক্ষ, কিন্তু যে যোগী মরদেহে কর্ম্ম সমাপ্ত করিবার পূর্ব্বে দেহ ত্যাগ করে সে খণ্ড যোগীর ন্যায় এমন একটি আসন প্রাপ্ত হয় যাহাকে আশ্রয় করিয়া সে প্রকৃতির উর্দ্ধদেশে একটি সিদ্ধ স্থান লাভ করে, যেখানে নিজ আসন বিছাইয়া অবশিষ্ট কর্ম্ম পূর্ণ করিতে সমর্থ হয়। এই সিদ্ধ স্থানটি তিব্বতায় গুপ্ত যোগিগণের পরিভাষাতে 'জ্ঞানগঞ্জ' নামে প্রসিদ্ধ। এই জ্ঞানগঞ্জ সিদ্ধ ভূমি এবং পূর্ব্ব-বর্ণিত গুরুধামও সিদ্ধ ভূমি, কিন্তু উভয়ে ভেদ আছে। গুরুধামে অপূর্ণ খণ্ড যোগী কর্ম্ম পূর্ণ করিবার জন্য স্থান প্রাপ্ত হয়—এই স্থানই তাহার গুরুদত্ত আসন। তদ্রূপ জ্ঞানগঞ্জে অপূর্ণ মহাখণ্ড যোগী আরব্ধ কর্ম্ম পূর্ণ করিবার জন্য স্থান প্রাপ্ত হয়—ইহাই তাহার আসন-প্রাপ্তি। বস্তুতঃ দীক্ষাকালেই এই আসন অথবা

উপবেশন-স্থান প্রাপ্ত হওয়া যায়, যদিও ইহা দীক্ষাকালে দীক্ষার্থী অথবা দীক্ষিতের নেত্রগোচর হয় না।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যোগীর সাধন-জীবনে কর্ম্মই প্রধান, সুতরাং এই জীবনে গুরু হইতে যে কৃপা প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহা সম্যক্ প্রকারে শোধ করিয়া ফেলিতে হয়। কৃপায় নিজ শক্তির বিকাশ স্থগিত থাকে, অথচ সাধনের প্রাথমিক অবস্থায় কৃপা ব্যতীত এক পদও অগ্রসর হওয়ার উপায় নাই। এই জন্য যোগীর পক্ষে নিয়ম এই যে গুরু হইতে কৃপা গ্রহণ করিয়া পরে উহা স্ব-কর্ম্ম দ্বারা গুরুকে শোধ করিতে হয়। গুরুপ্রদত্ত কৃপা ঋণরূপে গ্রহণ করিয়া নিজের অর্জিত কর্ম্ম দ্বারা উহাকে মিটাইয়া ফেলিতে হয়। তখন ভবিষ্যৎ কর্ম্মের পথ সুপ্রশস্ত হয়, তাহার পূর্ব্বে নহে। গুরুর প্রধান কাজ শিষ্যকে কালের রাজ্য হইতে উদ্ধার করা। সাধনমার্গে ইহা সম্পন্ন হয়, যোগ-মার্গেও হয়। কিন্তু সাধন-মার্গে শুধু কালের উত্তাল তরঙ্গ হইতে শিষ্যকে উদ্ধার করিয়াই গুরুর করুণা নিবৃত্ত হয়, তাহাকে কালাতীত কোন উচ্চ-পদে অভিষিক্ত করিতে পারে না। যোগ-পথে কর্ম্মের প্রাধান্য থাকে বলিয়া কালাতীত রাজ্যে যোগী বিশিষ্ট অধিকারসম্পন্ন স্থান প্রাপ্ত হয়। খণ্ড-যোগীর অধিকার হইতে মহাখণ্ড-যোগীর অধিকার শ্রেষ্ঠ, এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অধিকার অখণ্ড-যোগীর—যাহা এখনও জগতে প্রকাশিত হয় নাই। অখণ্ড-যোগীর মহান্ অধিকারই সমগ্র বিশ্বকে সর্ব্বপ্রকার অভাব হইতে মুক্ত করিয়া পূর্ণ আনন্দ ও ঐশ্বর্য্যে প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ।

সাধকের কর্ম্মের সমাপ্তি আছে, কিন্তু যোগীর কর্ম্মের সমাপ্তি নাই। যোগী পূর্ণত্ব লাভ করিয়াও ক্রিয়াহীন হইয়া বসিয়া থাকে না। তাহার স্বভাবসিদ্ধ কর্ম্ম চিরদিনই চলিতে থাকে এবং ইহা নিবৃত্ত কখনও হয় না এবং হইতেও পারে না। তাই পূর্ণতা লাভের পরেও পূর্ণকে পূর্ণতর, পূর্ণতম প্রভৃতি ক্রমে অনন্ত অবস্থার ভিতর দিয়া উৎকর্ষণ করা, ইহাই যোগীর কর্ম্মের স্বাভাবিক পরিণতি। শ্রীঅরবিন্দ

তাঁহার বিশ্ব-সমস্যা (The Riddle of the World) নামক গ্রন্থে ইঙ্গিত করিয়াছিলেন যে, আপাতদৃষ্টিতে অজ্ঞান সম্যক্ প্রকারে নিরত না হওয়া পর্য্যন্ত কর্ম্মের ধারা অথবা ক্রমবিকাশ অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে ভগবৎ-স্বরূপে প্রবিষ্ট হইয়াও অনন্ত অগ্রগতির সম্ভাবনা রহিয়াছে। তাঁহার এই বাক্য অত্যন্ত সত্য। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও সত্য যে এই অনন্ত অগ্রগতি অখণ্ড স্থিতির মধ্যেই ঘটিয়া থাকে। স্থিতি লাভ না করিলে অনন্ত কর্ম্মের কোন অর্থই হয় না— তখন স্থিতিই হয় কর্ম্মের লক্ষ্য। কিন্তু স্থিতির পরেও যদি কর্ম্ম রাখিতে পারা যায় তবে উহাই হয় দিব্য কর্ম্ম, যাহার অন্ত কখনই হইতে পারে না।

জ্ঞানগঞ্জের যোগ-দৃষ্টি অনুসারে তিনটি যোগ-ক্ষেত্রের সন্ধান পাওয়া যায়। প্রথম ক্ষেত্রটিতে মহাভাব পর্য্যন্ত লক্ষ্য রূপে পাওয়া যায়। এই ক্ষেত্রের ভূমিটি হয় গুরুধাম। খণ্ড যোগী কর্ম্ম পূর্ণ করিতে পারিলে এই লক্ষ্য প্রাপ্ত হয়, পূর্ণ না করিতে পারিলে যে অবস্থায় স্থূল দেহের ত্যাগ হয় সেই অবস্থায় অনুরূপ স্থিতি প্রাপ্ত হইয়া ক্রমশঃ লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। স্থূল দেহ ত্যাগের পর ক্ষিপ্রগতিতে কর্ম্ম চলে না, মন্দ মন্দ ভাবে চলে। দ্বিতীয় যোগ-ক্ষেত্রটি পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক ব্যাপক, ইহার লক্ষ্য স্থান মহাভাবের অতীত, এমন কি সূর্য্য-মণ্ডলের উর্দ্ধস্থ। ইহা পরমা-প্রকৃতির স্বরূপ-প্রকাশ। ইহার ভূমিটিই জ্ঞানগঞ্জ। মহাখণ্ড-যোগ-ক্রিয়ার অবসানে এই লক্ষ্য খুলিয়া যায়। পূর্ব্বের ন্যায় এই স্থলেও স্থূল দেহে কর্ম্ম সমাপ্ত করিতে পারিলে লক্ষ্যের সন্নিহিত হওয়া সহজ সাধ্য, কিন্তু কর্ম্ম অসম্পূর্ণ রাখিয়া দেহ ত্যাগ করিলে জ্ঞানগঞ্জ হইতে কর্ম্মের গতি চলিতে থাকে। পুর্ব্বের ন্যায় এই গতিও অপেক্ষাকৃত মন্দ, স্থূল দেহের কর্ম্মের ন্যায় ক্ষিপ্র নহে।

তৃতীয় যোগ ক্ষেত্রটি এখনও অঙ্কনের মধ্যেই পরিসমাপ্ত রহিয়াছে। ইহার ভূমি ও লক্ষ্য বিশ্ব-গুরু। কালরাজ্য বাহিরে নাই বলিয়া

তখন ভূমি ও লক্ষ্যপ্রাপ্তিতে কালের কোন ব্যবধান নাই। ইহার ক্ষেত্র অখণ্ড বিশ্ব। এই স্থলেও স্থূল দেহে কর্ম্মের পূর্ণতা ব্যতীত ভূমি ও লক্ষ্যপ্রাপ্তি অসম্ভব।

তিনটি ক্ষেত্রই কর্ম্মস্থান। প্রথমটির পরিধি অতি বিশাল। কালের রাজ্য এই পরিধির বাহিরে অবস্থিত। দ্বিতীয়টির পরিধি প্রথমটি অপেক্ষাও অনেক অধিক বিশাল, ইহার ফলে কালের রাজ্য অনেকটা সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়াছে। তৃতায়টির পরিধি সমগ্র বিশ্ব বা সৃষ্ট জগৎ। এই স্থলে কালের রাজ্য শূন্য রূপে পরিণত হইয়াছে। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যাইবে যে তিনটি যোগকর্মের তীব্রতা ক্রমশঃই অধিক। সূর্য্যমণ্ডল ভেদ করিতে না পারিলে তৃতীয় ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায় না। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও প্রতীত হইবে যে গুরুর করুণা-শক্তির মাত্রা প্রথম ক্ষেত্র হইতে দ্বিতীয় ক্ষেত্রে প্রবল এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্র হইতে তৃতীয় ক্ষেত্রে আরও অধিক প্রবল। বস্তুতঃ ইহারই নামান্তর মহাকরুণা। শুধু তাহাই নহে, কৃপার ক্ষেত্রও ক্রমশঃ অধিক প্রসারিত হইতে হইতে তৃতীয় ভূমিতে বিশ্ব-ব্যাপী হইয়া পড়িয়াছে।

কৃপা ও কর্ম উভয়ই মূলতঃ একই শক্তি। একই অখণ্ড সত্তা অবিভক্ত থাকিয়াও নিজকে লীলাচ্ছলে দ্বিধা বিভক্ত করিয়া থাকে। এই ভাবে একদিকে অণু এবং অপর দিকে মহান্, একদিকে বৃহৎ এবং অপর দিকে ক্ষুদ্র, এই প্রকার দুইটি পরস্পর বিরুদ্ধ ভাবের উদয় হইয়া থাকে। অণুকে মহানের নিকট যাইতে হইলে কর্ম অবলম্বন করিতে হয়। অণুতে যে শক্তি নিহিত রহিয়াছে তাহাই কর্ম রূপে অভিব্যক্ত হইয়া অণুর অগ্রগতির সহায়তা করে। কিন্তু শুধু কর্মশক্তির দ্বারা অণুর পক্ষে মহান্‌কে প্রাপ্ত হওয়া সম্ভবপর নহে। মহানের কৃপা-শক্তিও অণুর সহকারী হওয়া আবশ্যক। অতএব মহানের কৃপা-সহকৃত অণুর কর্মশক্তি একটি প্রধান উপায়। এই প্রকার কৃপা-শক্তির প্রাধান্য স্থলেও বুঝিতে হইবে। মহানের কৃপা

উদ্রিক্ত হইলেই যে অণু মহান্‌কে প্রাপ্ত হইবে অথবা মহান্‌ অণুকে প্রাপ্ত হইবে তাহা বলা যায় না। কৃপার সহকারিরূপে অণুর কর্মশক্তি অভিব্যক্ত ও প্রযুক্ত হওয়া আবশ্যক। এই প্রকার উভয় শক্তির পরস্পর সংমিশ্রণে অণু ও মহানের যোগ সিদ্ধ হয়। সাধারণ দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে কর্ম-সাপেক্ষ কৃপা ও কৃপা-সাপেক্ষ কর্ম উভয়ই আবশ্যক। অণুর প্রকৃতি ভেদে সাপেক্ষতার তারতম্য ঘটিয়া থাকে। মনে রাখিতে হইবে নিরপেক্ষ শক্তির ক্রিয়াও ক্ষেত্রবিশেষে সম্ভবপর। ঐস্থলে উহা পূর্ণ শক্তিরই দ্যোতক, কারণ অপূর্ণ শক্তি নিরপেক্ষ হইতে পারে না। এই পূর্ণ শক্তি যদি কৃপারূপে প্রকট হয় তাহা হইলে ঐ কৃপা ধারণের উপযোগী অণুনিষ্ঠ কর্মশক্তিও উহা হইতেই প্রকট হয়। পক্ষান্তরে এই পূর্ণ শক্তি যদি অণুর কর্ম-শক্তিরূপে প্রকট হয় তাহা হইলে ঐ কর্ম-শক্তির সহকারিস্বরূপ কৃপা-শক্তিকে উহা স্বয়ংই মহাকৃপারূপে অভিব্যক্ত করিয়া তুলে। ফলে স্বরূপে অবস্থান ও আত্মৈশ্বর্য্যের বিকাশ যথাবৎ ঘটিয়া থাকে। কিন্তু ইহার মধ্যে একটি গভীর সমস্যা বিচারণীয় রহিয়াছে। কৃপার প্রাধান্যে মিলনও অদ্বৈতস্থিত ঐশ্বরিক শক্তিকে আশ্রয় করিয়া হইয়া থাকে অর্থাৎ, যেমন যেমন ঐশ্বরিক কৃপা বর্দ্ধিত হয় তেমনি তেমনি আত্মা কর্মানুরূপ ঊর্দ্ধগতি লাভ করে ও গতির অবসানে পরমাত্মা-স্বরূপে একত্ব লাভ করে। যদি কর্মের প্রাধান্য স্বীকৃত হয় তাহা হইলে ঐ কর্মের প্রভাবে অনুরূপ অনুগ্রহ শক্তির বিকাশে ঈশ্বর-সত্তা ক্রমশঃ সন্নিহিত হইতে থাকে এবং অন্তিম অবস্থায় ঈশ্বরভূত যোগীর স্বরূপে আত্মসমর্পণ করে। এই দুইটিই অদ্বৈত স্থিতি। কিন্তু উভয়ে পার্থক্য আছে। প্রথম অবস্থায় 'আমি' 'তুমি' রূপে পরিণত হইয়া অদ্বৈত ভাব গ্রহণ করে। তখন অবশ্য তুমি আমি একই হইয়া যায়। দ্বিতীয় পরিস্থিতিতে তুমি আমিতে পরিণত হয়, তাহার পর অবশ্য সেই মূল স্থিতিতে প্রবেশ হয়। কিন্তু আর একটি স্থিতি আছে। তখন

আমিকে তুমির কাছে যাইতে হয় না এবং তুমিকেও আমির কাছে আসিতে হয় না। তখন আমি নিজের মধ্যেই তুমিকে খুঁজিয়া পায়, তুমিকে খুঁজিতে বাহিরে যাইতে হয় না। তদ্রূপ তুমিও নিজের মধ্যে আমিকে খুঁজিয়া পায়, আমির জন্য তুমিকেও বাহিরে আসিতে হয় না। উভয়ের মধ্যেই আশ্রয়-তত্ত্ব ও বিষয়-তত্ত্ব বিদ্যমান রহিয়াছে। যে আশ্রয় সেই বিষয় এবং যে বিষয় সেই আশ্রয়। সুতরাং একের অভাব অপরের অভাব এবং একের প্রাপ্তি অপরের প্রাপ্তি—উভয়ে কোন ভেদ নাই। এই দুই-এর সমীকরণ হইলে পরম পরিপূর্ণ সত্যের প্রতিষ্ঠা হয়। তখন আশ্রয় ও বিষয়ের সাম্য অভিব্যক্ত হয়।

তিনটি যোগ-ক্ষেত্রই কালের অতীত। কিন্তু প্রথম ও দ্বিতীয় ক্ষেত্রের বাহিরে কালের রাজ্য বিদ্যমান। তৃতীয় ক্ষেত্র অভিব্যক্ত হইলে কালের রাজ্য পৃথক্ ভাবে আর থাকিবে না। প্রথম ও দ্বিতায় ক্ষেত্র কালের রাজ্যের সমসূত্রে থাকিলেও ঐ দুইটি রাজ্যের মধ্যে কালের প্রভুত্ব নাই। কিন্তু প্রভুত্ব না থাকিলেও কিঞ্চিৎ প্রভাব বিদ্যমান আছে। প্রতি ক্ষেত্রেই বিভিন্ন স্তর আছে। নিম্নবর্ত্তী স্তরে কালের কিঞ্চিৎ প্রভাব লক্ষিত হইলেও উর্দ্ধ স্তরে তাহা অত্যন্ত হ্রাস প্রাপ্ত হয়। অবশ্য অতি সূক্ষ্মভাবে তাহা থাকে তাহাতে সন্দেহ নাই। তৃতায় ক্ষেত্রে বাহিরে কালের রাজ্য না থাকিলেও অন্তঃ-প্রবিষ্টভাবে ঐ ক্ষেত্রের মধ্যে কালের শক্তি ক্রিয়া করিয়া থাকে। পরিপূর্ণ অবস্থা প্রাপ্তির জন্য ইহা আবশ্যক। ইহা ক্রমশঃ পরিস্ফুট হইবে।

কালের ধর্ম্ম জরা এবং মৃত্যু। দেহের ক্রমিক বিকাশ, যাহার ফলে সদ্যোজাত শিশু-দেহ বৃদ্ধ-শরীরে পরিণত হয়, ইহাই জরা। কালে প্রভাব বশতঃই ইহা ঘটিয়া থাকে। কালের জগতে জরা হইতে কেহ মুক্ত হইতে পারে না। কালের দ্বিতীয় ধর্ম্ম মৃত্যু। কালের জগতে ইহাও সর্ব্বত্র দৃষ্ট হয়। এই জন্য কালের জগৎকে মরলোক অথবা মৃত্যুলোক বলিয়া অভিহিত করা হয়। সুতরাং

কালের রাজ্যের ঊর্দ্ধে কোন রাজ্য স্থাপিত হইলে তাহা হইতে কালের এই দুইটি ধর্ম্ম স্বভাবতই বর্জ্জিত হইবার কথা। ইহা ছাড়া, ক্ষুধা ও পিপাসা ইহাও কাল-রাজ্যের আনুষঙ্গিক ধর্ম্ম! সুতরাং ক্রমশঃ শুদ্ধ জগতে এই দুইটি ধর্ম্ম তিরোহিত হইয়া যায়। কালের রাজ্যের আর একটি আনুসঙ্গিক ধর্ম্ম কাম-বৃত্তির প্রভুত্ব এবং তদাশ্রিত ও তন্মূল অন্যান্য মানসিক বৃত্তির ক্রিয়া। শুদ্ধ রাজ্যে এই সম্বন্ধেও বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হয়।

মর্ত্ত্যলোকের ঊর্দ্ধে নানা প্রকার স্বর্গীয় ভুবনাবলী ও তদনুরূপ ভোগপ্রধান দিব্য স্থান আছে। এইজন্য ঐ সকল স্থানে কামের অভাব নাই এবং ভোগেরও নিবৃত্তি নাই। তবে ওখানে কালের বেগ ভূলোক হইতে অন্য প্রকার বলিয়া জরার অনুভব হয় না এবং কালে দেহের পতন ঘটে। ঐ সকল স্থান কর্ম্ম-ভূমি নহে। উহারা ভোগভূমি এবং যোগীর পক্ষে সর্ব্বথা হেয়। পূর্ব্বে যে সকল যোগক্ষেত্রের বর্ণনা করা হইয়াছে উহারা অত্যন্ত বিশুদ্ধ এবং কর্ম্ম-ভূমি বলিয়া ঐ সব স্থানে ভোগের আধিপত্য নাই, যদিও কালের প্রভাব অনুভূত হয়। কিন্তু ঊর্দ্ধ স্তরে তাহা হয় না। তবে কালের কিঞ্চিৎ প্রভাব থাকে বলিয়াই নিম্ন স্তর মৃত্যু-বর্জ্জিত হইলেও জরা-বর্জ্জিত নহে। স্বর্গাদি ভোগস্থান যেমন জরা-বর্জ্জিত হইলেও আপেক্ষিক মৃত্যু-বর্জ্জিত নহে, এইগুলি ঠিক তাহার বিপরীত—মৃত্যু-বর্জ্জিত হইয়াও জরা-বর্জ্জিত নহে। ঊর্দ্ধ স্তরে মৃত্যু তো নাই-ই, জরাও নাই। নিম্ন স্তরে জরা থাকে বলিয়াই সেখানকার যোগী ঋষিগণ সহস্র সহস্র বৎসর তপস্যা করিয়া বৃদ্ধত্ব প্রাপ্ত হন এবং জরাজীর্ণ দেহে কর্ম্ম পূর্ণ করিতে নিরন্তর উদ্যত থাকেন। এই কর্ম্মের ফলেই তাঁহারা নিম্ন স্তর হইতে ঊর্দ্ধ স্তরে উন্নীত হন। তখন তাঁহাদের স্থবির জীর্ণ দেহ কিশোর অথবা তরুণ দিব্য লাবণ্যময় শ্রী-বিগ্রহ রূপে পরিণত হয়। গুরুধাম এবং জ্ঞানগঞ্জ উভয় স্থানেই এই বৈশিষ্ট্য দেখিতে পাওয়া যায়।

জ্ঞানগঞ্জ সম্বন্ধে পূর্ব্বে কিছু আলোচনা করা হইয়াছে। তাহা হইতেই জ্ঞানগঞ্জের তত্ত্ব সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আভাস প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। জ্ঞানগঞ্জ এক প্রকার অভিনব আবিষ্কার বলা চলে অথচ অনাদি কাল হইতেই ইহা বিদ্যমান রহিয়াছে—প্রথমে অব্যক্ত রূপে, তাহার পর অভিব্যক্ত ও পুষ্টরূপে। আমরা পূর্ব্বে পর পর তিনটি যোগ-ভূমির কথা বলিয়াছি—এগুলি যোগীর উপলব্ধিগোচর এবং প্রাপ্য মায়াতীত ও কালাতীত রাজ্য। এই তিনটির মধ্যে প্রথমটিকে আমরা গুরুধাম অথবা গুরুরাজ্য বলিয়া নামকরণ করিয়াছি—দ্বিতীয়টিকে জ্ঞানগঞ্জ বলিয়াছি এবং তৃতীয়টির কোন নাম নির্দ্দেশ করি নাই, কারণ উহা এখনও অব্যক্ত অবস্থা হইতে ব্যক্ত অবস্থায় ফুটিয়া উঠে নাই। প্রথম যোগ-ভূমিরূপ গুরুরাজ্যটি আগম শাস্ত্রে বিশুদ্ধ অধ্বা নামে সাঙ্কেতিক ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। সাধারণতঃ প্রচলিত সাধনপ্রণালীতে উহার স্পষ্ট সন্ধান পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু গুহ্য সাধন-সংক্রান্ত আগম সাহিত্যে উহার অতি স্পষ্ট নির্দ্দেশ আছে।

আমরা শুষ্কজ্ঞান ও দিব্যজ্ঞানের আলোচনা করিলে এই উভয় জ্ঞানের মধ্যে ভেদ দর্শন করিতে পারি। শুষ্কজ্ঞানের সন্ধান সর্ব্বত্রই পাওয়া যায়; কিন্তু উহা দ্বারা পূর্ব্ববর্ণিত গুরুরাজ্যে প্রবেশ করা যায় না, জ্ঞানগঞ্জ প্রভৃতিতে প্রবেশ তো বহু দূরের কথা। দিব্যজ্ঞানের আশ্রয় ব্যতীত গুরুরাজ্যের দ্বার উন্মুক্ত হয় না। প্রাচীন গুহ্য শাস্ত্রে এই পর্য্যন্ত স্পষ্টভাবে নির্দ্দেশ করা ছিল। এই গুরুরাজ্য সৃষ্টির অবতরণ মুখে লক্ষিত হয় না। কারণ আত্মা অণুরূপে সঙ্কুচিত হইয়াই সাক্ষাৎ ভাবে ঈশ্বর প্রেরণায় মায়া-গর্ভে পতিত হয় এবং কর্ম্মজালে জড়িত হইয়া পড়ে। তদনন্তর তাহার ভোগ-প্রধান সংসার-জীবন আরম্ভ হয়। গুরুরাজ্যের অস্তিত্ব অবতরণশীল চিদণুর দৃষ্টিগোচর হয় না। পক্ষান্তরে ফিরিবার সময় উচ্চ অধিকারসম্পন্ন হইলে গুরুরাজ্যে প্রবেশ হয় এবং থাকিলে উহার ভেদও হয়। যে সকল আত্মাতে কুণ্ডলিনী শক্তি কম জাগ্রৎ হয় তাহারাও গুরু

কৃপার অংশীদার তাহা সত্য, কিন্তু এই গুরু-কৃপা প্রত্যগাত্মার কৃপাত্মক পুরুষকার রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে। ইহার ফলে বিবেকজ্ঞানের উদয় হয়, যাহার প্রভাবে অনাত্মাতে আত্মদৃষ্টিরূপ ভ্রান্তি নিবৃত্ত হয় ও আত্মস্বরূপ অনাত্মভাব হইতে মুক্ত হইয়া চিদ্‌রূপে প্রকাশিত হয়। এই জ্ঞানের অনলে কর্ম্মবীজ দগ্ধ হইয়া যায় বলিয়া আত্মস্বরূপ-স্থিতি হইতে চ্যুত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না এবং পুনর্ব্বার জন্ম-মৃত্যুর চক্রে আবর্ত্তিত হইবার আশঙ্কাও থাকে না। ইহাই প্রচলিত কেবলীভাব বা কৈবল্য।

কিন্তু যে সকল আত্মা গুরুর তীব্রতর কৃপা প্রাপ্ত হয় তাহারা আরও উচ্চপদের অধিকারী হয়—তাহাদের কুণ্ডলিনী-জাগরণের পর ক্রমশঃ ঊর্দ্ধগতি হইয়া থাকে। পূর্ব্বোক্ত আত্মার কুণ্ডলিনী জাগরণ হইতে দ্বিতীয় প্রকার আত্মার কুণ্ডলিনী জাগরণ অধিক মহত্ত্বসম্পন্ন। কারণ এইস্থানে ঊর্দ্ধগতির সূচনা হয় এবং চরম অবস্থায় ঊর্দ্ধতম শিখর পর্য্যন্ত পেঁ ৗছান যায়। বোধই আত্মার স্বরূপ, ইহা প্রথম ক্ষেত্রেও অভিব্যক্ত হয়। তাই এই স্থিতিও চিৎস্বরূপে স্থিতি তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু চিৎশক্তির বিকাশ ইহাতে থাকে না। দ্বিতীয় জাগরণে চিৎশক্তির উন্মেষ হয়। অবশ্য ইহা আভাস—ইহারই নাম শুদ্ধ বিদ্যার উদয় অথবা গুরুরাজ্যে প্রবেশ। শুদ্ধ বিদ্যার পূর্ণত্ব হইতেই ভবিষ্যতে শিবত্বের অভিব্যক্তি হয়। শুদ্ধ বিদ্যা গুরু-রাজ্যের বস্তু, ইহাই দিব্যজ্ঞান। ইহাতে জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি উভয়ই থাকে। কৈবল্যরূপ স্থিতিতে চিৎস্বরূপে স্থিতি হয় বটে, কিন্তু চিৎশক্তির আভাসাত্মক উন্মেষও থাকে না। কিন্তু গুরুরাজ্যে চিৎ-শক্তিরই ক্রমশঃ অধিকতর বিকাশ ঘটিয়া থাকে—প্রথমে মিশ্রভাবে অর্থাৎ রিপুর সহিত মিলিত ভাবে, পরে শুদ্ধ ভাবে। গুরুরাজ্যের দ্বার উন্মুক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই জ্ঞানশক্তির পরিপূর্ণ উন্মেষ হয় এবং সমগ্র বিশ্ব কেন্দ্রস্থ এক অহং ভাবের উপরে স্পষ্টভাবে ভাসিতে থাকে দেখিতে পাওয়া যায়। তখন অহং ভাবই হয় আত্মস্বরূপের পরিচায়ক

—ইহাই আত্মাতে আত্মবুদ্ধির উদয়ের প্রতীক, ইহারই নাম বলের বিকাশ। শক্তির জ্ঞানাংশ অনাবৃত থাকে সম্পূর্ণভাবে, কিন্তু ক্রিয়াংশ ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করে। ক্রিয়াশক্তির ক্রমিক অভিব্যক্তির ফলে আত্মনিষ্ঠ অহংভাব ক্রমশঃ পরিস্ফুট হইয়া উঠিতে থাকে—পূর্ণ গুরুতত্ত্বে যাইয়া অখণ্ড বোধের পূর্ণ অহংভাব ফুটিয়া উঠে। প্রথমে যে অহংএর উপর ইদংভাবের আভাস ছিল পরে তাহা আর থাকে না। এই প্রকাশাত্মক শিব ভাবই গুরুরাজ্যের কেন্দ্র। এইখানে মিলিত জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি ইচ্ছাশক্তি বা স্বাতন্ত্র্যরূপে দেখা দেয়। ইহারও ক্রমিক বিবর্ত্তন আছে—ইচ্ছার যেটি পূর্ণতম বিকাশ সেইখানেই জ্ঞান ক্রিয়া ও ইচ্ছার পূর্ণ একত্ব সিদ্ধ। বস্তুতঃ শিব ও শক্তির একত্বও সেইখানেই। প্রাচীন গুহ্য সাধনাতে এইখানেই পরমশিবের স্থিতি এবং ইহাই পূর্ণত্বের নিদর্শন। যাহাকে দিব্যজ্ঞান বলা হইয়াছিল তাহার প্রাথমিক স্তরের পরিসমাপ্তিও এইখানেই।

এইভাবে দেখা যায় যে চিদণু মায়াতে নামিবার সময় গুরুরাজ্যের সন্ধান পায় না বটে, কিন্তু ফিরিবার সময় উচ্চ সম্পন্ন হইলে সন্ধান পাইয়া থাকে। তবে ইহার পরে যে আরও কিছু থাকিতে পারে তাহা অনভিজ্ঞ পথিক সাধারণতঃ জানিতে পারে না। জ্ঞানগঞ্জের সত্তা বাস্তবিকপক্ষে গুরুরাজ্যেরও অতীত। যথার্থভাবে দেখিতে গেলে এই জ্ঞানগঞ্জই উচ্চতর গুরুরাজ্যের ভূমিস্বরূপ, অর্থাৎ জ্ঞানগঞ্জ হইতে জ্ঞানগঞ্জের লক্ষ্যস্থান পরমা-প্রকৃতি পর্য্যন্ত যে বিশাল রাজ্য রহিয়াছে তাহা পূর্ব্বে জ্যোতি মাত্র ছিল, রাজ্যরূপে পরিণত ছিল না, কিন্তু উহা মহা-খণ্ডযোগীর কালদেহানুষ্ঠিত কর্ম্মের প্রভাবে রাজ্যরূপ ধারণ করিয়াছে। জ্ঞানগঞ্জ এবং পূর্ব্বোক্ত গুরুরাজ্য স্তরে ভিন্ন হইলেও প্রকারে ভিন্ন নহে। বলা বাহুল্য, এই বিশাল যোগভূমিও অর্থাৎ মহা-খণ্ডযোগীর অধিকার-ক্ষেত্রও প্রকৃত গুরুরাজ্য নহে। তবে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত গুরুরাজ্যের শ্রেষ্ঠতম

আদর্শ ইহাকেই বলা চলে। প্রকৃত চরম আদর্শ অখণ্ড গুরুরাজ্য—তাহা এখনও প্রতিষ্ঠিত হয় নাই এবং তাহা প্রতিষ্ঠার জন্য কর্ম্মী যোগিমণ্ডলের মধ্যে আন্দোলন চলিতেছে। প্রথম গুরুরাজ্য হইতে দ্বিতয়ী গুরুরাজ্য অধিকতর ব্যাপক এবং উচ্চতর, কিন্তু অখণ্ড গুরুরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইলে এই উচ্চ-নিম্ন ভাব থাকিবে না এবং ব্যাপকত্ব সমগ্র সৃষ্টিকে আশ্রয় করিবে বলিয়া পূর্ব্বের গুরুরাজ্য এবং মধ্যবর্ত্তী জ্ঞানগঞ্জ কালের সৃষ্টির সহিত উহারই অন্তর্গত হইয়া পড়িবে।

কালের রাজ্যে কালের দেহ আশ্রয় করিয়া কর্মের সমাপ্তি আবহমান কাল হইতে এখন পর্য্যন্ত সিদ্ধ হয় নাই। অবশ্য আমি যোগীরই কর্মের কথা বলিতেছি, সাধকের কথা নহে। কর্মের আপেক্ষিক সমাপ্তি অবশ্য হইয়াছে, এমন কি কালের রাজ্যেই কেহ না কেহ ইহা সম্পাদন করিয়াছেন ইহাও সত্য, কারণ তাহা না হইলে পূর্ব্বোক্ত জ্ঞানগঞ্জ ও গুরুরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিত না। কর্মের যথার্থ সমাপ্তি হয় নাই বলিয়াই পূর্ব্বোক্ত কোন রাজ্যেই মধ্যবিন্দু ঠিক ঠিক স্থাপিত হয় নাই—ঐ সব স্থানে মধ্যবিন্দু যাহা গুরুর আসন তাহা অধিকার করিয়াছেন 'মা', গুরু নহেন। অবশ্য ঐ স্থানে 'মা'ই গুরু। প্রথম রাজ্যে অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত গুরুরাজ্যে মা-ই শিবরূপে প্রকট। জ্ঞানগঞ্জাত্মক দ্বিতীয় ক্ষেত্রে বিশাল ত্রিশক্তিময় ত্রিকোণ রাজ্য স্থাপিত রহিয়াছে, তিন কোণে তিন শক্তির রাজ্য রহিয়াছে—একটি হইতে অপরটি অধিকতর ব্যাপক। ত্রিকোণের মধ্যবিন্দুতে পরমাপ্রকৃতির অধিষ্ঠান। এইটিই তুরীয় বিন্দু এবং বিশ্বসৃষ্টির অন্তরতম ও উর্দ্ধতম স্থিতি-কেন্দ্র। জ্ঞানগঞ্জের কর্ম কালের দেহে সমাপ্ত হইলে এই বিশাল পরমাপ্রকৃতির রাজ্যে প্রবেশ করিয়া মধ্যবিন্দুতে স্থিতি লাভ করা যায়। প্রথমটি হইতে এইটি শ্রেষ্ঠতর গুরুরাজ্য ইহা সত্য, কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি ইহাও প্রকৃত গুরুরাজ্য নহে। এই স্থলেও 'মা'ই গুরুরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। ইহাও প্রকৃত গুরুর স্ব-স্থান নহে। এই রাজ্য ভেদ করার পর অখণ্ড

গুরুরাজ্যের প্রারম্ভ বলিতে পারা যায়। কিন্তু ইহা এখনও অব্যক্ত রহিয়াছে। এই অখণ্ড গুরুরাজ্যের আলোচনা পরে হইবে। তবে ইহা মনে রাখিতে হইবে, প্রকৃতির বা মার রাজ্যই আনন্দের রাজ্য, পরমাপ্রকৃতি ভেদের পর চৈতন্য রাজ্যের সূত্রপাত হয়, তৎপূর্ব্বে নহে।

কিন্তু এইখানে একটি কথা মনে রাখিতে হইবে। প্রথম গুরুরাজ্যের যেটি চরম লক্ষ্য সেইখান হইতেই প্রকৃত অখণ্ড গুরুরাজ্যে যাওয়ার পথ বিদ্যমান রহিয়াছে। ঐ পথ সূর্য্যমণ্ডলের ভিতর দিয়া অগ্রসর হইয়াছে এবং যোগ্য অধিকারী ভিন্ন সকলে ঐ পথে চলিতে পারে না। সূর্য্যমণ্ডল ভেদ করিতে হইলে মহাজ্ঞান আবশ্যক হয়। এই মহাজ্ঞানের প্রাপ্তি প্রথম গুরু-রাজ্যের কেন্দ্রে স্থিত হইতে পারিলে উর্দ্ধ হইতে আপেক্ষিক মহাকৃপা সঞ্চারের ফলে আপনিই ঘটিয়া থাকে। এই আংশিক মহাকৃপা ব্যতীত প্রথম গুরুরাজ্য ভেদ করা সম্ভবপর হয় না। ইহার ফলে অখণ্ড গুরুরাজ্য উদ্ভাবনের পক্ষে অপরিহার্য্য সাহায্য প্রাপ্ত হওয়া যায় ইহা সত্য। কিন্তু জ্ঞানগঞ্জের লক্ষ্যীভূত পরমাপ্রকৃতিকে ভেদ করিতে না পারিলে প্রথম কৃপা কার্য্যকরী হয় না এবং অখণ্ড গুরুরাজ্য প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা থাকে না। পরমাপ্রকৃতিকে ভেদ করিতে হইলেও পূর্ব্বোক্ত মহাজ্ঞানই আবশ্যক হয়। পূর্ব্বে সূর্য্যমণ্ডল ভেদ করা থাকিলে এবং তাহার পর প্রকৃতি-রাজ্য ভেদ করা হইয়া গেলে প্রকৃত গুরু বা বিশুদ্ধ ভগবৎ সত্তাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রথম গুরুরাজ্যে কেন্দ্র স্থাপন হয় নাই—উহার বাহিরে কালের ঘের বিদ্যমান রহিয়াছে। দ্বিতীয় গুরুরাজ্য আরও উর্দ্ধে অবস্থিত। ইহার ভূমি পূর্ব্ববর্ণিত জ্ঞানগঞ্জ এবং শেখর সেই বিন্দুটি, যাহা লোকোত্তর কর্মের প্রভাবে প্রাপ্ত হওয়া যায়। এখন পর্য্যন্ত সূর্য্যমণ্ডল ভেদের কোন প্রশ্নই উঠে না। কিন্তু সূর্য্যমণ্ডল ভেদ না হইলে প্রকৃত গুরুরাজ্যে প্রবেশের সম্ভাবনা থাকে না প্রথম ও দ্বিতীয় মহাকৃপা

ইহার পক্ষে পর্য্যাপ্ত নহে, তজ্জন্য তৃতীয় মহাকৃপা আবশ্যক হয়। এই মহাকৃপাতে প্রকৃত অর্থাৎ অখণ্ড গুরুরাজ্যের দ্বার উন্মুক্ত হইয়া যায়। তখন এমন একটা ঘোর বিপ্লব উপস্থিত হয় যাহাতে জগতের যাবতীয় প্রাচীর ভগ্ন হইয়া যায়। পূর্ব্বোক্ত রাজ্য ভাঙ্গিয়া যায়, চিদাকাশে চিন্ময় রাজ্যও ভাঙ্গিয়া যায় এবং মায়া হইতে পৃথিবী পর্য্যন্ত সকল স্তরের অধিবাসীদের পক্ষেই লক্ষ্য খুলিয়া যায়। এই অভিনব রাজ্যে সকল স্তরের জীবেরই প্রবেশের সমান অধিকার। ইহা কাহাকেও উপেক্ষা করে না, ইহাতে কাহারও বঞ্চিত হইবার সম্ভাবনা থাকে না। ইহাতে প্রবেশ করিবার এবং অবস্থান করিবার অধিকার সকলেরই আছে। এই অভিনব রাজ্যের দ্বার উন্মুক্ত হইলে ইহার ভিতরে সমস্ত বিশ্বেরই স্থান লাভ হইয়া থাকে। এই স্থান প্রাপ্তির মধ্যে যোগ্যতা-বিচার অবশ্য আছে, কিন্তু প্রবেশ সম্বন্ধে যোগ্যতার কোন প্রশ্নই নাই। যোগ্য হউক অথবা অযোগ্য হউক এইখানে প্রবেশের সকলেরই সমান অধিকার। এই পরম গুরুরাজ্যে কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এই কেন্দ্ররূপী আসনে কর্ম্মী সন্তান শ্রেষ্ঠতম অধিকার প্রাপ্ত হইয়া বসিতে পায়। তখন বিশ্ব-কমল প্রস্ফুটিত হয়, তাহা অনন্তদল সম্পন্ন—পূর্ব্ববর্ত্তী বিভিন্ন রাজ্যের যাবতীয় প্রজা ঐ সকল রাজ্য ভাঙ্গিয়া যাওয়ার পর এই অখণ্ড গুরুরাজ্যে আসন লাভ করে। পৃথিবীবাসী যাবতীয় মনুষ্যও তখন ঐ মহাকমলের দলে স্থিত হয়, ইহাই তাহাদের আসন। এই আসন লাভ করিবার জন্য এই অখণ্ড রাজ্যের কেন্দ্রস্থ অধিষ্ঠাতার অনুজ্ঞা আবশ্যক হয়, কারণ তাহার অনুমতি বা অনুগ্রহ ব্যতীত তাহার রাজ্যে প্রজা অবস্থান করিতে পারে না। প্রকারান্তরে বলা যায়, কেন্দ্রস্থ অধিষ্ঠাতা হইতে সঞ্চারিত শক্তি ও অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইয়া ঐ রাজ্যে স্থিতি লাভ হয়।

কিন্তু এইখানেই শেষ নহে। প্রথম গুরুরাজ্যে গুরুর অনুগ্রহ আশ্রয় করিয়া প্রবেশ হয়। অনুগ্রহ এবং কর্ম্ম-প্রাপ্তি কালের দেহে

অর্থাৎ মরদেহে হইয়া থাকে। মরদেহেই কর্ম সম্পূর্ণ হইলে রাজ্যের কেন্দ্রে উপবেশন করিতে পারা যায়, নতুবা চারিপার্শ্বে। ঐখান হইতে কর্মের অনুষ্ঠান ক্রমশঃ পূর্ণ হইতে হইতে কেন্দ্র পর্য্যন্ত যাওয়ার অধিকার জন্মে। ইহাই শিবত্ব। দ্বিতীয় রাজ্যে কেন্দ্রাধিষ্ঠাতা গুরুর অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইয়া কর্ম্মে অধিকার জন্মে। ইহা মরদেহের কথা। ঐ দেহে কর্ম্ম পূর্ণ হইলে পূর্ব্ববৎ কেন্দ্রে বসিবার অধিকার জন্মে। ইহা উচ্চতর কেন্দ্র। কালের দেহে কর্ম্ম পূর্ণ না হইলে—জ্ঞানগঞ্জ যাইয়া সেইখান হইতে কর্ম্ম পূর্ণ করিতে হয়। উহা সুদূর ভবিষ্যতের কথা। এই উভয় স্থলেই মরদেহে কর্ম্ম সম্পূর্ণ হইবার যেমন সম্ভাবনা আছে তেমন অসম্পূর্ণ থাকিবারও সম্ভাবনা আছে। অখণ্ড গুরুরাজ্যের সম্বন্ধেও ঐ একই নিয়ম। এই স্থলেও কর্ম্ম-প্রাপ্তি মরদেহেই হয়। মরদেহে কর্ম পূর্ণ হইলে ঐ রাজ্যের মধ্য বিন্দুতে আসন পাওয়া যায়। তখন কালের সম্পূর্ণ পরাজয় ঘটে, অর্থাৎ কাল আর থাকে না, মৃত্যুর মৃত্যু হইয়া যায়। প্রথম ও দ্বিতীয় রাজ্যে কেন্দ্র হইতে বাহিরে কর্ম দান সম্ভবপর নহে। কেন্দ্র হইতে কালের রাজ্যে কর্ম দেওয়া হয়, তাহার পর ঐ কর্ম পূর্ণ করিবার ভার থাকে আশ্রিতের উপর। কালের জগতে উহা পূর্ণ করিতে পারিলে তো কথাই নাই, নতুবা কিঞ্চিৎ কাল-স্পর্শযুক্ত অমর গুরুরাজ্যে গিয়া সুদীর্ঘ কালে উহা পূরণ করিতে হয়। উহা পূরণ না করিলে গুরুর ঋণশোধ হয় না, গুরুর অনুগ্রহ নিরর্থক হইয়া পড়ে। দ্বিতীয় রাজ্য তাই। কিন্তু তৃতীয় রাজ্যে ঠিক তাহা নহে, কারণ ঐ রাজ্য সূর্য-মণ্ডলের ওপারে। তাই মহাজ্ঞান দ্বারা সূর্য্যমণ্ডল ভেদ হইলে এবং এদিকে পরমাপ্রকৃতি ভেদ হইলে মহাকৃপার অন্তিম উন্মেষে অন্তিম দ্বার আপনিই উদ্‌ঘাটিত হয়। তখন এপার ও ওপারের ব্যবধান-কারক ও সংযোজক ভেদ-রেখা মিটিয়া যায়, ইহকাল ও পরকাল এবং লোক ও লোকোত্তর একই অখণ্ড প্রকাশে প্রকাশিত হয়। এই মহাপ্রকাশে উদয়াস্ত নাই এবং হ্রাস-বৃদ্ধিও নাই, ইহাই তৃতীয়

গুরুরাজ্যের বিন্দুর পরিচয়। অখণ্ড গুরুরাজ্যের কেন্দ্র হইতে কর্ম আসিলে কর্ম পূর্ণ হওয়া অবশ্যম্ভাবী। বর্ত্তমান দেহে কর্ম পূর্ণ না হইলে অলৌকিক দেহে কর্ম পূর্ণ হইবে, এই নিয়ম এখানে কার্য্যকর নহে, কারণ এখানে লৌকিক দেহই লোকোত্তর রূপে পরিণতি লাভ করে সুতরাং এই তৃতীয় রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হইলে অর্থাৎ অন্ততঃ একজনও যদি পূর্ণ অবস্থা কর্মের পূর্ণতার সঙ্গে সঙ্গে নরদেহে প্রাপ্ত হয় তখন আর তাহার কিছুই করণীয় থাকে না—বিশ্ব জগতের প্রতি অণুপরমাণু তাহার সহিত যুক্ত হয় এবং তাহার প্রেরণা লাভ করিয়া অনতিবিলম্বে নিজ কর্মের পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় এবং মধ্য বিন্দুর সহিত তদাত্ম্য লাভ করে।

এইখানে আরও একটি নিগূঢ় সন্ধান দিতে চেষ্টা করিতেছি। গুরুরাজ্যের কেন্দ্রে আমরা যাহাকে পাইয়াছি তিনি অখণ্ড প্রকাশ রূপ, তিনিই শিবতত্ত্ব। অবশ্য এই শিব দেহস্থিত সমস্ত চক্রভেদের পর সহস্রারে অথবা সহস্রারের ঊর্দ্ধে অনন্ত প্রকাশ রূপে প্রকাশমান হন। জ্ঞানগঞ্জ হইতে যে রাজ্যের সূচনা হয় তাহার লক্ষ্য পরমা প্রকৃতি বলিয়া আমরা উল্লেখ করিয়াছি। এই লক্ষ্য প্রাপ্ত হইতে হইলে শিব-ভাবকে পরমশিব-ভাবে পরিণত করা আবশ্যক, কারণ এই পরমাপ্রকৃতি পরম শিবেরই নাভিকুণ্ড হইতে উত্থিত কমলাসনে বিরাজ করিতেছেন। শিবাবস্থায় ইঁহার আবির্ভাব সম্ভবপর নহে। গুরুরাজ্যের লক্ষ্য যে শিব তাঁহার সহিত শক্তির যোগ সিদ্ধ হইলে ঐ শিব পরমশিবরূপে আত্মপ্রকাশ করেন। শক্তির পূর্ণ বিকাশ সম্পন্ন হইলে নাভিমার্গ খুলিয়া যায় এবং তখন ঐ নাভিমণ্ডল হইতে ব্রহ্মনাল উত্থিত হয়। ইহা ষট্‌চক্র ভেদনকারী ব্রহ্মনাল হইতে উৎকৃষ্ট, কারণ ইহা শিবের নাভি হইতে উত্থিত হয় এবং ইহারই উপর কমলের কর্ণিকাতে মহাশক্তি বিরাজ করেন। শিব তখন অর্থাৎ পরমশিব তখন নিদ্রিতবৎ অবস্থিত। প্রথম রাজ্যের শিব শবরূপে স্থিত হন, কিন্তু দ্বিতীয় রাজ্যের শিব অর্থাৎ পরমশিব শব না হইলেও

সুপ্ত হন (নিমেষ)। ইহা হইতে দেখা যাইতেছে যে এই দ্বিতীয় রাজ্যেও পূর্ণত্ব সম্ভবপর নহে। তন্ত্রশাস্ত্রে ষট্‌ত্রিংশৎ তত্ত্বের উপদেশে শিব ভাবের আদর্শ প্রদর্শিত হইলেও ইঙ্গিতে তত্ত্বাতীত পরমশিবের দিকে অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। কিন্তু শিবতত্ত্ব হইতে তত্ত্বাতীত পরমশিবে কি প্রকারে উপনীত হওয়া যায় তাহার পথ নির্দ্দেশ করা হয় নাই। তবে প্রকারান্তরে বলা হইয়াছে যে শিবভাবের মধ্যে শক্তির পূর্ণসত্তা অভিন্ন ভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে। এইজন্যই শিবভাব প্রকাশাত্মক বলিয়া বিশ্বাতীত হইলেও উহাই পূর্ণত্বের মূল ভিত্তি, কিন্তু শক্তির জাগরণ ব্যতীত ঊর্দ্ধগতি সম্ভবপর নহে। শক্তির কিঞ্চিৎ জাগরণে শিব হন শব, কিন্তু শক্তির আরও অধিক জাগরণে শিব হন সুপ্ত। শক্তির পূর্ণতম জাগরণে শিবও হন পূর্ণ জাগ্রত। কালী আদ্যা-শক্তি, ইহা শিবময়ী শক্তির জাগরণের প্রথম পর্ব্ব। শিব তখন শব। তারা সন্ধিস্থান—তখনও শিবের শবত্ব পরিহৃত হয় নাই। ললিতা বা রাজরাজেশ্বরী তৃতীয় শক্তি, ইহার পূর্ণ জাগরণে শিব হন নিদ্রিত। এবার শবভাব কাটিয়া গিয়াছে, কিন্তু নিদ্রাভাব (নিমেষ) এখনও আছে। জ্ঞানগঞ্জের পরম অবধি এই পর্য্যন্ত। এখনও পূর্ণত্ব অবশিষ্ট। জ্ঞানগঞ্জের সাধনাতে শাস্ত্রের যাহা অস্পষ্ট ইঙ্গিত তাহা ফুটিয়া উঠিয়াছে। কারণ শিবভাবের পরে পরম-শিবভাব এখানে প্রতিষ্ঠিত।

আমরা জানি শ্রীশ্রীগুরুদেব জ্ঞানগঞ্জের সাধনা পূর্ণ করিবার সময় নাভিধৌতি ক্রিয়া লাভের জন্য কি পরিমাণে উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলেন এবং কিভাবে উহা শ্রীগুরুর কৃপায় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই নাভিধৌতির ফলেই তিনি শিবভাব হইতে পরম শিবভাব পর্য্যন্ত উন্নীত হইয়াছিলেন মনে করা যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে মহাশক্তি রাজ-রাজেশ্বরীকে নিজেরই নাভি হইতে উত্থিত কমলে আসন দিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। উন্মুক্ত নাভিকমলের সঙ্গে নবোদিত জ্ঞানসূর্য্যের গভীর সম্বন্ধ রহিয়াছে। এই সূর্য্য উদিত হইলে নাভিকমল প্রস্ফুটিত

হয় ইহাও যেমন সত্য, তেমনি নাভিকমল প্রস্ফুটিত না হইলে এই সূর্য্যের সন্ধান পাওয়া যায় না ইহাও তেমনি সত্য। এই জ্ঞানসূর্য্য মহাজ্ঞানের দ্যোতক। গুরুরাজ্যের কেন্দ্রে যে শিবভাবের স্থাপনা হইয়াছে তাহার পর এই মহাজ্ঞানের সম্ভাবনা। সূর্য্যমণ্ডল ভেদ করা আবশ্যক, নতুবা সূর্য্যমণ্ডলের পরপারে অবস্থিত অখণ্ড গুরু ব্রহ্মতত্ত্বের সাক্ষাৎকার লাভ সুকঠিন। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও সত্য যে পরমাপ্রকৃতি অথবা রাজরাজেশ্বরীকেও ভেদ করিতে হইবে। যে অখণ্ড গুরুরাজ্য অথবা তৃতীয় রাজ্যের কথা বলা হইয়াছে তাহার প্রতিষ্ঠার জন্য এই দুইটিই আবশ্যক, শিবের শবত্ব মুক্ত হইয়াছে সত্য, কিন্তু পরমশিবের সুপ্তিভঙ্গ (নিমেষ ত্যাগ) এখনও হয় নাই। পরমশিবের জাগরণ সিদ্ধ হইলেই পূর্ণ জাগরণ হইল বলা চলে। তখন আর শিব-শক্তি বলিয়া পৃথক্ কিছু থাকিবে না, এক অখণ্ড চৈতন্যই থাকিবে। তবে ইহার মধ্যেও ক্রম আছে, কারণ প্রথমে হয় আনন্দের প্রতিষ্ঠা, তাহার পর হয় বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা, তাহার পর সত্যের প্রতিষ্ঠা।

একটি কথা এখানে প্রণিধানযোগ্য। যোগী কর্ম্মের প্রভাবে অগ্রসর হয় ইহা সত্য, কিন্তু এই কর্ম্মের সঙ্গে কৃপা বা অনুগ্রহের এমন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে যে চরমাবস্থায় এই দুইটিকে ভেদ করা যায় না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে গুরুরাজ্যে গুরুদত্ত প্রাথমিক অনুগ্রহ কর্ম্মের আকারে শিষ্যের জীবনে প্রকাশ পায়, কারণ তাহা না হইলে দীক্ষাপ্রাপ্তির অব্যবহিত পরে মৃত্যু হইলেও শিষ্য গুরুরাজ্যে স্থান পায় কিসের জোরে? আসন-তত্ত্ব একদিকে কৃপা ও অপরদিকে কর্ম্মকে অভেদে ধারণ করিতেছে। গুরুদত্ত আসন ইহাই বুঝায় যে এক পক্ষে ইহা যেমন গুরুর কৃপা, অপর পক্ষে তেমনি শিষ্যের ভাবী কর্ম্মের সম্ভাবনীয়তা। পরে কর্ম্ম করিতে হয় ইহা সত্য, কিন্তু ইহার সম্ভাবনা আসন ব্যতীত হইত না। যদিও এই কৃপাও এক হিসাবে ঋণরূপ, কারণ পরে উহা শিষ্যের কর্ম্মদ্বারা

শোধিত হয়, তথাপি ইহা কালরাজ্য হইতে উদ্ধার করিবার অব্যর্থ উপায়। দ্বিতীয় রাজ্যে এই কৃপা যেমন আরও গভীর তেমনি ইহার সংস্পৃষ্ট কর্ম্মের বল ও প্রসারও আরও অধিক। কিন্তু এই দ্বিতীয় রাজ্যেই সব শেষ হয় না, কারণ এখানেও কর্ম্ম বাকী রহিয়াছে এবং কৃপাও অবশিষ্ট রহিয়াছে। কৃপা ও কর্ম্মের মিলন এখনও হয় নাই। এখনও গুরুর কৃপা ও শিষ্যের কর্ম্ম কতকটা পৃথক্ পৃথক্ই বিদ্যমান আছে, যদিও উভয়ে অনেকটা মিলন সংঘটিত হইয়াছে। পরমাপ্রকৃতির রাজ্যের শেষ সীমা পর্য্যন্ত কৃপার অবধি। সেই পর্য্যন্ত যে কর্ম্ম তাহা কৃপার অধীন অর্থাৎ স্পষ্ট কৃপার অধীন। কিন্তু পরমাপ্রকৃতির রাজ্য ভেদ করা, অখণ্ড গুরুধামে প্রবেশ করা এবং সর্ব্বপ্রথমে শিবাবস্থা হইতে উর্দ্ধে উত্থিত হওয়া সবই মহাকৃপা সাপেক্ষ, কিন্তু ইহা গুপ্ত। ইহা অজ্ঞানাভাবে ঘটিয়া থাকে, কিন্তু কৃপার কার্য্য সিদ্ধ হয়। কৃপারূপে কৃপার পরিচয় পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু কৃপা নিজ ফল প্রসব করে। পরমাপ্রকৃতির রাজ্যভেদের পর অখণ্ড গুরুধামের দ্বার পর্য্যন্ত পথ দুর্গম। এই পথে কৃপার অর্থাৎ প্রকট কৃপার সন্ধান পাওয়া যায় না। তৃষ্ণার্থ পথিক পিপাসায় আর্ত্ত হইয়া কাঁদিতে থাকে। তৃষ্ণানিবর্ত্তক জল অর্পণ করিবার জন্য কেহ তাহার নিকট হাত বাড়াইয়া দেয় না। কিন্তু তাহা না দিলেও অজ্ঞাতভাবে অচিন্ত্য প্রকারে তাহার তৃষ্ণার উৎকটতা কমিয়া আসে এবং কষ্টেরও লাঘব হইতে থাকে।

সাধকের কুণ্ডলিনী জাগরণের পূর্ণ পরিণতি চিদাকাশে ইষ্ট বা মা'র সহিত তাদাত্ম্য। উদ্বৃত্ত শক্তির অভাববশতঃ সাধক যোগী হইতে পারে না। খণ্ডযোগীর কুণ্ডলিনী জাগরণের চরম ফল শুদ্ধ বিদ্যার উন্মেষ ও উহার বিকাশে শিবত্ব লাভ। এইখানেই জীবের জীবভাব কাটিয়া শিবভাব প্রাপ্তি ঘটে। সাধক শিব হইতে পারে না, কিন্তু কেবলী হয় অর্থাৎ বিদেহ-কেবলী। ইহা নিরঞ্জন পশুরই একটি অবস্থা। যোগী খণ্ড হইলেও কর্ম্মের পূর্ণতায় শিব হয়, জীবভাব আর থাকে না, বিদেহও হয় না—সিদ্ধ খণ্ডযোগী হয় ও তাহার কায়া

হয় শাক্ত। গুরুরাজ্যে সর্ব্বত্র বৈন্দব কায়া, কিন্তু জ্ঞানগঞ্জের অধোদিকে বৈন্দব কায়া এবং উর্দ্ধে শাক্ত কায়া। বৈন্দব কায়া অমর, শাক্ত কায়াও অমর, কিন্তু বৈন্দব কায়াতে পূর্ব্ব কাল-সম্বন্ধ সংস্কার-রূপে থাকা পর্য্যন্ত জরা থাকিলেও মৃত্যু থাকে না, কিন্তু শাক্ত কায়াতে জরাও থাকে না। উহা অজর ও অমর, উহাই শ্রেষ্ঠ দিব্যকায়া। দিব্যজ্ঞান ব্যতীত দিব্যকায়ার উদ্ভব হয় না। শুষ্কজ্ঞানে মায়িক কায়ার নিবৃত্তি হয় বটে এবং কর্ম্মবীজ নষ্ট হয় তাহাও সত্য, কিন্তু শুদ্ধ বিদ্যার অভাবে অমায়িক কায়া লাভ হয় না। জ্ঞানগঞ্জের উর্দ্ধদিকে সকলেই স্বরূপতঃ কিশোর কিশোরী—সকলেরই স্থিতি শিবত্বরূপ মহাপ্রকাশে। ভৈরবী অবস্থাতে জরা থাকে, কিন্তু দেবী অবস্থাতে জরা থাকে না।

গুরুরাজ্যের সাধনা জীবের সাধনা শিব হওয়ার জন্য, কিন্তু জ্ঞানগঞ্জের সাধনা শিবের সাধনা পরমশিব হওয়ার জন্য অর্থাৎ নিজের আধারে পরাশক্তির পূর্ণতম বিকাশের জন্য। গুরুরাজ্যের সাধনায় যে ষট্‌চক্রের ভেদ হয় তাহা জীবদেহের ষট্‌চক্র, কিন্তু জ্ঞানগঞ্জের সাধনায় উক্ত ষট্‌চক্র ভেদ করিতে হয় না এবং শিবত্ব লাভের সঙ্গে সঙ্গে সে প্রয়োজনও আর থাকে না। কিন্তু শিবত্ব লাভ হইলেই তো সব হইল না। কারণ শিবত্বে যদি শক্তি অন্তর্লীন থাকে তাহা হইলে শক্তির কোন ক্রিয়া থাকে না বলিয়া শিবও অব্যক্তপ্রায় হইয়া যান। এই শিব বিশ্বাতীত মহাপ্রকাশের সহিত অভিন্ন। শিবের সঙ্গে তাঁহার নিজশক্তির পূর্ণ সংযোগ হইলে সামরস্য ভাবের উদয় হয়। পূর্ব্বে হইয়াছিল শিবের জাগরণ, এবার হইল শিবের পূর্ণ শিবত্ব লাভের সঙ্গে সঙ্গে শক্তির জাগরণ। ইহার পর হইবে এমন একটি অবস্থার উদয় যেখানে জাগ্রৎ শিব ও জাগ্রৎ শক্তি অভিন্ন হইয়া প্রকাশমান হইবেন। তখন শিবের মহানিদ্রা ভঙ্গ হইবে এবং পরমশিব পৃথক্ সত্তা নিয়া থাকিবেন না—পূর্ণ অদ্বৈত সত্তার উদয় হইবে। কিন্তু সূর্য্যমণ্ডল ভেদ না হওয়া পর্য্যন্ত এইরূপ স্থিতি হওয়া

সম্ভবপর নহে। সূর্য্যমণ্ডল ভেদ করিতে পারিলে অন্তরালবর্ত্তী সকল পর্দ্দা কাটিয়া যায়। অখণ্ড গুরুরাজ্যের প্রকাশ তখনই সম্ভবপর। জ্ঞানগঞ্জের সাধনা ও সিদ্ধি এই অখণ্ড ভূমিরই প্রাপ্তির সহায়ক।

জ্ঞানগঞ্জের অথবা গুরুরাজ্যের আলোচনা প্রসঙ্গে একটি প্রশ্ন স্বভাবতঃই জিজ্ঞাসুর মনে উদিত হইয়া থাকে। প্রশ্নটি এই—কেহ শুষ্কজ্ঞান লাভ করিয়া প্রকৃতি হইতে বিবেক প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে কৈবল্য লাভ করেন, আবার কেহ দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়া ঐ জ্ঞানের ক্রমিক উৎকর্ষে গুরুরাজ্য অথবা জ্ঞানগঞ্জ প্রভৃতি ভূমিতে প্রবেশ করিতে সমর্থ হন। সদ্‌গুরুর অনুগ্রহের মূলে এই প্রকার পার্থক্য লক্ষিত হয় কেন? এই প্রশ্নের উত্তর এই—সদ্ গুরু এক হিসাবে অখণ্ড বিশ্ব-গুরু তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু যে আধারে তাঁহার শক্তি সঞ্চারিত হয় তাহার ধারণ-সামর্থ্যের তারতম্যানুসারে সঞ্চারিত শক্তির তারতম্য ঘটে। এইজন্য অনুগ্রহের প্রকাশে পার্থক্য অনুভূত হয়। বস্তুতঃ তাঁহার কোন পক্ষপাত নাই। আধার সামর্থ্যের তারতম্যের কারণ এই যে সকলে অবতরণ-মুখে একই স্থান হইতে অবতীর্ণ হয় না। কেহ জ্যোতি হইতেই মায়াতে বিসৃষ্ট হয়—অবশ্য অণুরূপে জ্যোতির মধ্যে পূর্ব্বেই স্থিতিলাভ করিয়াছিল, কেহ জ্যোতির অতীত চিন্ময় রাজ্য হইতে অবতীর্ণ হইয়াছে। এই চিন্ময় রাজ্যেরও ইতর-বিশেষ আছে, মূলে সব সেই অখণ্ড চৈতন্যেরই শক্তি-স্পন্দন হইতে উদ্ভূত তাহা সত্য। এইজন্য ফিরিবার সময় যে যেখান হইতে নামিয়া আসিয়াছে তাহাকে সেইখানে টানিয়া লওয়া হয়। যে জ্যোতি হইতে সুপ্ত অবস্থার ভঙ্গে মায়াগর্ভে পতিত হইয়াছে—অবশ্য কর্ম্ম-সমষ্টির ভিতর দিয়া—সংসারে প্রবিষ্ট হইবার পরে তাহার পক্ষে শুষ্কজ্ঞান লাভ করিয়া প্রকৃতির বাহিরে শুদ্ধ বোধ-স্বরূপে স্থিত হওয়াই মুক্তিপদ, ইহার বেশী আকাঙ্ক্ষা সে করিতে পারে না। আপাততঃ উহা তাহার প্রাপ্যও নহে। অনাত্মাতে আত্মবোধ নিবৃত্ত হইলে কর্ম্মবীজ স্বভাবতঃই বিনষ্ট হয়। তখন জন্ম-মৃত্যুর কারণ কাটিয়া

যায় এবং কৈবল্য-পদে অবস্থান ঘটে। এই সব আত্মার পক্ষে দিব্যজ্ঞান প্রাপ্তির সম্ভাবনা কোথায়? কিন্তু যে আত্মা চিন্ময় ভূমি হইতে নামিয়া আসিয়াছে তাহার পক্ষে ফিরিয়া যাইতে হইলে জ্যোতি ভেদ করিয়া চিন্ময় রাজ্যে যাওয়া আবশ্যক। এই অবস্থায় শুধু অনাত্মাতে আত্মবোধের নিবৃত্তি যথেষ্ট নহে, আত্মাতে আত্মবোধের উদয়ও আবশ্যক। এই আত্মবোধ যেমন যেমন বিকাশ প্রাপ্ত হয়, তেমনি তেমনি আত্মাতে অনাত্মবোধও কাটিয়া আসে অর্থাৎ শুদ্ধ অহংভাব বাড়িতে থাকে এবং ইদংভাব কাটিতে থাকে। চরমাবস্থায় শুদ্ধ আত্মাতে পূর্ণ অহংভাব বিরাজ করে। ইহাই শিবত্ব। এইভাবে গুরুরাজ্যের ঊর্দ্ধ সীমা পর্য্যন্ত গতির প্রণালী গুহ্যভাবে হইলেও তান্ত্রিক সাহিত্যে ইহা প্রকাশ করা হইয়াছে। কিন্তু গুরুরাজ্য হইতে জ্ঞানগঞ্জে উঠিবার প্রণালী কোথাও বর্ণিত হয় নাই, কারণ ইহা আরও গুহ্য। জ্ঞানগঞ্জে সেই সব আত্মাই প্রত্যাবর্ত্তন করে যাহারা ঐ ভূমি হইতে প্রপঞ্চে নামিয়া আসিয়াছে। মহাখণ্ড গুরু বাছিয়া বাছিয়া তাহাদিগকে টানিয়া নেন। কারণ তাহাদের জ্ঞানগঞ্জে ফিরিবার স্বাভাবিক প্রবণতা রহিয়াছে। এই পর্য্যন্তই আমাদের আলোচনার বর্ত্তমান সীমা। কিন্তু এই নীতির অনুসরণ করিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে অখণ্ড গুরুরাজ্যে অধিকার অনুসারে গতি হইয়া থাকে।

প্রত্যেক রাজ্যেই দুইটি বিভাগ আছে। একটি কেন্দ্র, অপরটি বাহ্য। কেন্দ্রের বল কম হইলে তাহার অধিকার ক্ষেত্ররূপ গোলকটি ছোট হয়। কেন্দ্রের বল অপরিসীম হইলে ঐ ক্ষেত্রটি আরও বড় হয়। কেন্দ্রের বল অপরিসীম হইলে ঐ ক্ষেত্রটি ফলতঃ বিশ্বব্যাপী, এমন কি অনন্ত হইয়া পরে। কেন্দ্রের শক্তি প্রবল হইলে কেন্দ্রে প্রবেশ করিবার অধিকারীর সংখ্যা খুব কম হয়, কিন্তু কেন্দ্র প্রবল বলিয়া কৃপা-বিস্তারের ক্ষেত্রটা অপরিসীম বৃহৎ হয়। যতই নামিয়া আসা যায় ততই কেন্দ্র হয় দুর্ব্বল, তাই কৃপা-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে কিছু কিছু নিয়ন্ত্রণাদির বন্ধন থাকিয়া যায়। কেন্দ্র আরও দুর্ব্বল হইলে

অনুগ্রহের ক্ষেত্র সঙ্কুচিত হয় বলিয়া নিয়ম ও বিধান অপেক্ষাকৃত কঠিন হয়। কারণ তাহা না হইলে শুধু দুর্ব্বল কেন্দ্র দ্বারা ফল-সম্পাদন সম্ভবপর নহে।

এইজন্য অখণ্ড গুরুর দৃষ্টিতে তাঁহার অনুগ্রহের অযোগ্য বা অবিষয়ীভূত কিছুই থাকিতে পারে না।

জ্ঞানগঞ্জ সম্বন্ধে মোটামুটি কিছু তত্ত্ব প্রকাশ করা হইল। কিন্তু প্রশ্ন হইতে পারে জ্ঞানগঞ্জ এবং তদনুরূপ অন্য স্থান (যেমন বৃন্দাবন), এই উভয়ে পার্থক্য কি? জ্ঞানগঞ্জ বলিতে আমরা তিব্বতের অন্তর্ব্বর্ত্তী নিগূঢ় স্থান-বিশেষকে লক্ষ্য করিতেছি না, যদিও ইহা সত্য যে ঐ স্থানও প্রকৃত জ্ঞানগঞ্জের সহিত সংসৃষ্ট, কারণ তত্ত্বময় জ্ঞানগঞ্জেরই উহা অর্থময় প্রকাশ। তদ্রূপ বৃন্দাবন বলিতেও আমরা উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের অন্তর্গত মথুরার সন্নিহিত স্থান-বিশেষকে লক্ষ্য করিতেছি না, যদিও এই ক্ষেত্রেও ইহা সত্য যে এই ভৌম বৃন্দাবনের সহিতও প্রকৃত বৃন্দাবনের সংসর্গ রহিয়াছে, এমন কি তাদাত্ম্যও রহিয়াছে।

বৃন্দাবন মাধুর্য্যময়ী ভক্তি-সাধনার শ্রেষ্ঠ স্থান। জ্ঞানগঞ্জ কর্ম্মভূমি। পৃথিবীতে পার্থিব দেহে আরব্ধ কর্ম ঐখানে পূর্ণ হইতে পারে, দেহাদির সংস্থান তাহার অনুকূল ভাবেই সেখানে পাওয়া যায় এবং ঐ কর্ম পূর্ণ হইলে যে লক্ষ্যে উপনীত হওয়া যাইবে তাহাও ঐখান হইতেই আভাসরূপে দৃষ্টিগোচর হয়। কিন্তু বৃন্দাবন এই জাতীয় কর্মস্থান নহে, কিন্তু ভাবস্থান। ভাব-সাধনা এইখানে আরব্ধ হইয়া অসম্পূর্ণ থাকিয়া গেলে বৃন্দাবনে তদুপযোগী দেহ প্রাপ্তি হয় এবং এই সাধনার ক্রম-বিকাশ চলিতে থাকে, কারণ ওখানেও স্তর-বিভাগ আছে। জ্ঞানগঞ্জে যেমন অভিনব দেহাদি প্রাপ্তি ঘটে, যাহার চরম লক্ষ্য জরা ও মৃত্যু হইতে অব্যাহতি, বৃন্দাবনেও তেমনি ভগবানের বহিরঙ্গ বা অন্তরঙ্গ সাধনার উপযোগী ভাব-দেহের প্রাপ্তি ঘটে এবং ঐ ভাব-দেহের ক্রম-বিকাশে কোন না কোন সময় পূর্ণ রসের অভিব্যক্তি হয় এবং চরম সিদ্ধিলাভ হয়। জ্ঞানগঞ্জে দিবারাত্রি

বিভাগ নাই, বৃন্দাবনেও তাহাই। জ্ঞানগঞ্জের ভূমি মৃত্তিকারূপ নহে, তদ্রূপ বৃন্দাবনের ভূমিও মৃত্তিকারূপ নহে, উভয়ই চিন্ময়। ইহা সত্ত্বেও উভয়ে ভেদ আছে। জ্ঞানগঞ্জের লক্ষ্য 'মা', যাহাকে পাইবার জন্য শিবকে নাভি-ধৌতি সিদ্ধ করিয়া পরমশিবরূপ ধারণ করিতে হয়। বৃন্দাবনের লক্ষ্য 'মা' নহে, বৃন্দাবনে মায়ের কোন স্থান নাই। এমন কি জ্ঞানগঞ্জের যিনি পরম লক্ষ্য রাজরাজেশ্বরী বা ললিতা বৃন্দাবনে তিনি মাতৃরূপ পরিহার করিয়া রাসলীলার প্রধান সখীরূপে পরিগণিত। ইহার অতি নিগূঢ় তাৎপর্য্য আছে। শ্রীশ্রীগুরুদেবের শ্রীগুরুর ধারা জ্ঞানগঞ্জ হইতে মাকে ধরিয়া অনন্তের দিকে অগ্রসর হইয়াছে, কিন্তু গুরুদেবের শ্রীগুরুর গুরুভ্রাতা শ্রীল ভবদেব গোস্বামীর ধারা মাকে পরিহার করিয়া কান্ত ভাব ধরিয়া যুগল উপাসনায় পর্য্যবসিত হইয়াছে।

আলমন্দার সংহিতাতে আছে ভগবানের লীলা তিন প্রকার—একটি বাস্তব বা পারমার্থিক, একটি প্রাতিভাসিক এবং একটি ব্যবহারিক। বেদান্তে যেমন সত্তাকে পারমার্থিক, প্রাতিভাসিক ও ব্যবহারিক এই তিন ভাগে ভাগ করা হইয়াছে, বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধগণের শাস্ত্রে যেমন স্বভাবকে পরিনিষ্পন্ন, পরিকল্পিত ও পরতন্ত্র—এই তিন ভাগে বিভাগ করা হইয়াছে, তেমনি বৈষ্ণবগণও লীলাকে তিন ভাগে বিভাগ করিয়াছেন। এই ত্রিবিধ লীলার স্থানও তিন প্রকার—বাস্তব বা পারমার্থিক লীলা অক্ষর ব্রহ্মের হৃদয়-প্রদেশে দৃষ্ট হয়, প্রাতিভাসিক লীলা নিত্য বৃন্দাবনে হইয়া থাকে এবং ব্যবহারিক লীলা নির্দ্দিষ্ট সময়ে ব্রজভূমিতে হইয়া থাকে। মনে রাখিতে হইবে, অক্ষর ব্রহ্মের হৃদয়টি বৃন্দাবন, প্রাতিভাসিক লীলার যেটি ভূমি তাহাও বৃন্দাবন এবং ব্রজভূমিও বৃন্দাবনেরই নামান্তর। কিন্তু তিনটিই বৃন্দাবন হইলেও ইহাদের মধ্যে পরস্পর পার্থক্য আছে। অনুরূপ যুক্তি ও পরিভাষা অবলম্বন করিয়া বলিতে পারা যায় যে জ্ঞানগঞ্জের মধ্যেও এই প্রকার ভেদ আছে। যেটি

প্রকৃত জ্ঞানগঞ্জ সেটি ঐ অক্ষর ব্রহ্মের হৃদয়স্থ বৃন্দাবনের মতই চিন্ময় প্রদেশ। ঐ বৃন্দাবন যেমন—

তৎস্থানং কোটি-ব্রহ্মাণ্ড-মহাশূন্যাদ্ বিলক্ষণম্।
মানং তস্যাপি কিমপি বিদ্যতে নৈব শাম্ভবি॥
তত্র ভূমিং স্বপ্রকাশামাকাশঞ্চ তথাবিধম্।
জলং তথাবিধং বিদ্ধি তেজশ্চৈব তথাবিধম্, ইত্যাদি॥

তদ্রূপ বাস্তব জ্ঞানগঞ্জের ভূমি আকাশ জল তেজ সবই স্বপ্রকাশ, অর্থাৎ সেখানে মাটি নাই, আকাশ প্রভৃতিও নাই, একমাত্র চৈতন্যই ভূমি প্রভৃতি রূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে। যেটি ব্যবহারিক জ্ঞানগঞ্জ সেইটি সিদ্ধ পুরুষ প্রভৃতির পরিচিত, কিন্তু যেটি পারমার্থিক জ্ঞানগঞ্জ সেটি যোগের চরম শিখরে উত্থিত না হইলে উপলব্ধি করা যায় না। তাই বলা হয় তিব্বতের স্থান বিশেষে জ্ঞানগঞ্জ অবস্থিত, যেখানে অধিষ্ঠাতৃ বর্গের সহানুভূতি না থাকিলে প্রবেশ করা যায় না, এমন কি সে স্থানের সন্ধানও পাওয়া যায় না।

কর্ম্মের সার্থকতা এবং ভক্তির সার্থকতা সাধকের জীবনে পৃথক্ পৃথক্। কর্ম্ম দ্বারা অধিকার-সম্পত্তি প্রবল হইলে উক্ত স্থান সকলের সন্ধান পাইতে পারা যায়। এই অধিকার-সম্পত্তি লাভের জন্য স্থূলদেহে গুরু-নির্দ্দিষ্ট কর্মরাশিকে সমাপ্ত করিতে হয়—আভাসও যেন বাকী না থাকে। কর্ম সমাপ্ত না হইলে আধারে বলাধান হয় না, স্বরূপের মহান্ প্রকাশ ধারণা করিবার যোগ্যতা জন্মে না। কৃপা ধারণ করিতে হইলেও যোগ্যতা আবশ্যক। মহাকৃপাই প্রকৃত কৃপা, তখনকার যোগ্যতাই শ্রেষ্ঠ যোগ্যতা। জ্ঞানগঞ্জে, শুধু জ্ঞানগঞ্জে কেন প্রতি যোগ-ভূমিতেই, এই যোগ্যতা বাড়াইবার উপায় রহিয়াছে। ইহার ফলে কর্ম ক্রমশঃ পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইতে পারে। এইজন্য গুরুরাজ্য, জ্ঞানগঞ্জ এবং অখণ্ড গুরুর ক্ষেত্র, যাহা ভাবী প্রকাশের অন্তর্গত, সবই ভূমিরূপ। পারমার্থিক জ্ঞানগঞ্জের সন্ধান সকলের পক্ষে জানা সম্ভবপর নহে। তবে কেহ কেহ যে জ্ঞানগঞ্জের সন্ধান

প্রাপ্ত হন বলিয়া শুনিতে পাওয়া যায় তাহা ব্যবহারিক জ্ঞানগঞ্জের সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট জানিতে হইবে।*

* জ্ঞানগঞ্জের বিবরণ "শ্রীশ্রীযোগিরাজাধিরাজ বিশুদ্ধানন্দ পরমহংস" নামক গ্রন্থের বিভিন্ন পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। "ব্রহ্মাণ্ড নো ভেদ" নামক ১৯২৬ সনের প্রকাশিত গুজরাতী গ্রন্থে যে তিব্বতে অবস্থিত "সত্য জ্ঞানাশ্রম" বা "জ্ঞানমঠ" নামক গুপ্ত মঠের কথা উল্লিখিত হইয়াছে তাহা জ্ঞানগঞ্জের সহিত সংসৃষ্ট বলিয়া মনে হয়। এই মঠ হিমালয়ের উপরে, তিব্বত প্রান্তে অবস্থিত। ইহার পাঁচ মাইল ব্যবধানে চিরতুষার প্রদেশ। এই মঠে যে প্রকার জ্ঞান পাওয়া যায় তাহার তুলনা পৃথিবীতে আর কোন স্থানে নাই। প্রসিদ্ধ আছে যে রাজা বিক্রমাদিত্যের রাজ্যকালে সিদ্ধপুরী, আত্মপুরী ও জ্ঞানপুরী নামক তিনজন পর্য্যটক ভ্রমণ করিতে করিতে ব্রহ্মদেশে কিছুদিন অবস্থানের পর এই গুপ্তস্থানে আসিয়া স্থায়ীভাবে বাস করিতে আরম্ভ করেন। এখানে যোগ, অমৃতসিদ্ধি ও অন্যান্য বিজ্ঞান বিষয়ক তত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা হইত। স্থানটি এত গুপ্ত যে সুদীর্ঘ কালেও চীন, ব্রহ্মদেশ ও আসামের বারজন ব্যতীত আর কেহ এই স্থানের সন্ধান জানিত না। কিছুদিন পরে দুইজন মহাত্মা ঐ স্থান ত্যাগ করেন (ঐ পৃঃ ৭৭)। রোমদেশীয় একজন পথিকও এই স্থানের কথা "জ্ঞানমঠ" নামে প্রকাশ করিয়াছিলেন। এখানকার তিনজন মহাপুরুষের অলৌকিক দিব্যশক্তির কথা বর্ণিত হইয়াছে। এই মঠে অনুমতি ব্যতীত কাহারও প্রবেশ করিবার উপায় ছিল না (ঐ পৃঃ ৭৮)। আর একজন গ্রীক পর্য্যটকও এই স্থানের কথা বলিয়াছেন। তিনি বলেন যে তিব্বতের এই মঠের ন্যায় অদ্ভুত স্থান তিনি পৃথিবীতে অন্যত্র দেখেন নাই। তাঁহার মতে ইহাই প্রকৃত "Heaven on Earth" (ভূ স্বর্গ—ঐ পৃঃ ৭৮)। চীনদেশের ঐতিহাসিক Fengliyan বলিয়াছেন যে দুর্গম পর্বতের অন্তরালে এই গুপ্ত মঠে যোগক্রিয়ার যে আলোচনা হয় তাহা অনেকেই জানে না, কিন্তু ইহা মনে হয় যে এক সময় পৃথিবীর প্রকৃত উন্নতি এই সব যোগীদের দ্বারাই সিদ্ধ হইবে। এই সকল যোগী যাহা ইচ্ছা করেন তাহাই করিতে পারেন। আর একজন ঐতিহাসিক বলিয়াছেন যে বায়ুমণ্ডলে একটি অদৃশ্য দুর্গ রচনা করিয়া জ্ঞানমঠকে রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে (ঐ পৃঃ ৭৯)।

"দেবদর্শন" প্রথম খণ্ডে আছে যে কিংবদন্তী অনুসারে অনন্ত যোগী নামক একজন মহারাষ্ট্রীয় যোগী ভগবান্ দত্তাত্রেয়ের আদেশে যোগ শিক্ষার জন্য জ্ঞানগঞ্জ গিয়াছিলেন ও সেখানে কয়েক বৎসর বাস করিয়াছিলেন। "জ্ঞানগঞ্জ" নামক বর্ত্তমান লেখকের একটি বিবরণাত্মক প্রবন্ধ গোরখপুর হইতে প্রকাশিত "কল্যাণ" নামক মাসিক পত্রিকার যোগাঙ্কে বহুদিন পূর্বে প্রকাশিত হইয়াছিল। বলা বাহুল্য, উহা ব্যবহারিক জ্ঞানগঞ্জের বিবরণ।